অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

প্রথম খন্ড

জীবনে যা দেখলাম

প্রথম খণ্ড

(১৯২২-১৯৫২)

অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

(৯ খণ্ডে সমাপ্ত)

প্রথম খণ্ড

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.kamiuhprokashon.com

অষ্টম মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৪

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০২

জীবনে যা দেখলাম (প্রথম খণ্ড) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১,৫১/এ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব : লেখক ❖ প্রচ্ছদ : দি ডিজাইনার, বাংবাজার, ঢাকা ❖ মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১,৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০

৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১

৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২

কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 03 2

আত্মজীবনী লেখার

কৈফিয়ত

যাদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও প্রেরণা লাভ করা যায়, তাদের জীবনী লেখা হয়ে থাকে। আমি নিজেকে এর যোগ্য মনে করি না বলে আমার জীবনী কেউ লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে- এ ধারণা আমার ছিলো না। গত আশির দশকে জামায়াতে ইসলামী আমার নাগরিকত্ব বহাল করার জন্য যখন আন্দোলন করে, তখন ভারতপন্থি বাঙালি জাতীয়তাবাদী, ধর্ম-নিরপেক্ষ ও ইসলাম বিরোধী মহল আমার চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে ব্যাপক অপপ্রচার চালায়। সম্ভবত এর মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যেই জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান 'অধ্যাপক গোলাম আযমের সংগ্রামী জীবন' শিরোনামে ১৮০ পৃষ্ঠার এক বই এবং এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। ইসলামী আন্দোলনে আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী জনাব মুহাম্মদ নুরুয্যামান 'Prof. Ghulam Azam : A Profile of Struggle in the Cause of Allah' শিরোনামে ইংরেজিতে ১৭৬ পৃষ্ঠার আরও একটি বই প্রকাশ করেন। এতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে অব্যাহতি লাভ করার পর ২০০১ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি ড. সৈয়দ আলী আহসানের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলাম। তিনি বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড় এবং ছাত্রজীবন থেকেই আমি তাঁর স্নেহধন্য। আমার অনূদিত আমপারার অনুবাদ পড়ে খুশি হয়ে তিনি যে মন্তব্য করলেন, তা আমাকে আরও অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমার অব্যাহতিকে তিনি স্বাগত জানালেন এবং এ সুযোগে আমার আত্মজীবনী লেখার জন্য শুধু পরামর্শ নয়; রীতিমতো উদ্বুদ্ধ করলেন।

আত্মপ্রচার আমার স্বভাব ও রুচিবিরুদ্ধ। আত্মজীবনী আত্মপ্রচারে পরিণত হয় কিনা, এ বিষয়ে কিছুদিন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কাটল। শেষ পর্যন্ত তিনটি কারণে লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

১. ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত জনশক্তির মধ্যে যারা আমাকে মহব্বত করেন, তারা এ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য হয়তো এ থেকে কিছু শিক্ষা বা উপদেশ সংগ্রহ করতে পারেন।

২. জীবনে যা কিছু দেখলাম তা প্রকাশ করা উপলক্ষে এর পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত এমন কিছু শিক্ষামূলক ঘটনা ও উপদেশমূলক বিবরণ পেশ করার সুযোগ পাবো, যা থেকে তারা উপকৃত হতে পারেন।

৩. আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর দীনের যেটুকু আলো দান করেছেন, তা থেকে যতটুকু সম্ভব এ উপলক্ষে পরিবেশন করা সহজ হবে।

২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে সাপ্তাহিক কিস্তিতে প্রতি শুক্রবার দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয় পাতায় 'জীবনে যা দেখলাম' শিরোনামে লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। এ লেখার প্রেরণাদাতা ড. সৈয়দ আলী আহসানের তাগিদেই পুস্তকাকারে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হচ্ছে। বিট-পিয়নের অভাবে দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক তাঁকে সংগ্রাম নিয়মিত পৌঁছাতে না পারায় আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার ধারণা ছিল যে, লেখা শেষ হলে কোন প্রকাশককে দেব।

কামিয়াব প্রকাশনের আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন আমার অনুমতি ছাড়াই প্রথম থেকে এ লেখা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কম্পোজ করা শুরু করেছে বলে যখন তার কাছে জানলাম, তখন তাকে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান করলাম।

পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যাপারে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট, ইবনে সিনা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, অধ্যয়ন পারদর্শী জনাব মুজিবুর রাহমান বাড়িতে এসে বলে গেলেন, 'এ বই সর্বপ্রথম আমি কিনব। আমার জানা অনেক কথা এমন চমৎকারভাবে পরিবেশন করায় আমি মুগ্ধ।' বললাম, 'আপনাকে তো প্রেজেন্ট করবো।' বললেন, তিনি তা নেবেন না, কিনেই নেবেন। প্রথম ক্রেতা হওয়ার দাবি জানিয়ে বিদায় নিলেন। এতে আমি অত্যন্ত প্রেরণাবোধ করলাম।

আমার জন্ম ১৯২২ সালে। এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। ৪৮ কিস্তিতে তা প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম দিয়ে পরিচ্ছেদ সাজানো সম্ভব নয় বলে কিস্তির নম্বরভিত্তিক পরিচ্ছেদেই সাজাতে হয়েছে। অবশ্য প্রতি কিস্তির লেখাতেই উপ-শিরোনাম রয়েছে এবং এর সূচিপত্রও দেওয়া হচ্ছে, যাতে পাঠক-পাঠিকাগণ সূচি থেকে বিষয় বাছাই করার সুযোগ নিতে পারেন।

আমার সেক্রেটারি নাজমুল হক অত্যন্ত মুখলিস নিরব কর্মী। আমার লেখার খসড়া পত্রিকায় পাঠাবার পূর্বে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যথা সময়ে সম্পাদকের নিকট পৌঁছাবার দায়িত্ব পালন করে সে আমাকে তার জন্য দোয়া করতে বাধ্য করেছে।

এ বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন-এর আন্তরিকতা ও আগ্রহ দেখে প্রকাশক হিসেবে তার ওপর আমার আস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সে নিজেই প্রুফ দেখেছে, এমনকি যোগ্যতার সাথে সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেছে। প্রকাশক হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাকে কামিয়াব করুন এবং তার প্রকাশনার নামটা সার্থক করুন।

যে তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে আমি লিখছি আল্লাহ তাআলা তা পূরণ করুন, এ দোয়াই সবার কাছে চাই।

গোলাম আযম
ঢাকা, জানুয়ারি ২০০২

অভিমত

জাতীয় অধ্যাপক
সৈয়দ আলী আহ্‌সান

অধ্যাপক গোলাম আযম আমাদের দেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি আমাদের দেশের রাজনীতিতে ছিলেন অনেক দিন। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে প্রজ্ঞা এবং মনীষার প্রয়োজন হয় তা তাঁর মধ্যে বিশেষ পরিমাণেই ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের রাজনীতিতে বর্তমানে শিক্ষিত লোকের খুব অভাব। একসময় আমাদের দেশে যাঁরা রাজনীতিতে ছিলেন তাঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত এবং মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। গোলাম আযম সাহেব সেই ধারারই একজন। তিনি ঢাকা নিউ স্কিম মাদ্‌রাসা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একই মাদ্‌রাসার কলেজ সেকশন থেকে আইএ পাশ করেন। তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করেন। সুতরাং ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরবী শিক্ষা এবং ইসলামী জীবন তিনি আয়ত্ব করেন। এভাবে একই সঙ্গে তিনি ইসলামী জীবন দর্শনের সঙ্গে ইংরেজি ভাবধারা এবং চিন্তায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং বাংলাদেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দাবি-দাওয়া উপস্থিত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য লোকের সংখ্যা খুবই কম।

জীবনে তিনি অনেক সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন এবং কারাবাসও করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সকল বিপদমুক্ত হয়ে স্বচ্ছ আলোতে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর জীবন থেকে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে।

তিনি একজন বাগ্মী, সুন্দর যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে পারেন এবং একজন নেতার যা গুণ সে গুণগুলো তাঁর মধ্যে বিদ্যমান আছে। আমি তাঁকে বহুদিন ধরে জানি। অনেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতবিনিময় হয়। সবসময় যে আমরা একমত হতে পারি তা নয়; কিন্তু মতের মিল না হলেও আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি। একসময় আমি তাঁকে বলেছিলাম তাঁর জীবন কাহিনী লিখতে, আমি খুবই খুশি হয়েছি যে, আমার কথায় তিনি এ কাজে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়টি গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। এখানে যে ঘটনাগুলো বিকশিত হয়েছে তাতে তাঁর জীবনের প্রথম দিকটার কর্ম বিষয়ে আমরা জানতে পারি। পরে বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলে তাঁর জীবনের পূর্ণাঙ্গ তথ্য আমরা পেতে পারবো।

গোলাম আযমের ভাষা সহজ, সুন্দর এবং সাবলীল। তিনি বাংলা ভাষার রীতি প্রকৃতির প্রতি সম্মান করে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁর এই বাংলা ভাষার মধ্যে অহেতুক অন্য কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করেন না। এটি একটি বিশেষ গুণ। আমি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থও পড়েছি এবং আমি দেখেছি যে, সর্বক্ষেত্রেই তাঁর রচনায় একটা সাবলীল গতি আছে। তাফহীমুল কুরআন গ্রন্থকে তিনি একটি সার-সংক্ষেপ করেছেন। এটা খুবই সুন্দর হয়েছে। উক্ত গ্রন্থ পুরোটাই অবশ্য বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু গোলাম আযম সাহেবের সংক্ষেপিত ভাষ্য সবার জন্য তৃপ্তিপ্রদ এবং সহজ।

তিনি যে রাজনীতি করেন, সে রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাঁর রাজনীতির পিছনে যে মানুষটি আছে তাঁর সঙ্গে আমার সখ্যতা আছে। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের লোকেরা বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং রাজনীতি চর্চার ইতিহাস ধরতে পারবে।

সৈয়দ আলী আহসান

জুন, ২০০২

ড. কাজী দীন মুহম্মদ-এর মূল্যায়ন

অধ্যাপক গোলাম আযম প্রণীত প্রায় আড়াইশ পৃষ্ঠার স্মৃতিচারণমূলক আত্মজীবনী 'জীবনে যা দেখলাম'। লেখককে কেন্দ্র করে যে সমাজ বিবর্তিত হয়েছে গ্রন্থখানিতে তাঁর সবাক ছবি একের পর এক চলচ্চিত্রের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। পড়তে গিয়ে মুগ্ধ হয়েছি, নস্টালজিক মোহময়তায় অভিভূত হয়েছি। বইখানির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ দেশের সমকালীন সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ইতিহাস সীমিত কলেবরে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। লেখকের Sincerity of perpose তাঁর বক্তব্যকে স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল করে তুলেছে। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের নিগূঢ় ভাবনাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে। অন্তরের কথাগুলো বাইরে এসে আপনা-আপনি জোড়া লেগে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থিত হয়েছে। তাঁর এককেন্দ্রিক অনুভূতি তাঁকে ঘিরে তাঁর কালের সমাজে সমগ্রতায় ব্যাপ্ত হয়ে এদেশ ও এদেশের মানুষকে অকৃত্রিম সৌহার্দ্যে নীল আকাশের নিচে প্রতিস্থাপিত করেছে। সদ্য বিগত ঘটনাপুঞ্জের পর্দা উন্মোচন করে বাস্তবতার মঞ্চে দাঁড় করিয়েছে। তাঁর কথা বলার ভঙ্গি বাস্তব ইতিহাসকে সাহিত্যরসে মণ্ডিত করেছে। ঘটনা পরম্পরায় গল্পের মত সম্মুখে টেনে নিয়ে যায়। কোথাও হোঁচট খায় না।

নানা কারণে স্বদেশে ও বিদেশে অধ্যাপক গোলাম আযমের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। তিনি ১৯২২ সালে ঢাকায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন ত্রিপুরা জেলার নবীনগর থানার বীরগাঁও গ্রামের এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশবে গ্রামে ও কুমিল্লা শহরে কয়েকটি স্কুল ও মাদরাসায় পড়ে ১৯৪০ সালে ঢাকায় আসেন। ১৯৪২ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (প্রাক্তন ঢাকা মুহসিনীয়া মাদরাসা) থেকে বৃত্তি নিয়ে হাই মাদরাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ কলেজ থেকেই আইএ পাস করে ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৫০ সালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে এমএ পাস করেন। এ বছরেই তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। ইতোমধ্যে উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত হাদীয়ে দীন মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (র) প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাআতে যোগ দেন এবং বিভিন্ন তবকায় কাজ করে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় মর্যাদা লাভ করেন। এ সময় অধ্যাপক আবুল কাসেম প্রতিষ্ঠিত তমদ্দুন মজলিসেও তিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। আমাদের ৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। তিনি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকেই দেশ সেবার উপায় বলে মনে করেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ এলে তিনি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ১৯৬৯ সালে

জামায়াতে ইসলামী তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আমীর পদে অধিষ্ঠিত হন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে ২০০০ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষা সমাজ গঠনের সহায়ক। আর ধর্ম ও সংস্কৃতি তাকে লালন করে, পরিচর্যা করে, বিকাশ লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সেকালে আমাদের দেশে চার পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল।

১. **সরকার পরিচালিত শিক্ষা:** এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা সকল সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ পেতো।

২. **কওমী মাদ্‌রাসা:** এটা সম্পূর্ণ বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা। এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা কওমী মাদ্‌রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম হওয়া ছাড়া আর কোনো কাজের সুযোগ পেতেন না।

৩. **আলীয়া মাদ্‌রাসা:** এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষিতরা আলীয়া পদ্ধতির মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা আর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে আরবী, ফার্সী ও উর্দুর শিক্ষকতা এবং বিবাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পেতেন।

৪. **নিউ স্কিম মাদ্‌রাসা:** এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষিতরা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মতো সর্বত্রই সুযোগ নিতে পারতেন।[১]

শিক্ষাব্যবস্থার এ বিশদ বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার সাথে শিক্ষার কিরূপ সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর ইতিহাস তুলে ধরা। অধ্যাপক গোলাম আযম আইএ পর্যন্ত নিউ স্কিম মাদরাসায় শিক্ষিত হয়েছেন। এ শিক্ষার মাধ্যমে তিনি ইংরেজি ও বাংলার সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষা এবং তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ পান।

এ পদ্ধতি চালু থাকলে আজকের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে যে মানবতা ও ধর্মহীনতার শিক্ষা তরুণ সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে তা থেকে অবিসংবাদিত রেহাই পেতো। ধর্মের সঙ্গে কর্ম শিক্ষার সমন্বয় ঘটত।

অধ্যাপক গোলাম আযম ঐতিহ্যবাহী ইসলামপন্থী পরিবারে কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছেন। খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলাফেরা, সভা-সমিতিতে নিয়ম-কানুন ও সামাজিক শিষ্টাচার তিনি পারিবারিক সূত্রে শিক্ষা লাভ করেছেন। আর তাই তাঁর জীবনে চলার পথকে সুগম করে দিয়েছে।

তিনি লিখেছেন–

"আমার আব্বা যদি এ সব বিষয়ে কড়াকড়ি না করতেন তাহলে তার সন্তানদের মধ্যে দীনের প্রতি যেটুকু কর্তব্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক শিক্ষার পরিবেশে তা কিছুতেই সম্ভব হতো না। আমাদের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠার কোন ব্যবস্থাই নেই। এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে যারা মুসলিম চেতনা নিয়ে

জীবন যাপনের চেষ্টা করছে তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের পিতা-মাতার প্রভাবেই তারা শিক্ষালয়ের অধার্মিক পরিবেশ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।"[২]

অধ্যাপক গোলাম আযমের জীবনে তাঁর দাদার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বলতে গেলে, তিনি তাঁর দাদারই মানস-সন্তান। দাদার বাস্তব শিক্ষা তাঁর জীবনের এতখানি দখল করে আছে যে, তিনি তাঁর অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দাদার জীবিত নিঃশ্বাস উপলব্ধি করেন। তাছাড়া তাঁর আব্বা-আম্মা, নানা-মামার প্রভাবও তাঁর জীবনের অনেকাংশ দখল করে আছে।

এছাড়া তিনি কৈশোরে ও যৌবনে যাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা নুর মুহম্মদ আযমী, নেয়ামত পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সালাম প্রমুখ তাঁর জীবনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা উজ্জীবনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে আছেন। তাবলীগ জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুল আযীয খুলনাভী এবং মাওলানা জিয়াউদ্দীন আলীগড়ীর (র) সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সাংবাদিকতায় মুসলিম বাংলার প্রাণপুরুষ মাওলানা আকরাম খানের স্নেহধন্য হবার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। নেযামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আতহার আলী (র)-এর প্রভাবও তাঁর জীবনে নগণ্য নয়। ইসলামী আন্দোলনের সূত্রে আরো বহু স্বনামধন্য আলেমের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছে। তাঁর জীবনে যাঁদের প্রভাব, বিশেষকরে জামায়াতে ইসলামী আন্দোলনের নেতা মাওলানা মওদূদী (র)-এর প্রভাব অবিস্মরণীয়; এঁদের অনেকের কথা তিনি বিস্তারিত বলেছেন।

তাবলীগ জামায়াত, তমদ্দুন মজলিস ও জামায়াতে ইসলামী সম্বন্ধে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। বস্তুত এ তিনটি সংস্থাকে তিনি মনে-প্রাণে আঁকড়ে ধরেছেন এবং ঈমান ও আকীদা নিয়ে এ তিনের মাধ্যমে তিনি তাঁর নিজের জীবনের কর্মপ্রেরণা ও প্রোষিত বাসনার স্ফূর্তি বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করেছেন।

তাবলীগ জামায়াতের কর্মসূচি যে অশিক্ষিত ও সামান্য শিক্ষিতের জন্য খুবই উপযোগী, এ কথা তিনি তাঁর বিশ্বাস ও কর্মে প্রমাণিত করেছেন। মুসলিম জিন্দেগী ও ইসলাম যে আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত, বিপন্ন এবং এ অবস্থার আশু নিরসন হওয়া যে একান্ত অপরিহার্য এ কথা তাঁর কথায় ও কাজে অনুদিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পাতায় পাতায় তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি এ তিন সংস্থার কাছে তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন–

"আমি তো তাবলীগে ধর্মীয় দিক এবং তমদ্দুনে রাজনৈতিক দিক পেয়ে সন্তুষ্টই ছিলাম, কিন্তু যখন জামায়াতে ইসলামীতে একই সাথে ইসলামের সবটুকু পাওয়া যাচ্ছে বলে অনুভব করলাম, তখন তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের বদলে জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমেই ইসলামের সকল দিকের দাওয়াত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।"[৩]

"আমি যেভাবে তাবলীগ জামায়াতে মনেপ্রাণে ডুবে ছিলাম তাতে মনে হয় যে, তমদ্দুন মজলিসের দাওয়াত না পেলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের মানসিকতা সৃষ্টি হতো কিনা জানি না। তিন বছর তমদ্দুন মজলিসে যা পেয়েছি এর বিবরণ পরবর্তী আলোচনায় আসবে, ইনশাআল্লাহ। জামায়াতে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনে আসার পথে তমদ্দুন মজলিসের অবদানকে আমি অকপটে স্বীকার করি। তাই আমার দ্বীনী জিন্দেগী গড়ার পথে তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের নিকট আমি চিরঋণী। তাবলীগ জামায়াত আমাকে মিশনারি জযবা দান করেছে। আর তমদ্দুন মজলিস ইসলামকে সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন হিসেবে ধারণা দিয়েছে।"[৪]

প্রকৃত প্রস্তাবে এ তিন সংস্থার মূল বক্তব্য ও উদ্দেশ্য পেশ করার মাধ্যমে তিনি ইসলামকে তুলে ধরেছেন। ইসলামই যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এ তথ্য এ গ্রন্থখানাকে আলাদা মর্যাদায় উন্নীত করেছে। এতে আরো রয়েছে এদেশের ইতিহাস, মুসলিম জাতির আগমন ও প্রসার, রাজনীতি, ধর্মনীতির ক্ষেত্রে মুসলিমের অংশগ্রহণ, রাজ্যের পটপরিবর্তন, চার পতাকার শাসনামল—ব্রিটিশপূর্ব আমল, ব্রিটিশ আমল, ব্রিটিশের অধীনতা মুক্ত পাকিস্তানি আমল এবং আরো পরে স্বাধীন বাংলাদেশ আমল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও মতামত। আরো সমাবেশ ঘটেছে বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, দুর্ভিক্ষ, কোলকাতা ও ঢাকায় বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ইতিহাস এবং মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মনৈতিক ও শিক্ষা সম্পর্কীয় বহুমাত্রিক আলোচনা।

১৭৫৭-এর পরাজয় ও নিপীড়িত রাজ্যচ্যুত মুসলিম জাতির দুঃখ-দুর্দশা, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব, দু'শো বছরের গোলামির শিকলে বন্দিদশা, মুসলমানদের রাজনীতিতে প্রবেশ, মুসলিম লীগের অভ্যুদয়, পাকিস্তান আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোল ও মন্বন্তরের কড়াল গ্রাস এবং স্বদেশী আন্দোলন, ঢাকা ও কোলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকা এবং হিন্দু সমাজের মুসলিম বিদ্বেষ ও নির্যাতন এবং হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য, দেশবিভাগ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও রাজনৈতিক বিপ্লব এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এ সবই 'জীবনে যা দেখলাম' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, ধর্ম ও সংস্কৃতি গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞানী, সকলের জন্য রয়েছে প্রচুর উপাত্ত।

আমাদের অতীত ইতিহাস বর্তমান প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করার এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য এ গ্রন্থের মতামত পর্যালোচনা অপরিহার্য। মানুষকে ধার্মিক হওয়ার জন্য, প্রকৃত মানুষ তথা মুসলিম হওয়ার জন্য পুস্তকখানি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে।

আত্মজীবনী লেখার কৈফিয়ত দান প্রসঙ্গে অধ্যাপক গোলাম আযম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

১. ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত জনশক্তির মধ্যে যারা আমাকে মহব্বত করেন, তারা এ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য হয়তো এ থেকে কিছু শিক্ষা বা উপদেশ সংগ্রহ করতে পারেন।

২. জীবনে যা কিছু দেখলাম তা প্রকাশ করা উপলক্ষে এর পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত এমন কিছু শিক্ষামূলক ঘটনা ও উপদেশমূলক বিবরণ পেশ করার সুযোগ পাবো, যা থেকে তারা উপকৃত হতে পারেন।

৩. আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তাঁর দীনের যেটুকু আলো দান করেছেন, তা থেকে যতটুকু সম্ভব এ উপলক্ষে পরিবেশন করা সহজ হবে।

অধ্যাপক গোলাম আযম রাজনীতিতে ধ্রুব নক্ষত্রের মত হঠাৎ উদিত না হলেও তিনি ধীরে ধীরে চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে যথা স্থানে পৌঁছে যান। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসার কারণে স্বভাবতই তাঁর শত্রুপক্ষ সৃষ্টি হয়। বিশেষকরে ইসলাম ও তওহীদবাদ বিরোধীদের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং বিরুদ্ধপক্ষ তাঁকে অবাঙ্গালি আখ্যা দিয়ে তাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের সময়কার, কংগ্রেসপন্থী মুসলিমদের প্রতি পাকিস্তান বাস্তবায়িত হওয়ার পরেও এ ধরনের আচরণ অবিদ্যমান ছিল। পাকিস্তানে থেকে যারা পাকিস্তানের 'সর' খেয়েছেন তাঁদেরই অনেকে পাক-বিরোধী ভারতপন্থী আন্দোলনে যোগদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও অনুরূপ আচরণ লক্ষণীয়। এ স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচারে অধ্যাপক গোলাম আযমের পরিচিতি ব্যাপকতা লাভ করেছে। তাঁর আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ সকলের মনে আস্থার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। তিনি হীন সমালোচনার উর্ধ্বে।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমরা জাতি হিসেবে নিদারুণভাবে ইতিহাস অবচেতন! আমাদের মধ্যে অনেকেই তার নিজের, তার পিতার এবং তার পিতামহের বড়জোড় তার প্রপিতামহের নাম ছাড়া চতুর্থ পূর্ব-পুরুষের নামটি সম্বন্ধে অজ্ঞ। আমরা কোত্থেকে এলাম, পশ্চাত পটভূমি কী, কিছুই জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এ কারণেই যখন তথাকথিত 'পণ্ডিতম্মন্য কুলীনরা' বাংলাদেশী সব মুসলমানকেই তফসীল শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর অনার্য হিন্দু শ্রেণীর বংশজাত বলে উল্লেখ করে এ জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য ও রক্তধারা নিয়ে বিদ্রূপ করে, তখন বিনা প্রতিবাদে আমরা সকলেই তা মেনে নেই এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা হযম করি। কেউ প্রতিবাদ করার মতো পাণ্ডিত্য বা সাহস দেখানোর প্রয়াস পাই না। পারিবারিক ইতিহাস প্রকাশ করা তো দুরের কথা স্বীয় ইতিহাস জানতেও ভয় পাই। আমার পিতা বা দাদার নাম যদি 'কুড়াইল্যা' বা 'পাপোছা' হয় তাহলে কিভাবে পরিচয় দিবো? তার চাইতে না জানাই অনেক ভালো। কোন রকমে মনের মধ্যে বাপের বিরুদ্ধে আক্রোশ দমন করে মনে মনে বলি, বাপটা কেমন অসভ্য মানুষ, তার পিতার নামটাও ঠিক করে রাখতে পারেনি। অবশেষে 'শেখ কুড়ালি মিয়া' নাম দিয়ে বাপের ও নিজের মান রাখি! সেদিক থেকে অধ্যাপক গোলাম আযম এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। তিনি তার পিতা ও তার পিতার পিতা অর্থাৎ দাদাকে জীবিত পেয়েছেন, সাহচর্য লাভ করেছেন। পিতামহের কাছ থেকে তাঁর পিতার ও

পিতামহের পরিচয় জেনেছেন। অর্থাৎ তাঁর পূর্ববর্তী চার পুরুষ– দাদার দাদা, দাদার পিতা, দাদা ও পিতা এবং তিনি নিজে আর দুই উত্তর পুরুষ– তার পুত্র ও তার নাতী–একুনে সাত পুরুষের ইতিহাস ঐতিহ্য ও রক্তের সাথে সুস্পষ্ট সম্বন্ধ এবং তাহযীব তামদ্দুনের সিলসিলা বিদ্যমান। আর তাঁর নানার দিক থেকে রক্তধারা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাজেই এদিক থেকে ইসলাম ও মুসলিম রক্ত এবং ঐতিহ্যের গোড়া শক্ত বলে তিনি সদর্পে দাবি করতে পারেন। এ সাত পুরুষের ইতিহাস তাঁর কাছে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। এদিক থেকে বিচার করলে অন্তত দু'শ বছর আগে এদেশের তার পূর্ব-পুরুষের আগমন ঘটেছে বলে সাক্ষ্য দেওয়া যায়।

অধ্যাপক গোলাম আযম গ্রন্থমধ্যে বার বার বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি পণ্ডিত নন, সাহিত্যিক নন; কিন্তু তাঁর রচনা যে সাহিত্য হয়েছে, এতে কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই। তিনি কবি নন; কিন্তু মনের গভীরে লালিত কাব্যময়তা না থাকলে নিছক বাস্তবকে এমন সরস, সতেজ করে বলার, সহৃদয় হৃদয়বেদ্য করে তোলার কাব্যগুণ থাকতে পারে না। তিনি যে ঘটনা বা দৃশ্য যেভাবে দেখেছেন, সেভাবেই, যা দেখেছেন তা-ই ভাষায় রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। বলা চলে, The best word in the best form. বাহ্য বস্তু নিজের করে নিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সর্বজনীন ভাষায় এ রূপদান শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরই কর্ম। ঐতিহাসিক সত্য (Historical truth)-ও সত্য যে বর্ণনাগুণে এমন কাব্যসত্য (Poetic truth) হয়ে উঠতে পারে, পাঠক তার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন তাঁর বক্তব্যের পরতে পরতে।

লেখক যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তিনি নিজের অন্তর পুরুষকে প্রকাশ করেন। দৃশ্যমনে বাহ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দকে আত্মগত অনুভূতির রসে সিক্ত করে প্রকাশ করেন। নিজের কথা, বাহ্য জগতের কথা, পরের কথা শিল্পীর মনোবীণায় যে সুরে ঝঙ্কৃত হয়, তার শিল্পসঙ্গত প্রকাশই যদি সাহিত্য হয়, তবে অধ্যাপক গোলাম আযমের 'জীবনে যা দেখলাম' জ্বলজ্যান্ত ইতিহাস হয়েও সাহিত্য হয়ে উঠেছে। A piece of Art হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষা ভাবের অনুগ, শব্দ চয়ন বিষয়ানুগ, বিশেষকরে কবিত্ববিলাস বিবর্জিত সরল-সহজ কথার মালা পাঠকের অজান্তেই অন্তরের অনুভূতি আকর্ষণে সমর্থ। রঙহীন বিচিত্র দৃশ্যাবলি রঙিন তুলিকার আঁচড়ে নয়; রঙহীন সাদামাঠা তুলিকার আঁচড়ে স্পষ্টতর হয়ে ফুঠে উঠেছে। বিবর্ণ নয়; রঙের ঔজ্জ্বল্যও নয়; বরং স্বাভাবিক বর্ণ-বিক্ষেপে সাধারণ চিত্র হয়ে উঠেছে অসাধারণ। ভাষায় যেমন আড়ষ্টতা নেই, তেমনি নেই অশুদ্ধি। প্রকৃতি, মন ও প্রকাশ যখন একই সমতলে অবস্থান করে তখনই তা হয় সার্থক সৃষ্টি।

লেখকের রসবোধ প্রশংসার্হ। ধারা বিবরণীর মত বর্ণনা দেওয়ার মাঝে মাঝে হাস্যরসের চুটকি পরিবেশন করতেও ভুল করেননি।

তিনি যখন কলেজে পড়েন, সে সময়ের ঘটনা। তিনি হোস্টেলের ডাক্তারকে বললেন ঘুম তাড়ানোর ঔষধ দিতে। ডাক্তার কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, বেটা ঘুম কমাবার ঔষধ চাও, ডাক্তাররা কোনদিন ঘুম কমাবার ঔষধ দেয় না। দিলে ঘুমের ঔষধই দেয়। আজ তুমি ঘুম কমাবার ঔষধ চাচ্ছ, একদিন আসবে যখন ডাক্তারের কাছে ঘুমাবার ঔষধ চাইবে।[৫]

মনে হয়, তিনি তাঁর জুনিয়র ফাইনাল পরীক্ষার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। সেখানে পরীক্ষার আগের দিন চা খেয়ে সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়ে কিভাবে পরের দিন পরীক্ষার হলে বার বার সামনের ডেস্কে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং হাত থেকে কলম পড়ে গিয়েছে আর ইনভিজিলেটর বার বার তা তুলে দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে যে পরীক্ষা খারাপ হয়েছে তা তিনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন।

১৯৩৮-৩৯ সালের কথা। কোলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান এ দু'দলের খেলার খবর রেডিওতে শোনার জন্য আমরা দল বেঁধে এক ইংরেজ জমিদার বাড়িতে যেতাম। সে জমিদার খুবই শৌখিন লোক ছিলো। তার এক অদ্ভুত হবি ছিলো। কুমিল্লার আদালতপাড়ার বড় রাস্তার পাশেই ঐ জমিদারের বিরাট বাড়ি ছিলো এবং তার বাড়ি বরাবর রাস্তায় বিরাট বিরাট গাছ ছিলো। বিকাল বেলায় রাস্তায় ও আশেপাশে বিচরণরত দশ-পনের বছর বয়সের ছেলেদেরকে ডেকে কিছু টাকা দিয়ে গাছে চড়তে বলতো। গাছে উঠার পর তাদেরকে তাদের যত রকম গালি জানা আছে চিৎকার করে সে সব গালি উচ্চারণ করার জন্য উৎসাহ দিতো। এতোগুলো ছেলে গালি দিতো আর নিচে সে হাততালি দিয়ে তাদেরকে স্বাগতম জানাত। নিচে নামার পর তাদেরকে আবার টাকা দিতো। সে অদ্ভুত তামাশা দেখার জন্য বহু লোক জড়ো হয়ে যেতো। আমি জানি না এমন অদ্ভুত সখ দুনিয়ার আর কোন লোকের আছে কিনা।[৬]

এক সাহিত্য সম্মেলনে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ ও কাজী মুতাহার হোসেনকে আনার দায়িত্ব পড়লো আমার উপর। সেকালে ঘোড়ার গাড়িই একমাত্র যানবাহন ছিলো। দু'জনকে একই গাড়িতে করে সম্মেলনে নিয়ে আসার পথে তাদের যে রসাত্মক বক্তব্য শুনলাম তা এখনও মনে আছে। কাজী সাহেব অধ্যক্ষ সাহেবের লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, "আপনি একটা কথাকে বুঝাতে গিয়ে যেভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেন তা অত্যন্ত উপাদেয়। কিন্তু আমি অতি সংক্ষেপে লিখায় অভ্যস্ত। তাই আমার পাঠক তৃপ্ত হয় কিনা জানি না।" অধ্যক্ষ সাহেব বললেন, "আপনারা বিজ্ঞানের মানুষ। ভিটামিন টেবলেট দিয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের পেট ভরে ডালভাত না খেলে তৃপ্তি হয় না।"

একবার পত্রিকায় খবর বের হলো যে, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। দেখতে গেলাম। তাঁর প্রশান্ত মুখে সব সময়ই সুন্দর হাসি দেখে আমি অভ্যস্ত। সালাম দিলাম। ঐ সুন্দর হাসি দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। জিজ্ঞেস

করলাম, "কী অসুখ? কেমন আছেন?" জওয়াবে বললেন, "এক পীরী সাদ বীমারী।" কথাটি ফারসি ভাষায়। এতটুকু ফারসি আমি বুঝলাম। এর অর্থ হলো "এক বার্ধক্য শত রোগ" অর্থাৎ বুড়ো হয়েছি, কত রোগই এখন হবে।[৭]

'৪৭-এর জুলাইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের নির্বাচন। ঢাকা হলের অরবিন্দ বোস ভিপি এবং আমি জিএস হওয়ার জন্য দাড়ালাম। আমরা দুইজনে দুসপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করি। চারটি হলে সব ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে হলো অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের বাসায় যেয়ে দেখা করার জন্য। রাতদিন খেটে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। দু'জনকে দুটো সাইকেলে একসাথে সারা শহরে ভোটারদের ঠিকানার তালিকা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ধরনা দিতে হয়েছে, যাতে কেউ বলতে না পারে যে তাদের কাছে যাওয়া হয়নি।

এ কঠিন পরিশ্রমের সুফ। পাওয়া গেলো। বিপুল ভোটে গোটা প্যানেল পাস করলো। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কোন প গাই পেল না। বিজয়ের আনন্দ এক অদ্ভুত অনুভূতি। প্রায় তিন সপ্তাহের কঠিন দৈহিক পরিশ্রম ও ক্লান্তি কেমন করে দূর হয়ে গেলো বুঝাই গেলো না। নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে আমরা দু'জন আবার সব হলের রুমে রুমে যেয়ে হাত মিলিয়ে রাত ১২টা পর্যন্ত হাসি মুখে "থ্যাঙ্ক ইউ" দিতে থাকলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাল কুচকিয়ে হাসি দিতে দিতে মুখমণ্ডলে ব্যথা বোধ হলো।[৮]

'জীবনে যা দেখলাম' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯২২ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিরিশ বছর সময়ের সুদীর্ঘ পরিসরে শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষা ও কর্মজীবনের বিস্তৃত বিবরণ এবং জীবনের দেখা অনেক বাস্তব কাহিনী তুলে ধরেছেন। পরবর্তী খণ্ড উত্তরকালের বর্ণাঢ্য কথাচিত্রে সমৃদ্ধ হবে– এ প্রত্যাশায় আমরা দিন গুণবো।

অধ্যাপক গোলাম আযমের 'জীবনে যা দেখলাম' সাম্প্রতিক কালের আমাদের ইতিহাস হিসেবে ভবিষ্যৎ গবেষকের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। গ্রন্থকারকে তাঁর এ কর্মের জন্য সাধুবাদ জানাই। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাঁর এই নিঃস্বার্থ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

কাজী দীন মুহম্মদ

জুন, ২০০২

---

১. গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৫৩, ২. ৮৭, ৩. ২৮৭, ৪. ২৮৭, ৫. ১০৯, ৬. ১২৯, ৭. ১৬৪, ৮. ১৮৩।

কবি আল মাহমুদ

অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের 'জীবনে যা দেখলাম' ধারাবাহিক রচনাটি দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হওয়ার প্রথম থেকেই আমি পাঠ করে এসেছি। এখন তাঁর রচনার প্রথম খণ্ড কামিয়াব প্রকাশন বই আকারে প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই বই অত্যন্ত সহায়ক হবে।

অধ্যাপক গোলাম আযম-এর মতো প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ এই উপমহাদেশে ক্রমাগত বিরল হয়ে এসেছে। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় এবং রাজনৈতিক বিনিময়ের কৌতূহল উদ্দীপক ঘটনা অনেকেরই অজানা। জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে তাঁর নেতৃত্ব এবং বিপদ-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসা বিষয়গুলো তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন, এর চেয়ে বড় কিছু হতেই পারে না। তিনি সাহসী মানুষ এবং সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী। তাঁর বয়স এখন আশির কোঠায়। কিন্তু তিনি অটুট স্বাস্থ্য এবং রাজনৈতিক ধীশক্তিসম্পন্ন। গত ৮০-র দশকে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মূলা দিয়ে জাতিকে এক ঘনায়মান রাজনৈতিক দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করেছেন। এতেই বুঝা যায়, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এই ৮০ বছর বয়সেও সতেজ এবং উদ্ভাবনাময়।

তাঁর জীবন-চরিত তাঁর শত্রু-মিত্র, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই একান্ত পাঠ্যবিষয়। মনে রাখতে হবে, তিনি কথাশিল্পী নন, ঔপন্যাসিক বা কবিও নন। তাঁর গদ্যভঙ্গি একটু চাঁচাছোলা, বাস্তবমুখী এবং লক্ষ্যভেদী। যারা তাঁর রচনা পাঠ করে চলেছেন, তারা জ্ঞানের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়েই তা পড়ছেন। আমরা আশা করি, তাঁর আগামী কিস্তিগুলোতে এমন সব রাজনৈতিক রহস্যের উদ্‌ঘাটন হবে, যা একমাত্র তিনি ছাড়া বলার কেউ নেই।

আমি এ জন্য আনন্দিত যে, এ গ্রন্থ রচনায় অধ্যাপক গোলাম আযমকে যারা উদ্বুদ্ধ করেছেন, আমিও তাদের একজন। বইটি যেভাবে এগুচ্ছে তাতে আশা করা যায় যে, তাঁর সম্বন্ধে এ দেশের কৌতূহলী মানুষের মধ্যে যত প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তার সঠিক জবাব বেরিয়ে আসবে। আমি তো আগেই বলেছি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপকদের জন্য এ বই এক অপরিহার্য আঁকড় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার নিজেরও কৌতূহলের কোন সীমা নেই। তাঁর অনেক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আমাদের মতো ব্যক্তিদের দুর্জ্ঞেয় বোধ হয়। যেমন, সহসা তিনি

আমীরে জামায়াতের পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন। কেন করেছেন, এর কোন ব্যাখ্যা নেই। এ কথা মেনে নেয়া যায় না যে, তিনি কোন অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে নতী স্বীকার করবেন। জেল-জুলুম, ফাঁসি ইত্যাদি যিনি তুচ্ছজ্ঞান করে সুদৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়ে এসেছেন এবং বিপুল রাজনৈতিক শত্রুতা মোকাবেলা করে নিজের নাগরিক অধিকার আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি তো সামান্য কোন অভ্যন্তরীণ সমালোচনা কিংবা চাপের কাছে পরাভূত হবার পাত্র নন। আমি একজন অল্পবুদ্ধি কবি এবং সাংবাদিক মাত্র। তাঁর এই অবসর গ্রহণের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারছি না। হতে পারে যে, তিনি এর মধ্যে কোন বৃহৎ কল্যাণ দেখতে পেয়েছেন। তিনি ইতিহাস নির্মাতা পুরুষ, অদম্য এবং অকুতোভয়। তাঁর দূরদৃষ্টি নিশ্চয়ই আমার মতো কবির চেয়ে প্রখর, দিগন্ত বিস্তৃত এবং অনাগত কালের দিকে নিবদ্ধ। তবু এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, বাংলাদেশের তথা এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত খুবই দুর্লভ। যিনি আগুণ ও গন্ধকের নদী পাড়ি দিয়ে একটি বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক দলকে সংঘটিত এবং সুদৃঢ় করে বিজয়ের তোড়নের সন্নিকটে এনে উপস্থিত করেছেন, এই সময়ে নেতৃত্বের পদ থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের ব্যাখ্যা থাকবে না কেন। আমি অল্পবুদ্ধি মানুষ বলেই এর ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করি এবং আশা করি 'জীবনে যা দেখলাম' গ্রন্থের আগামী কোন একটি খণ্ডে তিনি এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করে যাবেন। এ কথা সত্য নয় যে, তিনি বয়সের ভারে পীড়িত, স্মরণশক্তি দুর্বল কিংবা সৃজনশীল রাজনৈতিক উদ্ভাবনায় পরিশ্রম-বিমুখ। সর্বদিক দিয়েই তিনি সতেজ মানুষ, আমি মাঝে মধ্যে তাঁর সান্নিধ্য পাই বলে একথা বিলক্ষণ জানি। তাঁর বইটি অচিরেই এদেশের জ্ঞান সন্ধানী মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করবে, আমি এই আশা নিয়ে বসে থাকব।

আল মাহমুদ

জুন, ২০০২

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে

২০০২ সালের জানুয়ারিতে এ বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪/৫ মাসের মধ্যেই মুদ্রিত সব বই ফুরিয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। বইটির পাঠক-প্রিয়তায় আমি বেশ উৎসাহ বোধ করছি এবং লেখা অব্যাহত রাখায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

বইটির প্রকাশক একান্ত স্নেহভাজন হেলাল উদ্দীন এদেশের তিনজন প্রখ্যাত ব্যক্তির নিকট থেকে এ বইটি সম্পর্কে অতি মূল্যবান অভিমত ও মন্তব্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও অভিভূত হয়েছি। বয়সের ক্রম অনুযায়ী তাদের নাম উল্লেখ করছি– কবি, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ ড. কাজী দীন মুহম্মদ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও সাহিত্য সমালোচক জনাব আল মাহমুদ।

প্রথম জন বয়সে আমার শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বী, দ্বিতীয় জন আপন প্রিয় ভাই-এর মতো, আর তৃতীয় জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্নেহ ও ভালোবাসার আতিশয্যে আমাকে তাঁরা যত বড় করে দেখিয়েছেন আমি নিজেকে মোটেই তা মনে করি না। তবে আমার লেখা সম্পর্কে তাদের উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য আমার নিজের উপর আস্থা বৃদ্ধি করেছে। তাদের অভিমত আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং এ লেখা অব্যাহত রাখার প্রেরণা যুগিয়েছে। আল্লাহর দরবারে তাওফীক চাই এবং সবার নিকট দোয়া চাই, যাতে আমার জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত 'যা দেখলাম' তা লিখে রেখে যেতে পারি।

সৈয়দ আলী আহসানের মতো প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি, আমার লেখার "ভাষা সহজ, সুন্দর এবং সাবলীল" বলে সার্টিফিকেট দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করলেন। সহজ করে লেখা আমার সাধনা। এতে যদি আমি সফল হয়ে থাকি তাহলে এর জন্য মহান আল্লাহর প্রতি গভীর শোকরিয়া জানাই।

ড. কাজী দীন মুহম্মদের দীর্ঘ অভিমত পড়ে আমি সত্যিই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। তিনি বইটিকে ছত্রে ছত্রে নিবিড়ভাবে না পড়লে এভাবে লিখতে পারতেন না। তিনি বইটির অধ্যয়ন ও মূল্যায়নে এত সময় ব্যয় করে দীর্ঘ অভিমত লিখতে সক্ষম হয়েছেন বলেই আমি বিস্মিত হয়েছি। স্কুল জীবনে আমরা এক হোস্টেলে ছিলাম। একই প্রতিষ্ঠানে পড়েছি। আপন ভাইয়ের মতোই সম্পর্ক ছিলো তার সাথে। ঐ মহব্বতের সম্পর্ক হয়তো তাঁকে এ বিষয়ে এত গুরুত্ব দিতে বাধ্য করেছে।

আমার বই সম্পর্কে এমন চমৎকার বিশ্লেষণ তিনি করেছেন, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। দরদী সাহিত্য সমালোচকদের হাতে পড়লে আমার মতো ভ' াহিত্যিকের

লেখাও যে উন্নত সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য হতে পারে তা তাঁর লেখা থেকে উপলব্ধি করলাম। একটি পৃথক কাগজে কয়েকটি তথ্যগত ভুল ধরিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন।

বন্ধুবর কবি আল মাহমুদের পরামর্শেই আমি লেখা সংক্ষেপ করা থেকে বিরত রয়েছি। প্রাণ খুলে লিখছি। তিনি বইটি সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর মন্তব্য করে আমাকে প্রেরণা দান করেছেন এবং বই-প্রসঙ্গের বাইরে একটি বিষয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমি কেন আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলাম, এর ব্যাখ্যা দাবি করেছেন। বন্ধু হিসেবে সাক্ষাতে কৈফিয়ৎ তলব করলে আগেই জানাতাম। হয়তো আরো অনেকের মনে এ প্রশ্নটি থাকতে পারে। তাই এখানেই কৈফিয়ৎ দিচ্ছি।

আল্লাহর রহমতে বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছাত্র-ছাত্রী ও নারী-পুরুষ সংখ্যায় বিরাট। কিন্তু তাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মান আরো উন্নত হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য যা কিছু করণীয় তা দীর্ঘ দিন চিন্তা-ভাবনা করার পর স্থির করলাম। কিন্তু জামায়াতের সাংগঠনিক ব্যস্ততা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব আমার গোটা সময় দখল করে রাখায় ঐ কাজের জন্য কিছুতেই সময় ও শ্রম দিতে পারছিলাম না। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ও কর্ম-পরিষদ এবং মাজলিশে শূরায় আমার সাথীগণকে এ বিষয়ে কনভিন্স করতে দু'বছর লেগেছে। কবি সাহেবকে সে কথা বুঝাবার সুযোগ হয়নি বলেই তাঁর আপত্তি রয়ে গেছে। আমি আন্দোলন থেকে পালাইনি। আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থেই আমি কর্মরত। এ কাজটি আমাকেই করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য মনে করেই এ কাজে বাকি জীবন উৎসর্গ করলাম।

আমি অত্যন্ত সন্তোষ ও তৃপ্তির সাথে লক্ষ্য করছি যে, আমি আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ায় জামায়াতের নেতৃত্বে কোন শূন্যতা সৃষ্টি হয়নি। আমার বর্তমান কর্মসূচি হলো, 'নেতৃস্থানীয়দের মানোন্নয়ন।' আল্লাহ তাআলা এ মহান লক্ষ্যে আমাকে সফল করুন—এ দোয়াই সবার কাছে চাই।

গোলাম আযম
জুন, ২০০২

প্রকাশকের কথা

নয় খণ্ডে বিস্তৃত 'জীবনে যা দেখলাম' গ্রন্থটি স্মৃতিচারণমূলক। লিখেছেন, ইসলামী আন্দোলনের বরেণ্য নেতা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর, ভাষা সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষত মুসলিম বিশ্বে অধ্যাপক গোলাম আযম একজন সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন-সেমিনারে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে অলঙ্কৃত করে তিনি বিশ্বের খ্যাতিমান ইসলামিক স্কলারগণের কাছে বিশেষভাবে সম্মানীয়।

অধ্যাপক গোলাম আযম-এর নামটি বাংলাদেশের জনগণের কাছেও অতি পরিচিত। বিশেষত রাজনৈতিক কারণে। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে স্বার্থান্বেষী মহলের বিভিন্ন রকম অপপ্রচার তাঁর পরিচিতিকে ব্যাপকতা দান করেছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের চক্রান্ত চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। অধ্যাপক গোলাম আযম-এর জীবনবোধ, চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস, রাজনৈতিক দর্শন গণমানুষের মনে আস্থা সৃষ্টি করেছে। তিনি হয়েছেন উন্নীত, সম্মানিত।

একটি বিশ্বাসকে লালন করে স্রোতের প্রতিকূলে চলা অধ্যাপক গোলাম আযম-কে নিয়ে নানা কারণেই মানুষের মনে কৌতূহল রয়েছে। অনেকের মাঝেই তাঁকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিকদের পরামর্শ এবং আগ্রহে তিনি আত্মজীবনী লেখার সিদ্ধান্ত নেন। 'আত্মজীবনী লেখার কৈফিয়ত' শিরোনামের ভূমিকায় বই লেখার তিনটি কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বই প্রকাশের তাওফীক লাভ করে আমরা মহান মনিবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ্।

অধ্যাপক গোলাম আযম বাল্যকালে কঠোর ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। মাতৃকুলের দিক দিয়ে তিনি আব্দুল কাদের জিলানী (র)-এর উত্তরসূরি। ছাত্র জীবনের শেষ পর্যায়ে অধ্যাপক গোলাম আযম তাবলীগ জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত হন। কর্মজীবনে একই সাথে তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসে সক্রিয় ছিলেন। সর্বশেষে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের দায়িত্বও পালন করেন। দীর্ঘদিন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীরের দায়িত্ব পালনের পর ২০০০ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি অধ্যয়ন, লেখা-লেখি ও ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির

নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এ বইতে অধ্যাপক গোলাম আযম সহজ-সরল ভাষায় তাঁর জীবনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত বিবরণ আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

এতে অনেক অভিজ্ঞতাপ্রসূত দিক-নির্দেশনা, শিক্ষামূলক ঘটনা ও উপদেশমূলক বিবরণ রয়েছে, যা থেকে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীবৃন্দ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। এছাড়া যারা অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন, বইখানা তাদের বিবেচনাকে পরিশুদ্ধ করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর দীনের ওপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

অধ্যাপক গোলাম আযম

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	:	অধ্যাপক গোলাম আযম।
জন্ম	:	৭ নভেম্বর ১৯২২ সালে ঢাকায়।
পিতা	:	মাওলানা কাজী গোলাম কবির।
মাতা	:	সাইয়েদা আশরাফুন্নিসা।
পৈতৃক ঠিকানা	:	গ্রাম: বীরগাঁও, পোস্ট: বীরগাঁও, থানা: নবীনগর, জেলা: বি. বাঁড়ীয়া।
বর্তমান ঠিকানা	:	১১৯/২ কাজী অফিস লেন, মগবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এমএ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিভিন্ন দায়িত্ব

১৯৪৫-১৯৪৬	:	এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ।
১৯৪৬-১৯৪৭	:	জেনারেল সেক্রেটারি, হল ইউনিয়ন, ফজলুল হক মুসলিম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯৪৭-১৯৪৮	:	জেনারেল সেক্রেটারি, ডাকসু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯৪৮-১৯৪৯	:	জেনারেল সেক্রেটারি, পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ।
১৯৪৮ (নভেম্বর)	:	পূর্ব-বাংলার জনসাধারণের সর্বাত্মক দাবি, বাংলা ভাষাকে উর্দুর সাথে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান।
১৯৫০-১৯৫৫	:	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ।
১৯৫২-১৯৫৪	:	প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, তমদ্দুন মজলিস, রংপুর।
১৯৫২	:	ভাষা-আন্দোলনের দায়ে কারাবরণ।
১৯৫১-১৯৫৪	:	আমীর, তাবলীগ জামায়াত, রংপুর।
১৯৫৫	:	ভাষা আন্দোলনের দায়ে পুনরায় কারাবরণ।
১৯৫৭-১৯৫৯	:	সেক্রেটারি, জামায়াতে ইসলামী, পূর্ব-পাকিস্তান।
১৯৫৮	:	সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ, দৈনিক ইত্তেহাদ।

১৯৬৪	:	আইয়ুব খান জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রেক্ষিতে ৮ মাসের নির্বিচার কারাবরণ।
১৯৬৭-১৯৬৯	:	আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে (পিডিএম) পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্চলিক কার্যপরিষদ-এর জেনারেল সেক্রেটারি।
১৯৬৯	:	আইয়ুব খানের আমন্ত্রণে Democratic Action Committee (ড্যাক)-এর কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ।
১৯৬৯-১৯৭১	:	আমীর, জামায়াতে ইসলামী, পূর্ব-পাকিস্তান।
১৯৭৩-১৯৭৮	:	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নাগরিকত্ব হরণের পর লন্ডনে নির্বাসিত জীবনযাপন।
১৯৮০	:	বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফর্মুলা' উপস্থাপন।
১৯৯১-১৯৯৩	:	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর নির্বাচিত।
১৯৯২-১৯৯৩	:	বিএনপি সরকার কর্তৃক বিদেশী নাগরিক আখ্যায়িত করে কারারুদ্ধকরণ।
১৯৯৪ (জুন)	:	সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে নাগরিকত্ব পুনর্বহাল।
১৯৯৪-১৯৯৭	:	পুনরায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর নির্বাচিত।
১৯৯৬	:	তাঁর পূর্বেকার প্রস্তাব মতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফর্মুলা' সংযোজন।
১৯৯৮-২০০০	:	পুনরায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর নির্বাচিত।
১৯৯৯	:	ইসলাম ও জনগণের ইচ্ছার বিরোধী ভারতের তাঁবেদার আওয়ামী লীগ সরকারের উচ্ছেদের লক্ষ্যে চারদলীয় জোটের অন্যতম শীর্ষ নেতা।
২০০০	:	ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পর্যবেক্ষণ জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অভ্যর্থিত।
২০০২	:	বাংলাদেশ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতি জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ।
২০০২	:	ভাষা আন্দোলনের স্থপতি সংগঠন তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'মাতৃভাষা পদক' ২০০২ লাভ।

২০০৩	:	ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম কর্তৃক ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ও ইসলামী আন্দোলনে অকুতোভয় নেতৃত্ব দানের জন্যে সম্মাননা লাভ।
২০০০ (ডিসেম্বর)	:	মজলিসে শূরার কাছে বিশেষ আবেদনের প্রেক্ষিতে আমীরে জামায়াত-এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ।
২০০৪	:	কুরআনী সমাজ গঠনে বিশেষ অবদানের জন্যে 'কুরআন শিক্ষা সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড' ২০০৪ প্রাপ্তি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা

১৯৭৩ (জানুয়ারি)	:	সৌদী আরবের শহীদ শাহ্ ফয়সল-এর সাথে সাক্ষাৎ।
১৯৭৩ (মার্চ)	:	ত্রিপলিতে মুসলিম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে উপস্থিত মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ।
১৯৭৪ (জানুয়ারি)	:	দ্বিতীয়বার শাহ্ ফয়সলের সাথে সাক্ষাৎ।
১৯৭৪	:	রাবেতা-ই-আলম আল ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে অংশগ্রহণ।
১৯৭৫ (জুন)	:	বাদশাহ্ খালিদ-এর সাথে সাক্ষাৎ।
১৯৭৬	:	(i) লন্ডনে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত Islamic Council of Europe-এর আহ্বানে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণ। (ii) রিয়াদে ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত International Islamic Law Conference-এ যোগদান।
১৯৮০ (জুন)	:	International Islamic Federation of Students Islamic Students Organizations কর্তৃক সম্মাননা লাভ।
১৯৯৫ (জানুয়ারি)	:	রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে সৌদী আরব ও কুয়েত গমন।

বিদেশে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ

১৯৭২ (ডিসেম্বর)	:	World Association of Muslim Youth (ওয়ামি) গঠনের সময় রিয়াদে অনুষ্ঠিত International Islamic Youth Conference কর্তৃক আহূত সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন।
১৯৭৩ (জুলাই)	:	(i) Islamic Youth Conference at Tripoli. (ii) Anual Conference of Federation of Students Islamic Socities (Fosis), England. (iii) 11th Convention of Muslim Students

Association of America held at Michigan University.

(iv) Anual Conference of U.K. Islamic Mission.

১৯৭৭ : ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত International Federation of Students Organization-এর সভায় অতিথি বক্তা।

১৯৯৫ (মে) : তুরস্কে আয়োজিত রিফা পার্টির সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

১৯৯৫ (আগস্ট) : লন্ডনে ইসলামী সংস্থাগুলোর সম্মিলিত গণসম্বর্ধনায় প্রধান অতিথি।

১৯৯৫ (সেপ্টেম্বর) : (i) Islamic Society of North America-এর উদ্যোগে বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অতিথি বক্তা।

(ii) Muslim Ummah in America-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি।

১৯৯৬ (অক্টোবর) : (i) International Islamic Federation of Students Organization-এর উদ্যোগে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি।

(ii) ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামী সংস্থাগুলোর সম্মেলনে তুর্কি প্রধানমন্ত্রী ড. নাজমুদ্দীন আরবাকানের আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ।

১৯৯৯ (জানুয়ারি) : Islamic Mission Japan-এর বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি।

১৯৯৯ (জুলাই) : বাল্টিমোরে Islamic Circle of North America (ICNA)-এর বার্ষিক কনভেনশনে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি।

১৯৯৯ (আগস্ট) : ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত U.K. Islamic Mission-এর সম্মেলনে অতিথি বক্তা।

১৯৯৯ (আগস্ট) : ইংল্যান্ডের শেফিল্ডে অনুষ্ঠিত U.K. Islamic Mission-এর সম্মেলনে অতিথি বক্তা।

২০০১ (সেপ্টেম্বর) : আমেরিকার শিকাগোতে অনুষ্ঠিত Islamic Society of North America (ISNA)-এর বার্ষিক মহাসম্মেলনে অতিথি বক্তা।

২০০১ (সেপ্টেম্বর) : Muslim Ummah in America-এর উদ্যোগে আয়োজিত শিকাগো শাখার সম্মেলনে প্রধান বক্তা।

২০০১ (সেপ্টেম্বর) : Muslim Ummah in America-এর উদ্যোগে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান বক্তা।

২০০১ (অক্টোবর)	:	ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার শহরে অনুষ্ঠিত Islamic Forum Europe-এর সম্মেলনে প্রধান বক্তা।
২০০১ (অক্টোবর)	:	দাওয়াতুল ইসলাম ইউ.কে এন্ড আয়ার-এর উদ্যোগে আয়োজিত ২দিন ব্যাপী সম্মেলনে প্রধান বক্তা।
২০০১ (নভেম্বর)	:	দুবাই সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক কুরআন পুরস্কার পরিষদের সেমিনারে প্রধান বক্তা।
২০০৭ (আগস্ট)	:	দাওয়াতুল ইসলাম ইউ কে এন্ড আয়ার কর্তৃক সম্বর্ধনা।

পাসপোর্ট আটক

১৯৯৯ (নভেম্বর)	:	নবায়নের উদ্দেশ্যে জমা দেয়া পাসপোর্ট আওয়ামী সরকার কর্তৃক আটক।
২০০০ (মার্চ)	:	পাসপোর্ট আটকের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা দায়ের।
২০০০ (জুন)	:	পাসপোর্ট ফেরত দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি হাই কোর্টের নির্দেশ।
২০০০ (জুলাই)	:	হাই কোর্টের রায় স্থগিত করার সরকারের আবেদন নামঞ্জুর।
২০০০ (সেপ্টেম্বর)	:	পাসপোর্ট ফেরত দানে হাই কোর্টের নির্দেশ অমান্য করায় সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা।
২০০০ (অক্টোবর)	:	সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক আপিল দায়ের।
২০০১ (জানুয়ারি)	:	সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সরকারের প্রতি পাসপোর্ট ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়; কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অন্যায়ভাবে বিলম্ব করে। যার ফলে ঐ বছর হজ্জে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা যায়নি। অনেক চেষ্টার পর ২৭ ফেব্রুয়ারি পাসপোর্ট ফেরত পাওয়া যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান

১৯৫৭	:	তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মাদ্‌রাসা বন্ধ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সেক্রেটারি।
১৯৬২	:	পূর্ব-পাকিস্তান জমিয়াতুল মুদাররেসীন-এর উদ্যোগে Islamic Arabic University গঠনের উদ্দেশ্যে এক ওলামা সম্মেলনের আহ্বান করা হয়। উক্ত সম্মেলনে Islamic Arabic University কায়েমের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির অন্যতম সদস্য।

১৯৬৩	:	ইসলামী ঐতিহ্যের স্মারক তা'মীরুল মিল্লাত মাদ্‌রাসা তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত।
১৯৭৮	:	প্রফেসর গোলাম আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় Islamic Education Committee গঠিত হয়। পরবর্তীতে তাঁর তত্ত্বাবধানে Islamic Education Society গঠিত হয়। এ সোসাইটি জ্ঞানগর্ভ লেখনি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান ও ইসলামী শিক্ষার আলোকে পাঠ্যবই রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন এবং ৫০০ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যের প্রচেষ্টা

১৯৭৮ (সেপ্টেম্বর)	:	'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' পুস্তিকায় সকল ইসলামী শক্তিকে এক প্লাটফর্মে সমবেত হওয়ার রূপরেখা প্রদান।
১৯৮১ (ডিসেম্বর)	:	ঐ রূপরেখা অনুযায়ী 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' নামক ব্যাপকভিত্তিক ঐক্যমঞ্চ গঠন।
১৯৯৪	:	ইসলামী ঐক্যের অগ্রগতি সম্পর্কে 'ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা' শিরোনামে পুস্তিকা রচনা।
১৯৯৪ (অক্টোবর)	:	ঢাকাস্থ আল ফালাহ মিলনায়তনে ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে ইসলামী ঐক্য গঠনের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান।
১৯৯৫ (নভেম্বর)	:	বৃহত্তর ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী হাটহাজারী ও পটিয়া মাদ্‌রাসার মুহতামীমদ্বয়ের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ।
১৯৯৫ (ডিসেম্বর)	:	মুহতামীমদ্বয় কর্তৃক চারদফা প্রস্তাব পেশ।
১৯৯৬	:	চারদফা প্রস্তাব গ্রহণ করে পত্রের উত্তর প্রদান।
১৯৯৭	:	খুলনায় অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে ইসলামী ঐক্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা।
১৯৯৮ (জানুয়ারি)	:	গওহারডাঙ্গা মাদ্‌রাসার মুহতামীম, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমীরে শরীয়াত ও মহাসচিবের নিকট পত্র প্রেরণ।
১৯৯৮	:	১৯৭৮ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ২০ বছর ধরে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়ে 'ইসলামী ঐক্যমঞ্চ চাই' নামক পুস্তিকা রচনা।

অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে লিখিত বই

১. অধ্যাপক গোলাম আযমের সংগ্রামী জীবন –মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

২. সংগ্রামী জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম –মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

৩. জননেতা গোলাম আযম –শেখ আখতার হোসেন

৪. Prof. Ghulam Azam : A Profile of struggle in the cause of Allah
- Muhammad Nuruzzaman

৫. এক সোনার মানুষের গল্প –গাজী খলিলুর রহমান

অধ্যাপক গোলাম আযম কর্তৃক রচিত বই

১. সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ (তিন খণ্ডে সমাপ্ত)
২. সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ (ত্রিশপারা একত্রে; অখণ্ড)
৩. সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ (আয়াত ও টীকা ব্যতীত শুধু বাংলা, অখণ্ড)
৪. আমপারা সারসংক্ষেপ
৫. জীবনে যা দেখলাম (৯ খণ্ডে সমাপ্ত)
৬. জীবন্ত নামায
৭. মযবুত ঈমান সহীহ ইলম ও নেক আমল
৮. ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা
৯. শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা
১০. পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়
১১. সৎ লোকের এতো অভাব কেন
১২. রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা
১৩. আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব ও পদ্ধতি
১৪. বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার ইতিহাস
১৫. মুমিনের জেলখানা
১৬. বিয়ে তালাক ফারায়েয
১৭. সীরাতুন্নবী (স) সংকলন
১৮. আমার দেশ বাংলাদেশ
১৯. বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটনাবহুল '৭৫ সাল
২০. স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন
২১. ইসলাম ও দর্শন
২২. পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন
২৩. আলেম সমাজ ও দীনদারদের খিদমতে কতক জরুরি প্রশ্ন

২৪. তাওহীদ, শিরক ও তিন তাসবীহর হাকীকত
২৫. ইসলাম ও বিজ্ঞান
২৬. মানবজাতির স্রষ্টা যিনি বিধানদাতাও একমাত্র তিনি
২৭. খাঁটি মুমিন হতে হলে তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে
২৮. ইসলামী আন্দোলন : সাফল্য ও বিভ্রান্তি
২৯. আসুন আল্লাহর সৈনিক হই
৩০. মনটাকে কাজ দিন
৩১. রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন?
৩২. একজন মানুষ যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক
৩৩. প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা
৩৪. আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্ক
৩৫. তাকদীর তাওয়াক্কুল সবর শোকর
৩৬. নাফস রূহ কালব
৩৭. দীন ইসলাম শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ
৩৮. আল্লাহর দীন কায়েমই পার্থিব উন্নতি ও সুখ-শান্তি লাভের উপায়
আযানের মাধ্যমে কাদেরকে নামাযের জন্য ডাকা হয়
৩৯. ইসলামকে কেবল ধর্ম নয় দীন হিসেবেও মানতে হবে
৪০. মুমিনের প্রথম কাজই হলো আল্লাহর দিকে ডাকা
৪১. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি
৪২. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
৪৩. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
৪৪. ইসলাম ঐক্যমঞ্চ চাই
৪৫. খাঁটি মুমিনের সহীহ জযবা
৪৬. বাইয়াতের হাকীকত
৪৭. আদর্শ রুকন
৪৮. আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন
৪৯. রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা
৫০. পলাশী থেকে বাংলাদেশ
৫১. জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি
৫২. মসজিদের ইমামদের মর্যাদা ও দায়িত্ব
৫৩. অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
৫৪. মিডিয়ার মুখোমুখি অধ্যাপক গোলাম আযম

৫৫. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী
৫৭. বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি
৫৮. ইকামাতে দীন ও খিদমতে দীন
৫৯. নবী জীবনের আদর্শ
৬০. ইসলাম ও গণতন্ত্র
৬১. দৈনিক ইনকিলাবের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযম-এর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার
৬২. জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি
৬৩. কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি উদ্ভাবন, প্রস্তাবনা ও আন্দোলন
৬৪. ভারতীয় আগ্রাসন ও বাঙ্গালী মুসলমান
৬৫. রাজনৈতিক দলের সংস্কার
৬৬. আমার বাংলাদেশ
৬৭. চিন্তাধারা
৬৮. স্টাডি সার্কেল
৬৯. ইকামাতে দীন
৭০. আদম সৃষ্টির হাকীকত
৭১. মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন? প্রতিকারই বা কী?
৭২. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ
৭৩. যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ
৭৪. দীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা
৭৫. কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচি
৭৬. কুরআন বুঝা সহজ
৭৭. আল্লাহর দুয়ারে ধরনা
৭৮. মুসলিম মা-বোনদের ভাবনার বিষয়
৭৯. প্রশ্নোত্তর
৮০. ইসলামে নবীর মর্যাদা
৮১. বিশ্বনবীর চরিত্র গঠনপদ্ধতি
৮২. ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
৮৩. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা
৮৪. কিশোর মনে ভাবনা জাগে
৮৫. ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন
৮৬. আধুনিক পরিবেশে ইসলাম

৮৭. অধ্যাপক গোলাম আযমের কলম থেকে

৮৮. শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান

৮৯. শেখ হাসিনার দুঃশাসনের ৫ বছর

৯০. শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান

৯১. আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন

৯২. দেশ গড়ার ডাক

৯৩. Islamic Civilization Vs Western Civilization

৯৪. Islam the only divine & complete code of life

৯৫. The Establishment of Deen Islam

৯৬. Political Thoughts of Abul A'la Mawdudi

৯৭. Address of Allah.

উল্লেখ্য, অধ্যাপক গোলাম আযম কর্তৃক রচিত কয়েকটি বই ইতোমধ্যে অনুবাদ হয়েছে ইংরেজি, উর্দু, তামিল ও অহমিয়া ভাষায়।

সংকলনে

নাজমুল হক

একান্ত সচিব

অধ্যাপক গোলাম আযম

সূচিপত্র

আমার বাল্যকাল	৪১
শহর ও গ্রামের পার্থক্য	৪১
আমার কৈশোর	৪২
গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার স্মৃতি	৪২
সেকালে ঢাকা শহরের আকর্ষণ	৪৪
সদরঘাট	৪৪
চকবাজার	৪৫
আমার প্রাথমিক শিক্ষা	৪৫
প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা	৪৬
সেকালের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা	৪৮
বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা	৫০
সরকারি আলীয়া মাদ্‌রাসা	৫১
নিউ স্কীম সিস্টেম	৫১
নিউ স্কীম সিলেবাস	৫২
চার রকম শিক্ষাব্যবস্থা	৫৩
আমার প্রাইমারী পরবর্তী শিক্ষা	৫৪
জুনিয়র ফাইনাল পরীক্ষা	৫৫
কুমিল্লায় শিক্ষা জীবন	৫৬
কুমিল্লা হাই মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণ	৫৭
কুমিল্লায় লজিং পরিবর্তন	৫৮
কুমিল্লায় মাদ্‌রাসায় পাঠ্যসূচির বাইরের তৎপরতা	৫৮
কুমিল্লায় রাজনীতির হাতেখড়ি	৫৯
প্যালেস্টাইন ইস্যু	৫৯
আমার জীবনে জনসভায় প্রথম বক্তৃতা	৬০
আমাদের গ্রাম	৬১
বিদ্যুৎ ও গ্রাম	৬২
গ্রামীণ কালচার	৬২
সেকালের গ্রামে বিয়ে-শাদী	৬৪
আমার থানা ও জেলা	৬৫

কুমিল্লা শহরের বৈশিষ্ট্য	৬৬
সর্বক্ষেত্রে হিন্দু প্রাধান্য	৬৭
আমার বংশ পরিচয়	৬৭
আমাদের বংশের দৈহিক গড়ন	৬৭
আমার উপরে দাদার প্রভাব	৭০
দাদার মৃত্যু	৭১
ঢাকায় আমার পাঠ্যজীবন	৭৩
স্কাউট আন্দোলন	৭৪
আমার হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা	৭৫
পরীক্ষার পূর্বে প্রচণ্ড জ্বর	৭৬
আমার ইসলামী জীবন গঠন	৭৭
ওয়ায শুনবার নেশা	৭৮
ইসলামী বই পড়ার আগ্রহ	৮০
আরো কিছু বই-এর সন্ধান	৮১
ধর্মীয় ব্যাপারে আব্বার কড়াকড়ি	৮২
ঢাকায় ইসলামী জ্ঞান চর্চা	৮৭
মাওলানার সাথে আমার সম্পর্ক নিয়মিত জারি থাকল	৮৯
ছাত্র জীবনের পর	৮৯
জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা ফরিদপুরী	৯০
আমার জীবনে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (র) প্রভাব	৯২
ইসলামী সেমিনার আন্দোলন	৯৩
মাওলানা ফরিদপুরীর সাথে গাইবান্ধা সফর	৯৩
মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-এর সান্নিধ্য	৯৪
মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী (র)-এর সান্নিধ্য	৯৬
অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য	৯৮
বিজ্ঞানের প্রতি আমার ঝোঁক	৯৯
আমার ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা	১০০
ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি	১০১
আইএ ক্লাসের শিক্ষকগণ	১০১
আমার হোস্টেল জীবন	১০২
কলতাবাজার হোস্টেল	১০২
কলতাবাজার হোস্টেলে আমার হোস্টেল মেটদের কয়েকজন	১০৩

কলতাবাজার হোস্টেল স্থানান্তর	১০৫
নওয়াব গেট হোস্টেল	১০৬
প্যারাডাইস হোস্টেল	১০৮
সেকালের ঢাকা শহর	১০৯
১৯০৫ সালের পর ঢাকা শহর	১১০
১৯৪৭ পরবর্তী ঢাকা শহর	১১১
১৯৭১-এর পরের ঢাকা শহর	১১২
ঢাকা শহরে আমাদের বাড়ি	১১৩
বাগান বাড়ির অন্যান্য শরীক	১১৪
সেকালের জমির মূল্য	১১৫
আমরা যখন বসবাস শুরু করি	১১৫
ঐ তের বিঘা বাগানের বর্তমান অবস্থা	১১৬
ভাই-বোনদের মধ্যে জমি বন্টন	১১৭
আমার বাসস্থান সংস্কার	১১৮
আমার প্লটে বিল্ডিং তৈরির প্ল্যান	১১৯
বিল্ডিং-এর কাজ শুরু হলো	১২০
আমার নানার বংশ	১২৩
এ পরিবারের সাথে দাদার সম্পর্ক	১২৫
আব্বার বিয়ে	১২৫
গ্রামে আম্মার দশা	১২৬
ঢাকায় আম্মার বেড়ানো	১২৭
আমার জীবনে খেলাধুলা (প্রাইমারী ও জুনিয়ার পর্যায়ে)	১২৮
ছাত্রজীবনে কুমিল্লায়	১২৮
ছাত্রজীবনে ঢাকায়	১৩০
ছাত্রজীবনের পর	১৩১
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে	১৩২
খেলা দেখার নেশা	১৩৩
খেলা সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি	১৩৩
বাংলাদেশে ক্রিকেটের বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা	১৩৪
ক্রিকেট-রাজনীতি	১৩৬
ভারত বনাম পাকিস্তান ে া	১৩৬
আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা	১৩৯

কোন্ বিষয়ে অনার্স নেওয়া হবে ১৩৯
কোন্ হলে ভর্তি হব ১৪০
হাসিনা মঞ্জিল ১৪২
বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু ১৪৩
মহাচিন্তায় পড়লাম ১৪৪
ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ১৪৬
১৯৪০ থেকে ৪৬ ঃ ঢাকার রাজনীতি ১৪৮
জনাব শামসুল হক ১৪৯
শেরে বাংলার বিদ্রোহ ১৫০
মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশেম ১৫১
পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি ১৫২
৪৫-৪৬ সালের নির্বাচন অভিযান ১৫৪
৪৫ ও ৪৬-এর নির্বাচন ১৫৪
সেকালে হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ১৫৫
শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ১৫৬
সহশিক্ষা সত্ত্বেও ১৫৭
সাংস্কৃতিক অঙ্গন ১৫৭
ছাত্র রাজনীতি ১৫৮
হল ইউনিয়ন নির্বাচন ১৫৮
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমার আকর্ষণ ১৬১
বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬২
সাহিত্য সংগঠন ১৬৩
আমি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবী নই ১৬৭
একটি উদাহরণ ১৬৮
সাংস্কৃতিক অঙ্গন ১৭০
নাটক ও অভিনয় ১৭১
গান ১৭৩
বিএ পাসের পর ১৭৪
কোথায় এমএ পড়ব? ১৭৪
ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে ১৭৫
আমার কোলকাতা পড়া হলো না ১৭৬
হল ইউনিয়ন নির্বাচনে আমার অংশগ্রহণ ১৭৭

ছাত্র রাজনীতি	১৭৮
বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন নির্বাচন	১৮০
১৯৪৫-৪৬ সালের বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন নির্বাচন	১৮১
বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের নির্বাচন পদ্ধতি	১৮২
১৯৪৭-৪৮ সেশন	১৮২
ড. মাহমুদ হোসাইনের সম্বর্ধনা	১৮৪
প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান	১৮৫
এমএ ফাইনাল পরীক্ষা	১৮৭
তাবলীগ জামায়াতের আকর্ষণ	১৮৮
তাবলীগী তালীম	১৮৯
পরীক্ষা কেমন দিলাম	১৯১
তাবলীগে আকৃষ্ট হলাম	১৯২
তাবলীগ জামায়াতের টারগেট	১৯৩
এমএ পরীক্ষার পর তাবলীগী চিল্লায়	১৯৩
তাবলীগের তাশকীল পদ্ধতি	১৯৪
তিন চিল্লায় রওয়ানা	১৯৫
নারায়ণগঞ্জ রওয়ানা	১৯৬
তাবলীগের কর্মসূচি	১৯৬
নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জ নৌকা ভ্রমণ	১৯৮
এ দশ দিনের অর্জন	১৯৯
একটা ছোট্ট ঘটনা	১৯৯
তাবলীগের আমীরের দায়িত্ব	২০০
আমীরের দায়িত্ব পালন শুরু	২০১
গ্রামাঞ্চলে সফর	২০২
আমার ইমারতের ২৫ দিন	২০৩
তাবলীগের তালীম পদ্ধতি	২০৩
শিক্ষক যিনি তিনি এভাবে বলবেন	২০৪
জীবন্ত নামায	২০৬
তাবলীগে আমার দ্বিতীয় চিল্লা দিল্লীতে	২১১
উর্দু শেখার সূচনা	২১১
বিশ্ব তাবলীগ জামায়াতের কেন্দ্রে পৌঁছলাম	২১২
হযরতজীর বক্তব্য	২১৩

তাবলীগী চিল্লায় দিল্লী থেকে বিজনোর	২১৫
বিজনোর জেলা শহরে ৫ দিন	২১৬
বিজনোরের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা	২১৭
দিল্লী থেকে ঢাকা	২১৭
আমার তৃতীয় চিল্লা	২১৮
দিনাজপুর থেকে চিল্লা শুরু	২১৯
জনগণ থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়	২২০
দিনাজপুরে তিনদিন	২২২
অভদ্র আচরণের আরেকটি উদাহরণ	২২৩
রংপুরে তিন দিন	২২৫
মাওলানা কেরামত আলীর মাযার	২২৬
তিন চিল্লা সমাপ্ত	২২৭
এমএ পাস করলাম	২২৭
একাউন্টেন্ট জেনারেলের সাথে সম্পর্ক	২২৮
একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিস ইউডি ক্লার্কের চাকরির প্রস্তাব	২২৯
একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে বড় পদের সুযোগ	২৩০
ইউডি ক্লার্কের পদ ছেড়ে দিলাম	২৩১
রংপুর কারমাইকেল কলেজের নিয়োগপত্র পেলাম	২৩১
আল্লাহর মহিমা	২৩২
কলেজে দুজন অধ্যাপকের সাথে পরিচয় হলো	২৩২
রংপুর কারমাইকেল কলেজে যোগদানের প্রস্তুতি	২৩৩
কারমাইকেল কলেজে যোগদান	২৩৩
ক্লাস নেওয়া শুরু হলো	২৩৪
টিচার্স কমন রুমে	২৩৭
সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নতি শুরু	২৩৭
'৪৭-এ যদি ভারত বিভাগ না হতো	২৩৮
'৪৭-এর ভারত বিভাগ কি ভুল ছিল?	২৩৯
রংপুর কলেজের কথা বলতে গিয়ে	২৪০
বিএ ক্লাসে	২৪০
রংপুর কারমাইকেল কলেজ ঃ পরিবেশ ও মর্যাদা	২৪০
অধ্যাপকদের সামান্য বেতন	২৪১
রংপুরকে ভালবেসে ফেললাম	২৪৪

আমার প্রিয় সাইকেল	২৪৪
রংপুরের মানুষ	২৪৫
কলেজে নামাযের ব্যবস্থা	২৪৬
বার্ষিক মিলাদের প্রধান অতিথি	২৪৭
প্রধান অতিথির বিচিত্র অভিজ্ঞতা	২৪৮
প্রথম অভিজ্ঞতা	২৪৮
দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা	২৫০
আমার বক্তৃতার বিষয়	২৫৪
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন	২৫৫
ব্রিটিশ আমলে	২৫৫
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা	২৫৬
'৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি	২৫৭
জেলের প্রথম অভিজ্ঞতা	২৫৮
আমার বিয়ে	২৫৯
মেয়ে তালাশ চলল	২৬০
মাওলানা আবদুস সুবহানের পরিচয়	২৬০
আমার জন্য মেয়ে তালাশ	২৬১
পাত্রী সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলি	২৬৩
বিয়ের হাঙ্গামা	২৬৪
বিয়ের অনুষ্ঠান	২৬৬
মোহর ও যৌতুক	২৬৮
শালীন বিয়ে	২৬৯
আমার বিয়ের অনুষ্ঠানের পর	২৭০
রুসূমাতের অনুষ্ঠান	২৭০
অনৈসলামী প্রথা	২৭১
ধনীদের নৈতিক শিক্ষা	২৭২
স্ত্রীকে নিয়ে চান্দিনা প্রত্যাবর্তন	২৭৩
বিয়ে এক মহা ঘটনা	২৭৩
আমার জীবনে বিয়ের প্রতিক্রিয়া	২৭৪
স্নেহের শাসনের উদাহরণ	২৭৫
আরো একটি অনুভূতি	২৭৬
বিয়ে জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট	২৭৭

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব	২৭৮
ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অবিবাহিত থাকা	২৭৯
অবিবাহিত জীবনে কি সুখ আছে?	২৮০
মুসলিম-অমুসলিম বিয়ে	২৮২
তাবলীগ জামায়াত একটি ধর্মীয় আন্দোলন	২৮৩
আমার তমদ্দুন মজলিসে যোগদান	২৮৫
তমদ্দুন মজলিসের দাওয়াত	২৮৫
আমি তমদ্দুন মজলিসের নিকট চিরঋণী	২৮৭
ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেওয়ার গুরুত্ব	২৮৭

১.

৭ নভেম্বর ২০০১ সালে আমার বয়স ৭৯ পুরা হয়ে ৮০ শুরু হলো। এটা দীর্ঘ জীবনই বলা যায়। কারণ নবী করীম (স) বলেছেন, 'আমার উম্মতের বয়স ৬০ থেকে ৭০-এর মধ্যে থাকবে। অল্পকিছু লোক এর চেয়ে বেশি বয়স পাবে।' সে হিসেবে ৯ বছর আগেই আমার সাধারণ বয়সসীমা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি গ্রেইসে আছি।

এ দীর্ঘ জীবনে যা কিছু দেখলাম, শিখলাম, জানলাম এবং বুঝলাম তা আমি লিখে যেতে চাই। হয়তো এ লেখা যারা পড়বে, তাদের উপকারে আসতে পারে। অনেক সময় সাধারণ লোকের জীবন থেকেও শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়।

আমার বাল্যকাল

জন্ম আমার ঢাকা শহরে হলেও আমার বাল্যকাল গ্রামেই কেটেছে। ১৯২২ সালে ৭ নভেম্বর ঢাকা শহরে লক্ষ্মীবাজার এলাকায় 'মিয়া সাহেবের ময়দান' নামে পরিচিত এক ঐতিহ্যবাহী পীর বাড়িতে আমার জন্ম হয়। এটা আমার নানার বাড়ি। আমি আমার পিতামাতার প্রথম সন্তান। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী প্রথম সন্তান মায়ের পিতার বাড়িতে জন্ম নেয়। এ কারণেই আমার আসল বাড়ি গ্রামে হলেও শহরেই জন্ম হয়। আম্মা প্রতি বছরই এক থেকে দেড় মাস পিতার বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। এ সুযোগে বাল্যকালেই গ্রাম ও শহরের সাথে আমার পরিচয় হয়।

ক্লাস সিক্স পর্যন্ত আমার লেখাপড়া গ্রামেই হয়। প্রথমে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার পর আরবী শিক্ষার প্রয়োজনে আমাদের গ্রাম থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে বড়াইল জুনিয়র মাদ্‌রাসায় আবার ক্লাস থ্রিতেই ভর্তি হই এবং সেখানে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ি। এ সময়টুকুকে আমি বাল্যকাল হিসেবে গণ্য করি। এভাবে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামীণ পরিবেশেই বেড়ে উঠি। প্রথম ক'বছরের কথা মনে থাকাতো স্বাভাবিক নয়। তবে যখন থেকে আমার স্মৃতিতে বিভিন্ন ঘটনা সঞ্চিত আছে তা থেকে আমি শহর ও গ্রামের পার্থক্যটা তুলে ধরতে পারি।

শহর ও গ্রামের পার্থক্য

গ্রামে নিকটবর্তী কয়েক গ্রাম পর্যন্ত চলাফেরা করতে পারতাম। শুকনার দিনে দুই গ্রামের মাঝখানে বিরাট কৃষিভূমি খেলার ময়দানেই পরিণত হতো। আমাদের গ্রামটি ইউনিয়নের কেন্দ্র হওয়ায় আশেপাশের গ্রাম থেকে ছেলেরা আমাদের স্কুলে পড়তে আসতো। তখন প্রতি গ্রামেই স্কুল ছিলো না। তাই একেবারে ১ম শ্রেণী থেকেই কয়েক গ্রামের ছেলেও আমার সহপাঠী ছিলো। তাদের সাথে কখনও কখনও তাদের গ্রামে গিয়েছি।

কিন্তু যখনই শহরে বেড়াতে আসতাম, তখন পাশাপাশি মামাদের কয়েকটি বাড়ির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে যেতাম। বাড়ির বাইরেই রাস্তা। গাড়ি-ঘোড়ার ভয়ে মুরুব্বীরা বাইরে যেতে দিতেন না। ফলে আশেপাশের বাড়ির ছেলেপেলেদের সঙ্গে মিশবারও সুযোগ ছিলো না। সমবয়সী মামাতো ভাইদের সংখ্যাও খুব কম ছিলো। গ্রামে যে ধরনের খেলায় অভ্যস্ত ছিলাম, তা শহরে খেলার মতো সংখ্যায় সাথী পাওয়া যেতো না। তাই কিছুদিন পরেই গ্রামে চলে যাওয়ার জন্য মন যেনো ব্যাকুল হয়ে যেতো।

আমার কৈশোর

গ্রামে সকলের সাথেই আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুভব করতাম। দাদাকে যারা ভাই বলতেন, তাদেরকে দাদা ডাকতাম। আব্বাকে যারা ভাই বলতেন, তাদেরকে চাচা ডাকতাম। যাদের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক তাদের মধ্যে যারা বয়সে বড় তাদেরকে ভাই সাহেব ডাকতাম। এমনিভাবেই মহিলাদেরকে চাচী, দাদী, ভাবী, বুবু (আপা) ডাকা হতো এবং বড়দের কাছ থেকে আদরও পেতাম। কিন্তু ঢাকায় মামাদের কয়েকটি বাড়ি ছাড়া আশেপাশে আর কোনো বাড়িতেই যাওয়া হতো না। বিশেষ করে মামাদের বাড়ির চারপাশে হিন্দুরাই বসবাস করতো এবং তাদের সাথে আমাদের কোনো সামাজিক সম্পর্ক ছিলো না।

শহরে নানাবাড়িতে একটা বড় পাকা কুয়া ছিলো। বালতি দিয়ে কুয়া থেকে পানি তুলে গোসল করে কোনো তৃপ্তি পেতাম না। কুয়ার পাড়ে গোসলের সময় গ্রামে গোসলের মজার কথা মনে করে বাড়ি চলে যেতে মন চাইতো। আম্মা বেশিদিন ঢাকায় থাকা পছন্দ করতেন। কিন্তু সপ্তাহ-দু'সপ্তাহ পর আমার মনটা গ্রামমুখী হয়ে পড়তো। শহর ও গ্রামের মধ্যে তুলনা করে আমার কাছে গ্রামই বেশি ভালো লাগতো।

গ্রামে মনে হতো যে, আমার অনেক আপন মানুষ আছে, যারা আদর করে আমাকে ডাকে, গায়ে হাত বুলায়, কারো বাড়িতে গেলে দাদী-চাচীদের কেউ কিছু খেতে দেয়, কিন্তু ঢাকায় আসলে মনে হতো যে, মামাদের তিনঘর ছাড়া আর আপন কোনো মানুষ নেই। গ্রামের সব বাড়িতেই ফলের গাছ। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে তাকালে শুধু গাছই নজরে পড়তো। ঘরবাড়ি দেখা যেতো না। গোটা গ্রামটাই যেনো দীর্ঘ একটা গাছের বাগান। ঢাকায় আসলে চারিদিকে যেদিকেই তাকাতাম শুধু দালান-কোঠাই নজরে পড়তো। গাছ-গাছড়া খুব সামান্যই চোখে পড়তো। এ সব কারণেই আমার কাছে শহর থেকে গ্রাম বেশি ভালো লাগতো।

গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার স্মৃতি

গ্রাম আমার নিকট বেশি ভালো লাগলেও বছর ঘুরে আসার সাথে সাথে আম্মা যখন ঢাকা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন তখন আবার ঢাকা যাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে যেতো। খুব ভোরে আমাদের গ্রাম থেকে নৌকাযোগে ভৈরব যেয়ে রেলগাড়িতে

উঠতে হতো। যে সকালে রওয়ানা করতে হতো তার আগের রাত বারবার ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দেখতাম সকাল হলো কিনা। দাদীর সাথে একই বিছানায় ঘুমাতাম। তাই উঠার সাথে সাথে টের পেয়ে দাদী ধরে এনে আবার শোয়াতেন আর বলতেন, সকাল হলে আমিই ডেকে দেবো, এখন ঘুমাও। যে শহরে সপ্তাহ-দু'সপ্তাহ থাকার পরেই গ্রামে আসার জন্য মন ছটফট করতো, সে শহরেই যাবার জন্য এতো আগ্রহ কেনো সৃষ্টি হতো ঐ বয়সে সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতাম বলে মনে পড়ে না। এখন বুঝতে পারি যে, মানুষ জীবনে বৈচিত্র্য চায়। একখানে কিছুদিন থাকার পর বেড়াবার উদ্দেশ্যে অন্যত্র যাওয়ার জন্য আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক।

ঢাকা শহরে আসার পথে প্রথমে নৌকা, এরপরে রেলগাড়ি। নৌকায় চলতে যথেষ্ট অভ্যস্ত ছিলাম। বর্ষার কয়েক মাস নৌকা ছাড়া চলারই উপায় ছিলো না। তাই নৌকা ভ্রমণটুকু এমন কোনো আকর্ষণীয় মনে হতো না। কিন্তু রেলগাড়িতে চড়ার পর খুবই ভালো লাগতো। রেলগাড়ি চলার সময়ে যে আওয়াজ হতো তা যেনো ছন্দের তালের মতো অনুভব করতাম এবং শরীরে মৃদু ঝাঁকুনিতে তৃপ্তি পেতাম। রেলগাড়ির ছন্দময় সে আওয়াজটা এখনও যেনো আমার কানে বাজে। মগবাজারস্থ আমার বাড়ি থেকে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসে যেতে রেললাইন ক্রস করে যেতে হয়। অনেক সময়ই রেলগেট বন্ধ থাকলে গাড়িতে বসেই রেলগাড়ির অপেক্ষা করতে হয়। আমার সামনে দিয়ে যখন রেলগাড়ি যায় তখন বাল্যকালের শোনা সে ছন্দময় আওয়াজটা আবার আমার মনে তাজা হয়ে উঠে। চলন্ত রেলগাড়িতে অনেকেই কথাবার্তা বলতে থাকে কিন্তু আমার মনে পড়ে যাদের সাথে আমি ঢাকা যেতাম চলন্ত গাড়িতে তাদের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা হতো না। আমি একটানা বাইরে চেয়ে থাকতাম। কখনও কখনও মনে হতো বাইরের গাছ ও গ্রামগুলো যেনো উল্টোদিকে দৌড়াচ্ছে। এই যে দৃশ্যগুলো বদলাচ্ছে তা দেখতে যে কত ভালো লাগতো, তা বলার ভাষা কোথায় পাব? তাই গাড়িতে আমার ঘুমও পেতো না। ঢাকা শহরের তখন রেল স্টেশনের নাম ছিলো ফুলবাড়ীয়া। ফুলবাড়ীয়া এখন বাস স্টেশন। ট্রেন থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে নানাবাড়িতে যেতাম। ঐ ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন আজকাল আর নেই। ঘোড়ার গাড়িতে বসার জায়গাটা পাল্কির মতো ছিলো। দু'জন দু'জন করে মুখোমুখি ৪জন বসার সিট ছিলো। আর ২টা ঘোড়া টেনে নিয়ে যেতো। ঘোড়ার গাড়িতে যেতে যেতে দু'পাশের দৃশ্য দেখতে খুব ভালো লাগতো। খুব দ্রুত চলতো না বলে সব দৃশ্য তৃপ্তি নিয়ে দেখা যেতো। ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় খুব সকালে স্টেশনে আসতে হতো। পাকা রাস্তায় দু'ঘোড়ার আটটি পায়ের একটি চমৎকার ছন্দময় আওয়াজ হতো। শুনতে রেলগাড়ির ছন্দ থেকেও বেশি ভালো লাগতো। ঘোড়ার ক্ষুরের মধ্যে লোহা লাগানো থাকতো যাতে পা বেশি ক্ষয় না হয়ে যায়। এতে রাস্তার উপর চলার সময় পা ফেলার একটা চমৎকার শব্দ হতো। তখন

ঢাকায় রিকশা ছিলো না, স্কুটারও ছিলো না, কারের তো প্রশ্নই উঠে না। প্রচুর সংখ্যায় ঘোড়ার গাড়ি ছিলো এবং শহরের রাস্তাগুলো তাদেরই দখলে ছিলো।

সেকালে ঢাকা শহরের আকর্ষণ

১৯৪০ সালে ঢাকায় এসে ক্লাস নাইনে ভর্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শহরের দর্শনীয় কি কি ছিলো, সে সম্বন্ধে আমার ধারণাও হয়নি। আম্মার সাথে বেড়াতে আসলে যে মাস-দেড় মাস থাকা হতো তখন ঢাকার দুটো জায়গাই আমার নিকট আকর্ষণীয় ছিলো। একটি সদরঘাট ও অপরটি চকবাজার।

সদরঘাট

সদরঘাট বুড়িগঙ্গা নদীর কিনারে। সকাল-বিকালে ভদ্রলোকেরা এখানে হেঁটে বেড়াতেন। প্রবাহিত নদী আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিলো। আমাদের গ্রামে ছোট্ট নদীর মতোই একটি বড় খাল আছে। প্রায় সারাবছর আমরা সেখানেই গোসল করতাম। শীতের শেষের দিকে বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত খালে পানি কমে যেতো। তখন গোসল করতে হতো নিকটবর্তী একটি বড় পুকুরে। এ খালটি কোনো নদীর সাথে যুক্ত নয় বলে তাতে স্রোত ছিলো না। তাই বুড়িগঙ্গা নদীর স্রোত আমাকে আকর্ষণ করতো। কিন্তু সদরঘাটে যাওয়ার সৌভাগ্য খুব কমই ঘটতো। যেদিন ছোট মামা দয়া করে নিয়ে যেতেন সেদিন আমার সমবয়সী মামাতো ভাইসহ যেতাম। আমার খুব ইচ্ছা হতো নদীতে গোসল করার। কিন্তু এর অনুমতি ছিলো না। বুড়িগঙ্গার তীরে বাঁধানো রাস্তাটি খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলো। রাস্তাটি বাকল্যান্ড রোড নামে বিখ্যাত ছিলো। পশ্চিমে লালবাগ থেকে পূর্বে সূত্রাপুর বাজার পর্যন্ত এ রাস্তায় ছেলেদের দৌড়াতে দেখেছি। মাঝে মাঝে ভিড় হতো কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই ভ্রমণকারীদের সংখ্যা খুব বেশি হতো না। বয়স্ক ভ্রমণকারীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি ছিলো। রাস্তার কিনারে দোকানপাট খুবই কম ছিলো।

বাকল্যান্ড রোডের নিচে পানি ও রোডের মাঝখানে আজকাল যে ভয়ানক আবর্জনা ও বহু ধরনের জিনিস বেচাকেনা হতে দেখা যায়, সেকালে এ সব কিছুই ছিলো না। কিছু কিছু নৌকা বাঁধা থাকতো। তাতে লোকেরা এপার-ওপার যাতায়াত করতো।

সদরঘাট সবচেয়ে চমৎকার মনে হতো বর্ষাকালে। ফুটফুটে পরিষ্কার পানি রোডের কাছাকাছি পর্যন্ত এসে যেতো। তখন স্রোত বেশ প্রবল থাকতো। নদীটা তখন বেশ প্রশস্ত মনে হতো। বর্ষাকালের সদরঘাটের এ আকর্ষণের কথা এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। আমরা ঢাকায় সাধারণত বর্ষাকালেই বেড়াতে আসতাম। ঐ সময়ই আম্মার জন্য নৌকায় ভৈরব আসা সহজ ছিলো। একেবারে নৌকা বাড়ির উঠানের কাছে পৌঁছতে পারতো। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠান পার হয়েই নৌকায় উঠা যেতো। শীতকালে এ সুবিধা থাকতো না। তখন পাল্কিতে চড়ে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে মেঘনা নদীতে গিয়ে নৌকায় উঠতে হতো।

চকবাজার

আমার নিকট ঢাকার দ্বিতীয় দর্শনীয় স্থান ছিলো চকবাজার। জামা-জুতা-টুপী ইত্যাদি ঢাকা আসলে কেনা হতো। লক্ষ্মীবাজার থেকে হেঁটে পাটুয়াটুলি, ইসলামপুর ও মোগলটুলী পার হয়ে চকবাজার গিয়ে কেনাকাটা করতে হতো। কারণ মৌলভীবাজার ও চকবাজারেই মুসলমানদের দোকান সবচেয়ে বেশি ছিলো। এবং মুসলমানরা এটাকেই তাদের বাজার বলে মনে করতো। লক্ষ্মীবাজার থেকে চকবাজারের মাঝখানে মুসলমানদের দোকান খুবই নগণ্য সংখ্যায় ছিলো।

গ্রামের বাজার ও চকবাজারের তুলনা করে আমি গ্রামে থাকাকালে বাজারে যাওয়া পছন্দই করতাম না। চকবাজারের সাজানো দোকানগুলো আমার কাছে এতো ভালো লাগতো যে, কেনার চেয়ে দেখার জন্যই আমি বাজারের এ মাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ঘোরাফেরা করতে চাইতাম। কিন্তু মুরুব্বীর নিয়ন্ত্রণে থাকায় তা সম্ভব হতো না। যার সঙ্গেই বাজারে যেতাম তার কাছ থেকে বাজারে আমার অপরিচিত যে জিনিস দেখতে পেতাম সেগুলোর নাম জানতে চাইতাম। গ্রামে গিয়ে সহপাঠীদের নিকট এতো সব জিনিসের নাম বলে তাদেরকে অবাক করে দিতাম। সদরঘাট ও চকবাজারের বর্ণনা সমবয়সীদের কাছে তুলে ধরার সময় তারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতো, আর আমিও ঢাকা শহরে আমার নানীর বাড়ি—এ অনুভূতিতে গৌরব বোধ করতাম। তাদের আচরণ থেকে বুঝতে পারতাম তারা এ মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়।

২.

আমার প্রাথমিক শিক্ষা

আমি আমার দাদার প্রথম নাতি। দাদার চার ছেলের মধ্যে আমার আব্বাই সবার বড়। দাদা অবসর জীবনযাপন করছিলেন। তাই তারই কাছে মুখে মুখে অনেক কিছু শিখি। সাধারণত বাড়ির প্রথম সন্তানের লেখাপড়া শুরু করতে একটু দেরি হয় বলে দেখা যায়। বাড়িতে আর কেউ লেখাপড়া করছে দেখলে ছোটরাও তা দেখে লেখাপড়া শুরু করে দেয়। আমার ছোট ভাই গোলাম মুয়ায্যাম বয়সে আমার ২ বছরের ছোট হলেও লেখাপড়ায় মাত্র এক ক্লাস নিচে ছিলো। সে আমার পড়া দেখে দেখে স্কুলে যাওয়ার আগেই আমার সাথে সাথে পড়া শুরু করে দেয়।

ছয় বছর বয়স হলে কুরআন পড়ার জন্য ফজরের পর মসজিদে যেতাম। গ্রামের ছেলেমেয়েরা সবাই মসজিদে যেয়েই ক্বারী সাহেবের নিকট কুরআন পড়া শিখত। ক্বারী সাহেব সূরা দোহা পর্যন্ত সবাইকেই মুখস্থ করাতেন। যার মুখস্থ হতো তার বাড়ি থেকে পিঠা তৈরি করে মসজিদের সকলকে খাওয়াবার রেওয়াজ চালু ছিলো। এ প্রথাটির মাধ্যমে সারা গ্রামের সকলেই এ কথা জানতে পারত অমুক ছেলে বা মেয়ে সূরা দোহা পর্যন্ত সকল সূরা মুখস্থ করে ফেলেছে। এটা সকলের জন্য উৎসাহের

ব্যাপার ছিলো এবং এ কারণে প্রতিযোগিতা করেই সবাই মুখস্থ করতে চেষ্টা করতো। কুরআন শিক্ষার সাথে সাথে ক্বারী সাহেব সকলকে নামাযও শিক্ষা দিতেন। সবাইকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে নামাযে যা কিছু পড়তে হতো তা জোরে জোরে পড়তে বলতেন। যার ভুল হতো তার ভুল শুদ্ধ করে দিতেন। রুকু সিজদাহ ঠিকমত হচ্ছে কিনা তাও লক্ষ্য রাখতেন।

বাড়িতে দাদার সান্নিধ্য বেশি সময় পেতাম এবং তিনি আমাদের দু'ভাইকেই সূরা ইয়াসীন মুখস্থ করালেন এবং ঠিকমত মুখস্থ হলো কিনা তা দেখার জন্য মাঝে মাঝে পড়ে শুনাতে বলতেন। যখন সঠিকভাবে মুখস্থ হয়ে গেলো তখন আমাদের দু'ভাইকে বললেন, রাসূল (স) মৃতের সামনে সূরা ইয়াসীন পড়ার জন্য হুকুম করেছেন। আমি মারা গেলে তোমরা সূরা ইয়াসীন পড়বে। এখনো মনে আছে দাদার ইন্তিকালের পর দাফন করতে দেড় দিন দেরি হয়েছিল বলে দাদার লাশ যে ঘরে ছিলো সে ঘরে আমরা বহুবার সূরা ইয়াসীন পড়েছি।

এক বছরের মধ্যে নিজে নিজে কুরআন শরীফ পড়ার যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য ৬ বৎসর বয়সে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করা হয়নি। সকালে ক্বারী সাহেবের কাছে এবং দুপুরে ও সন্ধ্যায় বাড়িতে দাদার কাছে কুরআন পড়া হতো। এভাবে এক বছরে নিজে নিজেই কুরআন শরীফ পড়ার যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হলো। তাই ৭ বৎসর বয়সে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হলাম।

প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা

স্কুলের হেড মাস্টার জনাব মুকুল হোসেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার সরাইল থানার লোক। তিনি আমাদের পাড়ায় এক বাড়িতে লজিং থাকতেন। স্কুলে যেতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগত। ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার পর স্কুলে যাবার আধ ঘণ্টা আগে হেড মাস্টার সাহেবের ঘরে যাবার হুকুম ছিলো। সেখানে তিনি আমার পড়াশুনার খোঁজ নিতেন। বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হবে বলে আমাকে তাগিদ দিতেন। এই যে প্রাইভেটভাবে তিনি আমাকে পড়াতেন তার জন্য কোনো টাকা-পয়সা দেওয়া হয়নি। সেকালে প্রত্যেক স্কুলের সুনাম-খ্যাতির জন্য হেড মাস্টারের উদ্যোগে ভালো ছাত্রদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হতো। যাতে ক্লাস ফোর-এর প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় স্কুলের ছেলেরা বৃত্তি পায়।

স্কুলে আমি হেড মাস্টার সাহেবের সাথেই যেতাম। ফিরবার সময় তিনি আমাকে সাথে নিয়ে আসতেন। পথেও লেখাপড়ার বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। তাঁর এই স্নেহ আমাকে খুবই আকৃষ্ট করতো। যার কারণে তাঁকে আমি যদিও অত্যন্ত ভয় করতাম তবুও সাহস করে খোলামেলা কথাও বলতাম। ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় মাঝে মাঝে শ্রুতলিপি লেখাতেন। তিনি বলতেন আমরা লিখতাম। একদিন ক্লাসের ছাত্রদের খাতা ক্লাসেই তিনি দেখলেন। যার যতটা ভুল হলো দাগ দিয়ে ডেকে ডেকে

দেখালেন। আমি দেখলাম কারো তিন চারটা ভুল হলো। তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কয়টা ভুল হলো?' খাতা দেখে বললাম, 'একটা মাত্র ভুল হয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে কয়েক ঘা বেত মারলেন। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'অন্যদের এতগুলো ভুল হলো অথচ আমার একটা ভুলের জন্য আমাকে মারলেন?' আমার এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি কাছে ডেকে আদর করে বললেন, 'তোর একটা ভুলও আমি সহ্য করব না।' তাঁর এ স্নেহের পরশ পেয়ে আমি কেঁদে ফেললাম। ১৯৫০ সালে এমএ পরীক্ষার পর তাবলীগী জামায়াতের চিল্লা উপলক্ষে হেড মাস্টার সাহেবের গ্রামে গিয়েছিলাম। তখন তিনি বৃদ্ধ। যে আবেগের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেললেন, তা আমার চোখেও পানি নিয়ে এল। এমন স্মৃতি কোনোদিন ভুলবার নয়। ছাত্র ও শিক্ষকের এ জাতীয় সম্পর্কের কথা আজকাল কি কল্পনাও করা যায়!

হেড মাস্টার সাহেবের পাঠদান পদ্ধতিটাও চমৎকার ছিলো। তিনি আমাদেরকে যোগ-বিয়োগ, গুণ ও ভাগের বড় বড় অংক মুখে মুখেই শিখিয়ে ফেলতেন। এতে আমাদের এমন আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে, আমরা উপরের ক্লাসের অংকও কষতে সক্ষম বলে মনে করতাম।

তার পাঠদানের অপর একটি পদ্ধতি আমার ছাত্রজীবনের শিক্ষার সকল স্তরে কাজে লেগেছে। সেটা হলো, তিনি বলে দিতেন আগামীকালের পড়াটা ভালো করে দেখে আসবে। ফলে পরদিন ক্লাসে যখন তিনি পড়াতেন তখন মনে হতো যেন এ অংশটির পড়া সম্পন্ন হয়ে গেল, এটা বাড়িতে গিয়ে পড়তে হবে না। এভাবে ক্লাসেই তিনি পড়া শিখিয়ে ফেলতেন। আজকাল বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মাস্টারদের অনেকেই ক্লাশে পড়া শেখাননা বলে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে প্রাইভেট পড়তে হয়।

ক্লাসে যেটা পড়ানো হবে সেটা আগেরদিন ভালো করে পড়ে নেবার এ পদ্ধতিটা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে অবলম্বন করে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। ক্লাসে পড়ার আগে বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করার কারণে ক্লাসের লেকচার বুঝতে এতটা মজা পেতাম যে বিষয়টা সম্পূর্ণ আয়ত্তে এসে যেতো। লেকচার শোনার সময় উল্লেখযোগ্য পয়েন্টগুলো আমি নোট করে নিতাম। পরীক্ষায় প্রস্তুতির সময় আমার এ সব নোট মূল্যবান সম্বল বলে মনে হতো। আমার প্রাইমারী স্কুলের হেড মাস্টার আমার সার্থক পথপ্রদর্শক।

ক্লাস ফোরে ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পেলাম এবং বছরের শেষে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য হেড মাস্টার সাহেব উৎসাহ দিলেন। কিন্তু দাদা এবং আব্বা আমাকে বাড়ি থেকে সাড়ে তিন মাইল দূর বড়াইল জুনিয়র মাদ্‌রাসায় আবার ক্লাস থ্রিতেই ভর্তি করে দিলেন। এমনিতেই এক বছর পরে স্কুলে ভর্তি হলাম, আবার মাদ্‌রাসায় ভর্তি হওয়ার কারণে আরো একবছর নষ্ট হয়ে গেলো। এতে আমার সহপাঠীদের থেকে

এক ক্লাস পিছিয়ে পড়ার কারণে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। দাদা আমার মনের ভাব বুঝতে পারলেন। আমাকে যা কিছু বললেন সবটুকু মনেও নেই এবং ঠিকমত বুঝতেও পারছিলাম কিনা জানি না। দাদার এটুকু কথা ভালোভাবে মনে আছে, 'তুমি বংশের বড় ছেলে, তোমার দাদা ও আব্বা আরবী ভাষা ভালো করে শিখেছে। বংশের বড় ছেলে হিসেবে তোমাকেও আরবী শিখতে হবে। স্কুলে আরবী পড়ার ব্যবস্থা নেই, তাই আরবীর জন্যেই তোমাকে এক ক্লাস নিচে ভর্তি করতে হলো।' এই বলে তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন যে, বাংলা, আরবী, ইংরেজি– এ তিনটি ভাষাই তোমাকে ভালো করে শিখতে হবে। যেখানে তোমাকে ভর্তি করা হয়েছে সেখানে ক্লাস থ্রি থেকেই তিনটি বিষয় শেখানো হয়, আমাদের গ্রামের স্কুলে আরবী তো নেই-ই ইংরেজিও সামান্যই পড়ানো হয়। দাদার এই সান্ত্বনা বাণীতে সন্তুষ্ট হলাম। পরবর্তীকালে আমি উপলব্ধি করেছি যে, দাদার এ সিদ্ধান্ত আমার জন্য পরম কল্যাণকর হয়েছে। এই উপলব্ধির কারণ বুঝতে হলে সেকালের চার প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সেকালের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ম্যাট্রিকুলেশন (এসএসসি) পর্যন্ত ক্লাস সেভেন থেকে সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ হিসেবে আরবী বা ফার্সী পড়ানো হতো। ইন্টারমিডিয়েটে আরবী অপশনাল ছিলো। বিএ-তে বাইবেলেরও একটি সিলেক্টেড কোর্স বাধ্যতামূলক ছিলো। কিন্তু কুরআন বা আরবী বাধ্যতামূলক ছিলো না। তাই এ শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলমান শিক্ষিতরা ইসলাম সম্পর্কে মূর্খই থেকে যেতো। যারা ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত সামান্য আরবী শিখতো উপরের ক্লাসে আরবী বাধ্যতামূলক না থাকায় ঐ শিক্ষাটুকুও হারিয়ে যেতো। আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন হল ইউনিয়নগুলোর মাধ্যমে বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা যথেষ্ট হতো। সেখানে আলোচ্য বিষয়ে কোনোদিন ইসলামী বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে দেখিনি।

আমি ১৯৪৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ৪ বছর হলেই ছিলাম। বিভিন্ন হলে এ সব প্রতিযোগিতায় শরীক হতাম। আমার কাছে খুব বিস্ময় লাগত বিজ্ঞানের ছাত্ররাও বক্তৃতায় ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, শেলী, কীটস এবং সেক্সপীয়র থেকে বিস্তর কোট করতো। বলাবাহুল্য, তখন বাংলায় কোনো বক্তৃতা হতো না। বক্তৃতার বিষয়ে Materialism (বস্তুবাদ), Dialecticlsm (দ্বন্দ্ববাদ), Evolution, Nazism, Fascism, Democracy ইত্যাদি প্রাধান্য পেত। ১৯৪৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ২য় মহাযুদ্ধ চলার কারণে এ সব বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হতো। এ অবস্থায় সেকালের শিক্ষিত মহলের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানচর্চা না হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিলো। আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজকে সাধারণ ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করতো না। শুধু মাদ্‌রাসার ছাত্ররাই এ বিভাগে ভর্তি হতো। এ বিভাগের শিক্ষক

ও ছাত্রগণ ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনার উদ্যোগ নিতেন না। তাই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ ও অনুসরণ করে এবং ধর্মকে জীবনে কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় মনে না করে তাদেরকে কি দোষ দেওয়া যায়? এ শিক্ষাব্যবস্থা যে ধরনের শিক্ষিত লোক তৈরি করতে চেয়েছে সে ধরনের লোকই তৈরি হয়েছে। ইংরেজ শাসকরা তাদের মূল্যমান, মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সভ্যতার নিষ্ঠাবান অনুসারী তৈরি করতে এ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলো। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অল্পসংখ্যক যারা বাস্তব জীবনে নামাযী, রোজাদার ও ধার্মিক জীবনযাপন করেছেন তারা পারিবারিক প্রভাব বা নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ই তা করেছেন। তাদের এ ধার্মিকত্বায় শিক্ষাব্যবস্থার সামান্য অবদানও নেই।

ইংরেজ আমলের পূর্বে মুসলিম শাসনকালে যে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিলো তা থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনার লোকও তৈরি হতো। ইংরেজ আমলের পূর্বে ঐ শিক্ষিত লোকরাই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দায়িত্ব পালন করতো। ইংরেজ শাসকরা যখন তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা চালু করলো এবং তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি লোকদেরকে সরকারি চাকরির সকল পেশায় নিয়োগের ব্যবস্থা করলো, তখন মুসলিম শাসনামলের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লো। কারণ রিযিকের চাবি ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার হাতে তুলে দেওয়ায় বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই এ শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকলো না।

তবুও রাজ্যহারা মুসলিম জাতি প্রথমে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে রাজি হলো না। হিন্দুরা এ শিক্ষা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করায় সর্বক্ষেত্রে তারা এগিয়ে গেলো। ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলো। তারাই সব পদ দখল করলো। উকিল-মোক্তার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পেশা একচেটিয়া হিন্দুদের দখলে চলে গেলো। সরকারি চাকরিতেও শুধু হিন্দুরাই নিয়োগ পেলো। এ শিক্ষা গ্রহণ না করায় সেখানে মুসলমানরা কোনো সুযোগই পেলো না।

বিখ্যাত ইংরেজ শাসনকর্তা উইলিয়াম হান্টার তার লিখিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে স্পষ্টভাষায় লিখলেন, 'পঞ্চাশ বছর পূর্বে এদেশে কোনো মুসলমান পরিবার অশিক্ষিত ও অসচ্ছল ছিলো না। আর আজ কোনো শিক্ষিত-সচ্ছল মুসলমান পরিবার খুঁজে পাওয়া কঠিন।' মুসলিম জাতি ইংরেজদের গোলামিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলো না। তাই এ শিক্ষা গ্রহণ করে গোলামি যুগকে দীর্ঘায়িত করার জন্য মনের দিক থেকে মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। কিন্তু এদেশের হিন্দুদের মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ইংরেজদের গোলামিকে কবুল করে নিতে অসুবিধা হয়নি। ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্বের জন্য তারা হিন্দুদেরকে সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করলো, তাদের রাজত্বের স্থায়িত্বের জন্য হিন্দুদের সহযোগিতা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করলো। ফলে মুসলিম

জাতি ডবল গোলামির শিকার হয়ে গেলো। একদিকে ইংরেজদের রাজনৈতিক গোলাম আরেকদিকে হিন্দুদের অর্থনৈতিক গোলাম।

চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল পেশায় হিন্দুদের কর্তৃত্ব পূর্ণতা লাভ করলো। অপরদিকে মুসলিম কৃষকরা সকলেই হিন্দু জমিদারদের অধীনস্থ হয়ে পড়লো। হিন্দু জমিদারদের হাতে জমির খাজনা আদায় করতে দিয়ে সকল কৃষককে তাদের প্রজা বানিয়ে দেওয়া হলো।

৩.

বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে নিতান্ত প্রয়োজনে মুসলমানরা ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাকে গ্রহণ করে। ঐ সিপাহী বিপ্লবে মুসলিম সিপাহীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যার ফলে মুসলিমদের উপর ইংরেজদের নির্যাতন বেড়ে যায়। মুসলিম জাতির এ মহাদুর্দিনে কুরআন ও হাদীসকে বাঁচিয়ে রাখার মহান তাগিদে আলেম সমাজ গরীব মুসলমানদের ঈমানী বল ও আর্থিক সহায়তায় বহু ত্যাগ স্বীকার করে যে মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে সেটাই 'দারসে নিযামী' নামে পরিচিত। এ শিক্ষার পেছনে সরকারি কোনো সাহায্য ছিলোই না। এ শিক্ষায় শিক্ষিত ওলামাগণের জন্য সরকারিভাবে রুযি-রোজগারের কোন পথও খোলা ছিলো না। এটা একদিক দিয়ে আলেম সমাজের প্রতি মহা-অবিচার হলেও মুসলিম জাতি পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছিলো।

দুনিয়ায় আয়-রোজগারের পথ বন্ধ থাকায় তারা তাদের উস্তাদদের প্রেরণায় দীনের মহান খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে মাদ্‌রাসার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাদ্‌রাসা কায়েম করে মুসলমান ছেলেদের আলেম বানানো, নামাযের জন্য মসজিদ কায়েম করা, মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করা, মুসলিমদের ঈমানের হেফাযত করা, ওয়াজের মাধ্যমে মুসলিম জনগণের নিকট ইসলামের পাঁচটি ভিত্তিকে তুলে ধরা এবং এ জাতীয় দীনী খেদমতের মাধ্যমে ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমানে সরকারি ব্যাপক সাহায্য এবং রুযি-রোজগারের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার মান বৃদ্ধি না পেয়ে কমেই চলেছে। বেসরকারি মাদ্‌রাসা শিক্ষা সরকারি কোন পৃষ্ঠপোষকতা না থাকা সত্ত্বেও কুরআন ও হাদীসকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য পূরণে যেটুকু সফলতা অর্জন করেছে তার জন্য মুসলিম জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। আলেম সমাজ যদি এ মাদ্‌রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা না করতেন তাহলে আজ হয়তো ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

সরকারি আলীয়া মাদ্‌রাসা

বেসরকারি মাদ্‌রাসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজ শাসকরা নিজস্ব মাদ্‌রাসা স্থাপন প্রয়োজন মনে করলো। কোলকাতায় ইংরেজ প্রিন্সিপালের অধীনে পৃথক মাদ্‌রাসা কায়েম হলো। এ মাদ্‌রাসা কায়েমের উদ্দেশ্য ছিলো আরবী শিক্ষিত এমন একদল উলামা তৈরি করা যারা সরকার পরিচালিত স্কুলে আরবী ভাষা ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষকতা করবে এবং বিবাহ্‌-তালাক রেজিস্ট্রির দায়িত্ব পালন করবে। বেসরকারিভাবে আলেম সমাজের প্রচেষ্টায় যে মাদ্‌রাসা শিক্ষা চালু ছিলো সেই সব আলেমদেরকে এ দুটো পদে নিয়োগ দেওয়া হতো না। ঐ সব মাদ্‌রাসা পাস উলামারা এ চাকরি পেতে হলে আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে ডিগ্রি নিতে হতো। এভাবে আমাদের দেশে দু'ধরনের মাদ্‌রাসা চালু হয়েছে। বেসরকারি মাদ্‌রাসাগুলো 'কওমী মাদ্‌রাসা', সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা 'আলীয়া মাদ্‌রাসা' নামে পরিচিত।

কওমী মাদ্‌রাসাতে বাংলা ও ইংরেজি বা আধুনিক কোন বিষয়ে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলো না। যার ফলে এ সব মাদ্‌রাসায় শিক্ষিতগণ কওমী মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা ও মসজিদের ইমামতি ছাড়া অন্য কোন চাকরির সুযোগ পেতেন না। স্কুলের আরবী শিক্ষক ও ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হতে হলে তাদেরকে আলীয়া মাদ্‌রাসার ডিগ্রি নিতে হতো। কিন্তু আলীয়া মাদ্‌রাসায়ও বাংলা ও ইংরেজি এ পরিমাণ শিখানো হতো না যার পর তারা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিতে পারে। ফলে তাদের চাকরির ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ ছিলো। সরকারি চাকরি, কলেজে অধ্যাপনা ইত্যাদির জন্য আলীয়া মাদ্‌রাসার পাস করা আলেমদেরকেও সরকারি সাধারণ শিক্ষার Metriculation ও Intermediate পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হতো। এভাবে উভয় প্রকার মাদ্‌রাসা শিক্ষিত লোকদের জন্যেই চাকরির ময়দান খুব সীমিত ছিলো। এ পরিস্থিতিতে শামসুল উলামা মাওলানা আবু নসর ওয়াহিদ নামে একজন শিক্ষাবিদ New Scheme of Education নামে একটি নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করে ইংরেজ সরকারের অনুমোদন লাভে সক্ষম হন।

নিউ স্কীম সিস্টেম

এ নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত জুনিয়র মাদ্‌রাসা, ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত হাই মাদ্‌রাসা আর ইন্টারমিডিয়েটকে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ নাম দেওয়া হলো। এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করলো। অবিভক্ত বাংলার বহু জায়গায় জুনিয়র হাইস্কুলের বিকল্প 'জুনিয়র মাদ্‌রাসা' কায়েম হলো, হাই স্কুলের বিকল্প 'হাই মাদ্‌রাসা' চালু হলো। যে সব জায়গায় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ চালু হয়েছে সেখানে একই প্রিন্সিপালের অধীনে ক্লাস সেভেন থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পরিচালিত হতো।

এ নিউ স্কীমে হাই মাদ্‌রাসা পাস করে বেশিরভাগ ছাত্রই সাধারণ শিক্ষার জন্য কলেজে চলে যেতো। বিজ্ঞানসহ যে কোনো কোর্স তারা গ্রহণ করতে পারতো। যারা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পাস করতো বিজ্ঞান ও কমার্স ছাড়া আর্টস-এর যে কোন বিষয়ে বিএ, এমএ ডিগ্রি নিতে পারতো।

এই নিউ স্কীম শিক্ষার জনপ্রিয়তা এ কারণে বৃদ্ধি পেলো যে, যারা তাদের সন্তানদেরকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সাথে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দিতে চাইতেন তারা সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিকল্প হিসেবে নিউ স্কীম শিক্ষা পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিলো। কারণ এ শিক্ষা পেলে চাকরির ময়দানেও উন্নতির পথে বাধা থাকে না। অথচ আরবী ভাষা ও কুরআন-হাদীসের কিছু শিক্ষা পাওয়ার কারণে মুসলিম চেতনা লালন করারও যোগ্যতা অর্জন করে।

নিউ স্কীমে হাই মাদ্‌রাসা বা ইন্টারমিডিয়েট পাস করে যারা University-র ডিগ্রি নিয়েছে তাদেরকে চাকরির ময়দানে সাধারণ শিক্ষিতদের পিছনে পড়তে হতো না। সরকারি চাকরি হোক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি হোক, সর্বত্রই তাদের অনেকেই উন্নতি করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে তাদের উপর ইসলামের প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিলো। হাই মাদ্‌রাসা বা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর ইংরেজি, বাংলা ও অন্যান্য বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষাবিদ হিসেবে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice Chancellor-ও হয়েছেন। যেমন ড. সৈয়দ মুয়ায্‌যম হোসাইন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন (রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. মোহাম্মদ আব্দুল বারী (রাজশাহী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)।

নিউ স্কীম পাস করে ড. কাজী দীন মুহম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট এবং বর্তমানে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ড. মোহর আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার ছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পাকিস্তান আমলে ৫০ দশকের শেষ দিকে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের সুযোগে ধর্মবিরোধী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী সরকারি কর্মকর্তারা নিউ স্কীম শিক্ষাব্যবস্থা উঠিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করে। তারা নানা অজুহাত তুলে প্রথমে জুনিয়র মাদ্‌রাসাগুলোকে জুনিয়র হাইস্কুলে পরিণত করে। ৫/৬ বছরের মধ্যেই ছাত্রের অভাবে হাই মাদ্‌রাসাগুলো হাইস্কুলে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হয় এবং একই কারণে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোও জেনারেল কলেজে পরিণত হয়।

নিউ স্কীম সিলেবাস

ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষায় বাংলা, ইংরেজি, অংক, ভূগোল ও ইতিহাসের যে সব বই পড়ানো হতো জুনিয়র মাদ্‌রাসায় সেগুলোই পড়ানো হতো। তদুপরি আরবী ও দীনিয়াত পড়তে হতো।

ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, অংক (জ্যামিতি ও বীজগণিতসহ) হাইস্কুলের একই কোর্স পড়ানো হতো। এতে কোর্সের প্রায় অর্ধেক কভার করতো। আর বাকি অর্ধেকে আরবী ভাষা ও কুরআন-হাদীসের সংক্ষিপ্ত কোর্স এবং ফিকাহ শামিল ছিলো।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় হাইস্কুল ও হাই মাদ্‌রাসার ইংরেজি, বাংলা ও অংকের একই প্রশ্নপত্র ছিলো। এ কারণেই 'হাই মাদ্‌রাসা' পাস করে কলেজে সায়েন্স ও আর্টস-এর সকল বিষয়ে পড়া সম্ভব হতো। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত হাইস্কুলের মতোই শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি ছিলো। হাইস্কুলের মতো ইংরেজির মাধ্যমেই অংক, জ্যামিতি ও আলজ্যাবরা শিখানো হতো।

ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েটে বাংলা ও ইংরেজির কোর্স জেনারেল এডুকেশনের সমানই ছিলো। তবে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েটে আরবী সাহিত্যে ২০০, হাদীসে ১০০, তাফসীরে ১০০, ফিকাহতে ১০০ নম্বরের সিলেবাস ছিলো।

নিউ স্কীমের এ কোর্সে বাংলা, ইংরেজি, অংক ছাড়াও আরবী, কুরআন, হাদীস ও ফিকহের কোর্স যুক্ত থাকায় general education থেকে ছাত্রদেরকে বেশি পরিশ্রম করতে হতো। এর ফলে সাধারণ মেধার ছাত্রদের জন্য এ কোর্স কঠিন মনে হতো। তাই হাই মাদ্‌রাসার পর মেধাবী ছাত্র ছাড়া ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হতে কেউ সাহস পেতো না।

চার রকম শিক্ষাব্যবস্থা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সেকালে ৪ রকম শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিলো।

১. সরকার পরিচালিত শিক্ষা: এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা সকল সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ পেতো।

২. কওমী মাদ্‌রাসা: এটা সম্পূর্ণ বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো। এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা কওমী মাদ্‌রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম হওয়া ছাড়া আর কোনো পদের সুযোগ পেতেন না।

৩. আলীয়া মাদ্‌রাসা: এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষিতরা আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা আর হাই স্কুলে আরবী, ফার্সী ও উর্দুর শিক্ষকতা এবং বিবাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পেতেন।

৪. নিউ স্কীম মাদ্‌রাসা: এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষিতরা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মতো সর্বত্রই সুযোগ নিতে সক্ষম হতো।

সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার এই বিস্তারিত বিবরণ এ জন্যেই দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়লো যে, তখন আমার কোন শিক্ষায় যাওয়া প্রয়োজন তা দাদা ও আব্বাকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

৪.

আমার প্রাইমারী পরবর্তী শিক্ষা

আমাদের গ্রাম থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে বড়াইল জুনিয়র মাদ্‌রাসায় ১৯৩৪ সালে ক্লাস থ্রীতেই ভর্তি হলাম। আগেই বলেছি যে, গ্রামের স্কুলে ক্লাস ফোর-এ ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পাওয়া সত্ত্বেও আরবী শিক্ষার প্রয়োজনে আমাকে ক্লাস থ্রীতে ভর্তি হতে হলো। সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি আসতাম। যতদিন দাদা ছিলেন তাঁর সাহচর্য সবচেয়ে বেশি আমিই পেয়েছি। মাদ্‌রাসার নিকটবর্তী এক বাড়িতে আমার ছোট চাচা জনাব শফিকুল ইসলাম লজিং থাকতেন। তিনি আমার তিন ক্লাস উপরে পড়তেন। বয়সে আমার তিন বছর বড়ই ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ঐ বাড়ির নিকটবর্তী এক বাড়িতে আমার খাবার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু সে বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো না। তাই চাচার সাথেই থাকতাম। একবছর পর চাচা অন্যত্র আরেক বাড়িতে লজিং-এর ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। তাঁর লজিং বাড়িতেই আমার থাকার সাথে সাথে খাওয়ার ব্যবস্থাও হলো। আরো একবছর পর যখন ক্লাস ফোর-এ ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পেলাম, তখন আমাদের বাংলা শিক্ষক পণ্ডিত শামসুদ্দিন আমাকে মাদ্‌রাসা থেকে বেশ দূরে তাঁর এক চাচাত ভাইয়ের বাড়িতে লজিং থাকার ব্যবস্থা করলেন। আমার আগের লজিং-এর চেয়ে এটি উন্নত ছিলো। পণ্ডিত সাহেব তাঁর ভাইয়ের ছেলেকে পড়াবার জন্য এই ব্যবস্থা করলেন। যাকে পড়াবার জন্য আমাকে আনা হলো সে আমার ক্লাসেরই ছাত্র, কিন্তু বয়সে আমার ৩/৪ বছরের বড় ছিলো। অবশ্য তার ছোট ভাইদেরকেও পড়ালেখায় আমাকে সাহায্য করতে হতো।

আমাদের দেশে লজিং সিস্টেমটা দূরবর্তী ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্য খুবই সহায়ক। আমি আমার প্রথম লজিং বাড়িতে কুরআন শরীফ পড়াতাম, আর এই নতুন লজিং-এ আমার সহপাঠীর সহযোগিতা ও ছোটদেরকে সাহায্য করতে হতো।

পণ্ডিত সাহেব আমার ক্লাস থ্রীতে ভর্তি হওয়ার পরে মাদ্‌রাসার লাইব্রেরীর দায়িত্বে ছিলেন। লাইব্রেরীর ব্যবস্থা থাকায় বই নিয়ে পড়ে পড়ে ফেরত দিতে হতো। পণ্ডিত স্যার লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়ার জন্য তাকিদ দিতেন। তাঁর বাছাই করা বই পড়ে ফেরত দিতাম।

পাঠ্যবই-এর বাইরে বই পড়ার যে অভ্যাস তিনি করালেন তা আজীবন আমার কাজে লেগেছে। আমার এখনও মনে আছে সর্বপ্রথম যে বইটি তিনি পড়তে দিলেন তার নাম ছিলো 'শিয়াল পণ্ডিত'। অনেক গল্পের বই তিনি আমাকে পড়ালেন। যার ফলে বই পড়ার উৎসাহ বেড়ে গেলো।

পাঠ্যবই নিজে পড়া ও লজিং মাস্টারের ছেলেদেরকে পড়ানোর জন্যে বেশ সময় খরচ হতো। তাই পড়ার টেবিলে বসলে বাইরের বই পড়ার সময় হতো না। এ সব গল্পের বই ঘুমের আগে শুয়ে শুয়ে পড়তাম। শুয়ে শুয়ে পড়ার এ অভ্যাস এখনো জারী আছে। ছোট সময় থেকে এমন অভ্যাস হয়েছে যে, বই হাতে না নিলে ঘুমই আসে না বা ঘুম আসতে দেরি হয়। শোবার সময় বই না পড়লে হরেক রকম চিন্তা জড়ো হয়। চিন্তামূলক বই পড়লে মনটা একমুখী হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর সহজে ঘুম আসে।

পণ্ডিত স্যারের বড় ভাইয়ের ছেলেও আমার সহপাঠী ছিলো। তার নাম ছিলো মহিউদ্দীন। আমি ক্লাসে ফার্স্ট হতাম। আর সে সেকেন্ড হতো। পণ্ডিত সাহেবের আপন এক ছোট ভাইও আমার একজন সহপাঠী ছিলো। ফলে লজিং থাকলেও পরিবেশটা এমন ছিলো যে, মনে হতো আত্মীয় বাড়িতেই আছি।

মহিউদ্দীনের দাদা, পণ্ডিত স্যারের পিতা মুন্সী ফজলুর রহমান আমার দাদার প্রায় সমবয়সী ছিলেন। তিনি খুবই ধার্মিক লোক ছিলেন। মহিউদ্দীন-এর সাথে সাথে আমিও তাঁকে দাদা ডাকতাম। এভাবে তাঁদের সহযোগিতা পেয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি যাওয়া কমিয়ে দিলাম। আমার দাদার বয়সী ওখানেও আরেক দাদা পেয়ে খুশি হয়ে গেলাম।

মহিউদ্দীনের দাদা আমাদের দু'জনকে মানিকজোড় বলতেন। ঘটনাক্রমে আমাদের দু'জনের মধ্যে চেহারার যথেষ্ট মিল ছিলো। এতটা মিল ছিল, যেমনটা আপন দু'ভাইয়ের মধ্যে দেখা যায়। জুনিয়র মাদ্‌রাসা পাস করার পর কুমিল্লা হাই মাদ্‌রাসায় এক সাথেই ভর্তি হলাম। ক্লাস এইট পর্যন্ত মহিউদ্দীন আমার সহপাঠী ছিলো। আমি ঢাকা এসে ক্লাস নাইনে ভর্তি হলাম। যার ফলে তার সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো।

জুনিয়র ফাইনাল পরীক্ষা

জিলার জুনিয়র মাদ্‌রাসার ক্লাস সিক্স-এর সকল ছাত্রকে জিলা কেন্দ্রে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হতো। সে হিসেবে হেড মাস্টার সাহেব আমাদেরকে কুমিল্লা শহরে একটি হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এ সব হোটেল নিম্নমানের ছিলো। মফস্বল থেকে সাধারণত মামলা-মোকদ্দমা করার উদ্দেশ্যে যারা শহরে আসতো তারা এ সব হোটেলে থাকতো। শহরের প্রধান রাস্তার মোগলটুলী নামক এলাকায় রাস্তার পাশেই এ হোটেলটির অবস্থান ছিলো।

হেড মাস্টার সাহেবের খুবই আশা ছিলো যে, আমি বৃত্তি পাবো। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। যার ফলে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো, বৃত্তি কপালে জুটলো না। দুর্ঘটনাটি বড় কিছু নয় কিন্তু আমার বৃত্তি না পাওয়ার কারণে এই ছোট্ট ঘটনাটি বড় হয়েই রইলো।

ঘটনাটি হলো, আমি এর আগে কখনো চা খাইনি। আমাদের বাড়িতেও ঐ সময় চা-এর প্রচলন ছিলো না। হোটেলে আমার সহপরীক্ষার্থীরা চা খেলো। আমিও তাদের দেখাদেখি চা খেলাম এবং শোয়ার আগ পর্যন্ত ২/৩ বার চা খাওয়া হয়ে গেলো। হেড মাস্টার সাহেব হুকুম করলেন ১১টার আগেই শুয়ে পড়তে হবে। ফজরের পর আবার পড়া শুরু করতে হবে। আমরা শুয়ে পড়লাম। লাইট নিভিয়ে দেওয়া হলো। রাস্তামুখী হোটেলটির ঝাঁপি বন্ধ করা হয়নি, খোলাই ছিলো। আমার সাথীরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লো কিন্তু আমার কিছুতেই ঘুম আসলো না। দেয়াল ঘড়িতে আধাঘণ্টা পর পর আওয়াজ হচ্ছে, দু'টা পর্যন্ত এ অবস্থায়ই কাটল। ঘড়ির আওয়াজ হলেই তাকিয়ে দেখি। আর রাস্তার উপর দিয়ে রাত্রে মিউনিসিপ্যালটির ময়লার গাড়ি যাওয়ার আওয়াজ পাচ্ছি। দু'টার পর কখন ঘুমিয়েছি খেয়াল নেই। ফজরের আজানের পর ডেকে দেওয়া হলো। ঘুম কম হওয়ায় উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। হোটেলের নিকটবর্তী কুমিল্লার বিখ্যাত শাহ সুজা মসজিদে ফজরের নামায পড়তে গেলাম। ফজরের পর পড়তে বসলাম। ঘুম বিরক্ত করতে লাগলো। কিন্তু পরীক্ষার জন্য ঘুমের সাথে যুদ্ধ করেই পড়তে থাকলাম। ১০টার সময় পরীক্ষা শুরু হবে। হেড মাস্টারের নিকট রাতে ঘুম কম হওয়ার কথা বলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়ার অনুমতি চাওয়ারও সাহস পেলাম না।

হলে গিয়ে প্রশ্নপত্র পেয়ে খুশি লাগলো। সব প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার মতো প্রস্তুতি থাকায় উৎসাহের সঙ্গে লেখা শুরু করলাম। লেখারত অবস্থায় দু'বার হাত থেকে কখন কলম খসে পড়লো এবং টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম টেরই পেলাম না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এ রকম হলো। ইনভিজিলেটর দু'বারই ঘুম ভাঙ্গিয়ে হাতে কলম তুলে দিলেন। এ কারণে সব প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার সময় পেলাম না। যখন খাতা নিয়ে গেলো তখন মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেলো। যার ফলে দুটার সময় যে দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা তাতেও ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। মাঝখানে ঘুমাবার কোন উপায় ছিলো না। এভাবে দুটো পত্রের সব প্রশ্নের জবাব লেখা সম্ভব হয়নি। চা খাওয়ার এমন প্রতিক্রিয়া হবে কল্পনাও করিনি। পরবর্তী সব পেপারের পরীক্ষা ভালো দিয়েছি। প্রথম দিনের পরীক্ষার যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি তা হেড মাস্টার সাহেবের কাছে গোপনই রেখেছি। লজ্জায় ও দুঃখে সাথীদেরকেও বলিনি। মনে এ ভয় সৃষ্টি হলো যে, বৃত্তি তো পাবোই না ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া যাবে কিনা তাও অনিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ফার্স্ট ডিভিশনে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ দিয়ে ইয্যত রক্ষা করলেন।

কুমিল্লায় শিক্ষা জীবন

কুমিল্লার নওয়াব হুস্সাম হায়দার চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত হুস্সামিয়া হাই মাদ্রাসায় ক্লাস সেভেনে ভর্তি হলাম ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে। হাই মাদ্রাসার প্রধান জনাব

আখতারুজ্জামান নিউ স্কীম সিস্টেমেই আরবীতে ডিগ্রি নেন। তিনি খুবই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তাঁর খুবই জনপ্রিয়তা ছিলো।

ষাটের দশকের প্রথম দিকে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি হিসেবে কুমিল্লা শহরে জামায়াত কর্মীদের শিক্ষা শিবিরে উপস্থিত হয়ে মঞ্চে বসে শিক্ষার্থীর দিকে তাকিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট আখতারুজ্জামান সাহেবকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। তাকে বললাম 'স্যার, আপনি নিচে বসা আছেন আর আমি উপরে, এটা মানায় না।' তিনি জবাবে বললেন 'এককালে আমি শিক্ষক ছিলাম এবং আপনি ছাত্র, এখন ইসলামী আন্দোলনে আমি ছাত্র এবং আপনি শিক্ষক।' এ কথার পর আমি বললাম, 'স্যার আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন।' কিন্তু এ কথা তিনি মেনে নিলেন না। আরো একবার সাংগঠনিক সফরে কুমিল্লায় গেলে শহরের দক্ষিণ চর্থায় তাঁর নিজ বাড়িতে আমাকে মেহমান হিসেবে রাখলেন। মেহমান হিসেবে যে আচরণ করা সম্ভ্রান্ত পরিবারে রীতি তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ইসলামী আন্দোলনে তাঁর নিষ্ঠা আমাকে এত মুগ্ধ করলো যে, তাঁর ইন্তিকালের পর আমি খুবই ব্যথা পেলাম। আমি তাঁকে এখনও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

কুমিল্লা হাই মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণ

হাই মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণ খুব ভালো পড়াতেন, এখনও তা মনে পড়ে। ক্লাস সেভেনে আমরা ৫৮ জন ভর্তি হলাম। এর মধ্যে ডজনখানেক ফার্স্ট ডিভিশনে পাস ছাত্র ছিলো। কুমিল্লায় লজিং থাকতাম এক বাড়িতে, যা মাদ্‌রাসা থেকে দেড় মাইল দূরে ছিলো। মাদ্‌রাসাটি কুমিল্লা শহরের দক্ষিণ প্রান্তের কাছে আমার লজিং ছিলো উত্তরের প্রান্তে। কুমিল্লার প্রধান রাস্তা দিয়ে হেঁটেই আসা-যাওয়া করতে হতো।

জুনিয়র ফাইনাল পরীক্ষার সময় যে হোটেলে ছিলাম তার সামনে দিয়ে যাবার সময় ঐ দুর্ঘটনার কথা মাঝে মাঝেই মনে হতো। আমার লজিং মাস্টার ফৌজদারী আদালতে চাকরি করতেন। তার যে ছেলেটিকে আমি পড়াতাম, সে তার একমাত্র ছেলে। সে ক্লাস ওয়ানে পড়তো। ছেলেটির দাদী স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নাতিকে খুব আদর করতেন। তিনি আমাকেও নাতির মতো স্নেহ করে তাঁকে দাদী ডাকার জন্য নির্দেশ দিলেন। গ্রামে দাদীকে ছেড়ে গিয়ে শহরে ফাও হিসেবে এক দাদী পেয়ে খুশি হলাম। খাওয়ার সময় তাঁর নাতি ও আমাকে একসাথে খেতে দিতেন এবং আদর করেই খাওয়াতেন। সে জন্য আমার নিজের বাড়ির মতোই মনে হতো। খাবার ব্যাপারে আমার ছাত্রটির অদ্ভুত আচরণ ছিলো। যে জিনিসটা পাক হয়নি সেটা খাবার দাবি করে বসতো। সে জন্য কী পাক হয়েছে সেটা যাতে না জানে সে চেষ্টা করতে হতো। খেতে বসেই বলতো 'ঐ জিনিসটি' খাবো। না থাকলে সমস্যা হতো। তাকে সামলিয়ে খেতে রাজী করাতে হতো। ক্লাস সেভেনে এ লজিং বাড়িতেই থাকলাম।

৫.

কুমিল্লায় লজিং পরিবর্তন

বার্ষিক পরীক্ষায় ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে এইটে প্রমোশন পেলাম। আরো যারা আশে-পাশে কয়েকটি মহল্লায় লজিং থাকতো তাদের মাধ্যমে ভালো ছাত্র হিসেবে জেনে এক রিটায়ার্ড পোস্ট মাস্টার তার তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলেকে পড়াবার জন্য আমাকে খুব গরজ করেই তার বাড়িতে আমার জন্য একটি পৃথক ঘর উঠিয়ে দিলেন। ক্লাস এইটের গোটা বছরই এ বাড়িতে লজিং থাকলাম। বাড়িটি কুমিল্লা সেন্ট্রাল জেলের উত্তর সীমানার দেয়ালের পাশেই অবস্থিত ছিলো। আমার ঘরটি রাস্তার পাশে ছিলো।

এ রাস্তা দিয়েই কুমিল্লার ইংরেজ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তার অফিসে যেতেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর বাংলো জেলখানার ২০০ গজ উত্তরে এবং তার অফিস জেলখানার ১৫০ গজ দক্ষিণে। আসতে যেতে আমি তাকে দেখতাম। মাঝে মাঝে সকালে মেম সাহেবকে নিয়ে তিনি হেঁটে নিকটবর্তী খ্রীস্টান গোরস্তানে যেতেন। এতো কাছে থেকে দেখা সত্ত্বেও কোনদিন কিছু বলার সাহস পাইনি। আমার ইচ্ছা হতো, যদি আমাকে ডেকে কথা বলতো তাহলে আমিও তার সাথে কথা বলতাম। সেকালের ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) অফিসারদের যে প্রদেশে চাকরি করতো সে প্রদেশের জনগণের ভাষা এ পরিমাণ শিখতে হতো যাতে কেউ কথা বলতে চাইলে তা বুঝতে সক্ষম হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়টা আমি জানতে পেরেছিলাম। আর আব্বা কুমিল্লা থেকে ১২ মাইল পশ্চিমে চান্দিনা থানা কেন্দ্রে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ছিলেন। একদিন এক ইংরেজ ঘোড়ায় চড়ে অফিস ইন্সপেকশন করতে গেলেন। তিনি আমার আব্বার অফিসে বসলেন। আমি বাড়ির ভিতর থেকে চা-নাস্তা নিয়ে গেলাম। আমি লক্ষ্য করলাম তিনি আব্বার সাথে বাংলায় কথায় বললেন কিন্তু তার উচ্চারণ বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। বিবাহ রেজিস্ট্রির খাতাগুলো উল্টিয়ে উল্টিয়ে জায়গায় জায়গায় বাংলা লেখা পড়লেন। আব্বার কাছ থেকে জানলাম এরকম কিছু বাংলা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জানেন। তিনি ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে জিলা সাব রেজিস্ট্রী অফিস ও ম্যারেজ রেজিস্ট্রী অফিস ইন্সপেকশন করার দায়িত্বে ছিলেন।

কুমিল্লায় মাদ্‌রাসায় পাঠ্যসূচির বাইরের তৎপরতা

মাদ্‌রাসায় প্রতি বৃহস্পতিবার একজন শিক্ষকের পরিচালনায় সাপ্তাহিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হতো। এর মধ্যে বিতর্ক (Debate), নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা (Set speech), উপস্থিত বক্তৃতা (Extempore speech) অনুষ্ঠিত হতো। এ বিষয়ে আমার খুবই উৎসাহ ছিলো কিন্তু নাইন-টেনের ছাত্রদের এমন প্রাধান্য ছিলো যে আমরা সেভেনের ছেলেরা পাত্তাই পেতাম না। বক্তৃতা চর্চা করার জন্য আমি

আমার ক্লাসের ছাত্রদের নিকট সপ্তাহে একদিন ক্লাসের শেষে ঐ জাতীয় প্রোগ্রাম করার জন্য প্রস্তাব করলাম। অনেকেই সমর্থন করলো। এটা অর্গেনাইজ করার দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত করলো। আমরা তাদেরই অনুকরণে সাপ্তাহিক বৈঠকগুলোর রিপোর্ট রাখা, একেক সপ্তাহে একেক ধরনের প্রোগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইতঃপূর্বে বক্তৃতা করার কোন অভিজ্ঞতাই ছিলো না। মাদ্রাসার কয়েকটি সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে সাহস হলো যে বক্তৃতা করা সম্ভব। আমাদের ক্লাসে এর প্র্যাকটিস করা শুরু হয়ে গেলো। এক বছর পর ক্লাস এইটে গিয়ে আমাদের ক্লাসের ছেলেরা মাদ্রাসার প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল। জুনিয়র মাদ্রাসায় পড়ার সময় বার্ষিক একটি অনুষ্ঠান হতো যেখানে কবিতা আবৃত্তি এবং ছোটখাট নাটকে অভিনয় করার সুযোগও পেয়েছি। কিন্তু বক্তৃতা প্র্যাকটিসের সুযোগ ছিলো না।

কুমিল্লায় রাজনীতির হাতেখড়ি

১৯৩৯ সালে যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন সর্বপ্রথম মুসলিম লীগের এক মিছিলে শরীক হই। শেরে বাংলা ফজলুল হক তখন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হয়। মুসলিম লীগ তখনও খুব সুসংগঠিত ছিলো না, কিন্তু সারাদেশেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সেই সমস্ত মিছিলে লাফিয়ে লাফিয়ে স্লোগান দেওয়ার মজা প্রথম অনুভব করলাম। স্লোগান দিতে দিতে গলা ভেঙে গেলো। তবুও এ রাজনৈতিক প্রোগ্রামটা বেশ ভালোই লাগলো। মাঝে মাঝে টাউন হল ময়দানে জনসভা হতো। আমি প্রতিটি জনসভায় উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা শুনতাম। আর মনে মনে ভাবতাম আমি যদি এ রকম বক্তৃতা করতে পারতাম তবে ভালো লাগতো।

ঐ সময় কুমিল্লা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এ্যাডভোকেট জহিরুল হক লীল মিয়া। যিনি ১৯৫৪ সালে শেরে বাংলার মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী ছিলেন। আমার লজিং থেকে মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে আদালত পাড়ায় তাঁর বাসা ছিলো। তাঁর বাড়ি আমাদের পাশের থানা বাঞ্ছারামপুরে। তিনি আব্বাকে বড় ভাই সাহেব বলে ডাকতেন। সে সুবাদে আমি তাঁকে চাচা ডাকতাম ও মাঝে মধ্যে তাঁর বাসায় যেতাম। তিনিও আমাকে খুব স্নেহ করতেন।

প্যালেস্টাইন ইস্যু

ঐ সময় মুসলমানদের একটা ইস্যু ছিলো প্যালেস্টাইন ইস্যু। ঐ বছরই (১৯৩৯) পয়লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো এবং প্যালেস্টাইন ইহুদীদের জন্য আবাসভূমি কায়েমের দাবি আমেরিকা থেকেই শুরু হলো। তখন মুসলমানদের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা ছিলো মাওলানা আকরাম খাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আজাদ'। কোলকাতা থেকে ডাকে নিয়মিত আব্বার কাছে তা আসতো। তখন থেকে পত্রিকা

পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠে। এ পত্রিকার মাধ্যমে প্রথম প্যালেস্টাইন সম্পর্কে জানতে পারি। কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে প্যালেস্টাইন সম্পর্কে এক জনসভা হয়। ঐ সভার কয়েকটি বক্তৃতা থেকে প্যালেস্টাইন সমস্যাটা মোটামুটি বুঝবার সুযোগ পাই। কোন এক বক্তার একটি কথা আমার মনে গেঁথে যায়। তিনি বলেছিলেন যে, আমেরিকার যদি ইহুদী জাতির জন্য এতই দরদ থাকে তাহলে তাদের বিরাট দেশের এক অংশে ইহুদীদের জন্য একটি আবাসভূমির ব্যবস্থা করতে পারে। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতেও বিরাট অনাবাদী এলাকা পড়ে আছে। দেড় হাজার বছর যেখানে আরবরা বসবাস করছে সেখান থেকে মুসলমানদেরকে উৎখাত করে ইহুদীদেরকে আবাসভূমি দিতে হবে কেন? কথাটা আমার নিকট খুবই যুক্তিপূর্ণ মনে হলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা এবং যুদ্ধে তাদের মিত্রশক্তি জোর করেই ৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ইসরাঈল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। এ রাষ্ট্র কায়েমের জন্যেই ১৯৩৯ সাল থেকে এ দাবি জানানো শুরু হয়। তাই তখন থেকেই মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকে। পৃথিবীতে ইহুদীরাই সবচেয়ে ধনী জাতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই জাতি মিত্রশক্তিকে বিরাট আর্থিক সহযোগিতা করেছে। তাদের গণ-মাধ্যম মিত্রশক্তির পক্ষে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে এর প্রতিদান হিসেবেই ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল জন্মলাভ করে।

আমার জীবনে জনসভায় প্রথম বক্তৃতা

৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে টাউন হল ময়দানে মুসলিম লীগ প্যালেস্টাইন ইস্যুতে যে জনসভা করে তাতে ঐ লীল মিয়া চাচাকে সভাপতিত্ব করতে দেখে আমি সাহস করে তার কাছে গেলাম। ফিলিস্তীন সম্পর্কে পূর্ববর্তী জনসভার এক বক্তার যে পয়েন্টটি আমার মনে দাগ কেটেছিল সে পয়েন্টটি এ সভায় কোন বক্তার বক্তৃতায় না বলায় আমি তা বলার জন্য সাহস করলাম। চাচার কানে কানে বললাম 'আমিও কিছু বলতে চাই'। চাচা জনসভায় ঘোষণা করলেন 'এখন আপনাদের সামনে গোলাম আযম নামে একটি বালক বক্তৃতা করবে।' জনসভায় এটাই আমার প্রথম বক্তৃতা। আমি বিরাট উৎসাহ নিয়ে বক্তৃতা করার জন্যে মঞ্চে দাঁড়ালাম। মঞ্চে দাঁড়াবার পর রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। পা দু'টো কাঁপছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না, খুব জোরে সভাপতির টেবিল চেপে ধরে সামলিয়ে নিলাম। মাত্র দেড় মিনিটে চিৎকার করে আমার কথাটুকু বলে ধপ করে বসে পড়লাম। শ্রোতারা খুব হাততালি দিলো এবং সভা সমাপ্ত হওয়ার পর বেশ কিছু সংখ্যক লোক কাছে এসে আমার পরিচয় জানতে চাইলো। একজন মন্তব্য করলো মাওলানা আব্দুস সুবহানের নাতিই বটে!

এরপর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত কোথাও বক্তৃতা করার জন্য সাহস পাইনি। গ্রামের ঈদগাহ ময়দানে আব্বা বক্তৃতা করতেন। সেখানে কিছু বলার সুযোগ ছিলো না। লোকজনের বক্তৃতা শুনলে মনে হতো যে কাজটা সহজ। কিন্তু বক্তৃতা করতে দাঁড়ালে কেন এমন হতো তা রহস্যজনক।

আমাদের গ্রাম

গ্রামের নাম বীরগাঁও। ইউনিয়নও বীরগাঁও। বীরগাঁও নাম কবে কখন রাখা হয়েছে সে ইতিহাস জানা নেই। বাংলাদেশে গত পঞ্চাশ বছরে ব্যাপক সফরের সুযোগে বহু জায়গার বিচিত্র ও আজব নাম শুনেছি। নিশ্চয়ই সব নামের ইতিহাস আছে। যেমন গাইবান্ধা, হাতীবান্ধা, ভেড়ামারা, শিয়ালকাঠি, চিলমারী, বোয়ালমারী, রৌমারী, ঘোড়াঘাট, ঘোড়ামারা, বাঘমারা, পত্নীতলা, মগবাজার, হাতীঝিল ইত্যাদি। অনেক হাস্যকর নামের জায়গায়ও গিয়েছি। অবশ্য ঐ সব নাম আর মনে নেই। অনেক সুন্দর সুন্দর নামও অবশ্য আছে। যেমন নবীনগর, রসুলপুর, হাজীগঞ্জ, নেকবখত, ওলামাগঞ্জ, শরীয়তপুর ইত্যাদি।

আমাদের গ্রামে খাঁ বংশটাই বড়। তাদের মধ্যে যাদেরকে আমি দাদা ডাকতাম তাদের প্রায় সবাই দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিলেন। আমার দাদা, আব্বা ও চাচাদের দৈহিক গড়নও এদেশের জনগণের তুলনায় বেশ দীর্ঘই বলা যায়। এতে আমার ধারণা যে তাদের পূর্ব পুরুষ যখন এখানে বসবাস শুরু করেন তখন তারা বীর পুরুষই ছিলেন। ঢাকা থেকে আমাদের গ্রামে যেতে রেলপথে অথবা সড়কপথে ভৈরব গিয়ে মেঘনা নদীতে লঞ্চ বা মোটরবোটে যেতে হয়। এ মেঘনা নদীর উপরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভৈরব ও আশুগঞ্জের মাঝখানে বিখ্যাত রেলসেতুটি তৈরি হয়। কিভাবে সেতু তৈরি হচ্ছে দেখার জন্য মাঝে মাঝে আমরা ভৈরব আসতাম। ভৈরব ফেরীঘাট থেকে নদীপথে নবীনগর যাওয়ার মাঝপথে মাইল চারেক দূর আমাদের গ্রাম। শুকনার দিনে লঞ্চ বা মোটর চালিত নৌকা থেকে নেমে একমাইলের কাছাকাছি হাঁটতে হয়। অবশ্য বর্ষাকালে নৌকা বাড়ির ঘাটেই পৌছে।

শুকনাও নয় বর্ষাও নয় এমন এক সময় ঢাকা থেকে বীরগাঁও যেতে বেশ কষ্ট পেলাম। বাড়ি পৌছে গ্রামের স্কুলের হেড মাস্টার আমার বড় চাচাকে বললাম, 'আপনার আব্বা এমন জায়গায় কেন বাড়ি করলেন?' হেসে বললেন, 'আমার দাদারও আগে এখানেই আমাদের বাড়ি। সেকালে একমাত্র পথই ছিলো নদীপথ। তাই সারা দুনিয়াতেই নদীর কাছেই বসতি গড়ে উঠত।' সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এ কথাটি ঐতিহাসিক সত্য বলে উপলব্ধি করেছি।

আমাদের গ্রামে সম্প্রতি (২০০০) বিদ্যুৎ পৌছেছে। অবশ্য বিদ্যুতের খুঁটি ১২/১৩ বছর আগেই পোঁতা অবস্থায় দেখেছি। সড়ক পথ এখনও আমাদের গ্রামে প্রাচীনই আছে। রিকশা চলার মতো পথও নেই। যেটুকু পথ আছে কয়েকটা সেতু হলেই রিকশা চলা সম্ভব। এ ব্যাপারে এলাকার এমপিগণের সুদৃষ্টি এখনও পড়েনি। তাই নদীপথই একমাত্র সম্বল।

বিদ্যুৎ ও গ্রাম

যে পরিবেশ ও আবহাওয়ায় বাল্যকাল কাটে এর আকর্ষণ আজীবন অনুভূত হয়। মাছকে পানি থেকে তুলে আনার পর আবার পানিতে ছেড়ে দিলে কেমন অনুভব করে তা অনুমান করা যায়। গ্রামে গেলে আমারও মনে হয় যেন আপন পরিবেশে ফিরে এলাম।

শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় আমাদের জীবন বিদ্যুতের উপর এতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, গ্রামে গেলে এর অভাবেই অস্থির লাগে। এক সময় ভাবতাম যে বিদ্যুৎ থাকলে গ্রামই সবচেয়ে প্রিয় আবাসস্থল হতে পারে। দূষণমুক্ত পরিবেশ, উন্মুক্ত আকাশ, গাছপালায় ঘেরা বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকলে শহরে ফিরে আসতে মন চাইবে না বলে ধারণা ছিলো। কিন্তু এখন গ্রামে বিদ্যুৎ আসা সত্ত্বেও বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে শহর ছেড়ে যাওয়ার উপায় দেখছি না।

গ্রামীণ কালচার

সেকালে ফজরের পর মসজিদে অনেকেই কুরআন তিলাওয়াত করে মাঠে কাজ করতে যেতো। সকালে বাড়ি থেকে কুরআন পড়ার জন্য যাবার পথে প্রতি বাড়ি থেকেই কুরআন পড়ার আওয়াজ শুনা যেতো। আজকাল আর তেমনটা শুনা যায় না। আমাদের গ্রামের মসজিদে আমাদের পাশের বাড়ির আজিজ উল্লাহ্ মুন্সী আযান দিতেন। মাইক তখন ছিলো না; কিন্তু মুন্সী সাহেবের গলাতেই মাইক ছিলো। মাইল খানেক দূর থেকেও ফজরের আযান শুনা যেতো বলে লোকেরা বলাবলি করতো। আমাদের গ্রামের মসজিদে একটা চমৎকার রেওয়াজ ছিলো। এ রেওয়াজটা চালু করার ব্যাপারে আমার দাদার বেশ অবদান রয়েছে। সাধারণত গ্রামাঞ্চলের লোকেরা কোন মাজারে বা কোন পীরের খানকায় অথবা কোন দীনী ব্যক্তিকে হাদিয়া হিসেবে এটা-ওটা দিয়ে থাকে। যেমন গাছের পয়লা লাউ, ফলের মওসুমে নিজের গাছের ফল, মুরগির পয়লা ডিম, গাভীর পয়লা দুধ ইত্যাদি। আমাদের দাদা খুব বড় আলেম হয়েছেন শুনে কেউ কেউ তাকেই এ রকম দেওয়া শুরু করলো। জুমআর মসজিদে দাদা সবাইকে পরামর্শ দিলেন, আসুন, আমরা এ সবই আল্লাহ্র ঘরে দান করি। আমার মনে আছে যে, প্রত্যেক জুমআতেই কিছু না কিছু হাযির হতো এবং মসজিদের আঙ্গিনাতেই এগুলো নিলামে বিক্রি হতো ও মূল্য মসজিদের তহবিলে জমা হতো। আরো একটি রেওয়াজ ছিলো যে, ঘরে ঘরে একটি মাটির কলসী দেওয়া হতো যেটাতে পাক করার সময় একমুষ্টি করে চাল রাখা হতো। এ কলসীর চালের মূল্যও মসজিদ ফান্ডে জমা হতো। এ সব থেকেই মসজিদের ক্বারী সাহেবের বেতন দেওয়া হতো।

যদ্দুর মনে পড়ে সবাই সবাইকে দেখে সালাম দেবে আমাদের গ্রামে এমন রেওয়াজ তখন ছিলো না। অবশ্য আলেম উলামাগণকে সবাই সালাম দিতো। নেতা গোছের লোক হলে সালামের বদলে আদাব দেওয়া হতো। আদাব দেওয়ার রেওয়াজটা

হিন্দুদের কাছ থেকে শেখা। কারো সঙ্গে কারো দেখা হলে তারা অবশ্যই কথাবার্তা বলতো। কিন্তু কালাম করার আগে সালাম করার রেওয়াজ কমই ছিলো।

আমি যখন বড়াইল জুনিয়র মাদ্‌রাসায় পড়ি তখন শিক্ষকগণ সবাইকে সালাম দেওয়ার জন্য তাকিদ দিতেন। সে শিক্ষা পেয়ে আমাদের গ্রামের এক বড় নেতা দারু মিয়াকে আমি স্পষ্ট আওয়াজে আস্‌সালামু আলাইকুম বললাম। তিনি হাত তুলে আমার সালামের জওয়াব দিলেন কিন্তু মুখে ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম বলেছেন বলে শুনা গেলো না। দারু মিয়াকে আমি দারু চাচা ডাকতাম। মাঝে মধ্যে তাকে আমাদের বাড়িতে আব্বার সাথে গল্প করতে দেখেছি। তিনি বেশ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। খুব জোরে জোরে হাসতেন। কোথাও বসলে তার কণ্ঠস্বরই প্রধান আওয়াজ বলে শুনা যেতো। তিনি আমাদের এলাকার কয়েকটি ইউনিয়নের মধ্যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা হিসেবে গণ্য ছিলেন। আব্বার কাছে জানতে পারলাম আব্বার নাম নিয়ে তিনি নাকি মন্তব্য করেছেন ওর ছেলেটি বেয়াদব হয়ে গেছে, সে আমাকে আদাব দেয়নি।

ভদ্রলোকের পোশাক হিসেবে ধুতি হিন্দু-মুসলিম সবার মধ্যেই চালু ছিলো। শুধু মোল্লা মৌলভী জাতীয় লোকেরাই ধুতি পরতো না। আমার মনে আছে, তখন উপহার হিসেবে ধুতিও পেয়েছিলাম। পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে ধুতির প্রচলন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেলো।

বিবাহ্ শাদীতে এলাকার গণ্যমান্য যারা আসতেন তাদেরকে শেরওয়ানী ও রুমী টুপি নামে লাল রং-এর গোল ও খাড়া মজবুত টুপী পরতে দেখা যেতো। সেই টুপীর মাঝখান থেকে অনেকগুলো পাকানো কালো সূতার ঝালর পেছন থেকে ঝুলিয়ে রাখা হতো। হাই মাদ্‌রাসা পাস পর্যন্ত আমিও এ টুপী পরেছি। এ টুপী লিবিয়াতে ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত আছে। কিন্তু সে টুপীতে ঝালর নেই। ঢাকা শহরে এ টুপীর যথেষ্ট প্রচলন ছিলো। কলেজে আমার শিক্ষকদের অনেকেই এ টুপী পরতেন। বর্তমানেও ঢাকায় মোহাম্মদ সাখী মিয়া নামে ঢাকার একজন আদিবাসী প্রবীণ ইসলামপন্থী ব্যক্তি ঐ টুপীর ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। পাকিস্তানেরও সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিক ও প্রখ্যাত এক রাজনৈতিক নেতা এ টুপী এখনও পরেন। তিনি এককালে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তার নাম নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ্ খান। প্রতিটি সম্মিলিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। বর্তমানে পাকিস্তানে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স (NDA) গঠিত হয়েছে এর প্রধানও তিনি। ১৯৭০ সালে আইয়ুব খাঁর সাথে ৮ দলীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের যে Round Table Conference হয় তখনও ৮ দলীয় জোটের নেতৃত্ব ইনিই দেন। সে সময় উর্দু পত্রিকায় তাঁর যে পরিচিতি ফলাও করে প্রকাশ পেয়েছিল তার ভাষা ছিল, 'সের পর রুমী টুপী, এক হাতমে হুক্কাহ আওর দোসরে হাতমে পানদান, ইয়ে হায় নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ্ খান।'

সেকালের গ্রামে বিয়ে-শাদী

মুসলমান মেয়েদের বিয়ে-শাদী সহজভাবেই হতো। পাত্র পক্ষ থেকে যৌতুকের দাবির কথা কেউ চিন্তাও করতো না। যৌতুকের ব্যাপারটা হিন্দু সমাজেই ব্যাপকভাবে চালু ছিলো। এটা সম্ভবত এ কারণে যে মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা-মাতার কোন সম্পত্তি পেতো না। বরপক্ষের চাপে কনে পক্ষ থেকে যা কিছু সম্পদ আদায় করা যেতো তা ভোগের ব্যাপারে কনেরও আগ্রহ ছিলো।

ধনী মুসলমানদের মধ্যে যৌতুক প্রথা আগেও ছিলো। বিশেষ করে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে যারা নিম্নমানের তারা ধনী হওয়ার পর উচ্চ বংশের ছেলের কাছে বড় অংকের যৌতুকের বিনিময় বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ আগেও ছিলো, এখন আরো মজবুতভাবেই আছে। কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে এ প্রথা মোটেই ছিলো না। বিবাহের মজলিসে বিবাহের চুক্তি করার সময় কনে পক্ষের মোহরানা, অলংকার ও কাপড়-চোপড়ের দাবিই প্রাধান্য পেতো। এমনকি বিবাহের দিন বর পক্ষ থেকে চুক্তি মোতাবেক অলংকারাদি ও কাপড়-চোপড় না আনলে বিয়ের অনুষ্ঠানে সমস্যা সৃষ্টি হতো। আমাদের গ্রামের এক বিয়েতে এরকম সমস্যায় রাত দু'টা পর্যন্ত বিতর্ক চলে। শেষ পর্যন্ত গণ্যমান্য লোকেরা দাবিকৃত জিনিসের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিয়ে পড়ানো হয় এবং তিনটার দিকে বরযাত্রীকে খানা দেওয়া হয়।

আজকাল একেবারে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও যৌতুক ছাড়া বিয়ে করতে রাজি হয় না। মনে হয় বিয়েটা যেন শুধু মেয়েরই দরকার, ছেলের বিয়ে করার কোন ঠেকা নেই। বিয়েতে ছেলের বয়স বেশি হলেও দোষ ধরা হয় না। মেয়ের বয়স বেশি হলে সমস্যা। তাই কনে পক্ষকে দায়ে ঠেকে সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে যৌতুক দিয়ে কনেকে পাত্রস্থ করতে হয়। এ যৌতুক প্রথাটি ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য প্রথা। ইসলাম স্ত্রীকে মোহর দেওয়ার জন্য স্বামীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। অথচ বর্তমানে উল্টা বরকেই কনে পক্ষ থেকে যৌতুকের নামে মোহর দিতে হচ্ছে।

একেবারে গরীব ঘরের বউকে বিয়ের পরে মিছিল করে হাঁটিয়েই নিয়ে যাওয়া হতো। তাই বেশির ভাগই গরীব ঘরের মেয়েদের বিয়ে বর্ষাকালে হতো যাতে কম খরচে নৌকা দিয়ে বউকে বরের বাড়ি নেওয়া যায়। মধ্যবিত্ত ও সচ্ছল লোকেরা পাল্কি দিয়ে বউ নিয়ে যেতো। আমাদের গ্রামের রাজনৈতিক নেতা দারু মিয়ার বাড়িতে আটজন উড়িয়া পাল্কি বাহক থাকতো। এরা সবাই বেশ স্বাস্থ্যবান ছিলো। এরা সবাই হিন্দু ছিলো এবং তা দেওয়ার মতো বড় মোছ রাখতো। আশপাশের কয়েকটি ইউনিয়নের সচ্ছল লোকেরা তাদেরকে ভাড়া করে নিয়ে যেতো। একেক দিকে দু'জন দু'জন করে পাল্কি কাঁধে নিয়ে যেতো। উড়িয়া ভাষায় সুর করে কি সব বলতে বলতে তারা বেশ দ্রুত হেঁটে পাল্কি বহন করতো। বিয়ের ব্যাপারে একটি কু-প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিলো যা এখনও শহুরে অঞ্চল পর্যন্ত কিছু কিছু চালু আছে। সেটা হলো বরযাত্রী কনের বাড়িতে পৌঁছাবার পর বিয়ে পড়াবার আগে কনের এজিন (সম্মতি) নেবার

জন্য বরপক্ষের লোককে কনের উকিল নিযুক্ত করা হতো। সে উকিলকে নিয়ে কনে পক্ষের লোকেরা এজিন নিয়ে আসতো। কনে পক্ষের দু'জন লোক ঐ উকিলের সাথে গিয়ে এজিন নিয়ে আসতো। বিয়েতে যে উকিল হতো সে কনের উকিলবাপ হিসেবে গণ্য হতো এবং উকিলবাপের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক চালু থাকতো।

শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহের সময় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই যদি উপস্থিত থাকে তাহলে কনের কোন উকিলের দরকার থাকে না। শুধু বিবাহ অনুষ্ঠানের দু'জন সাক্ষী থাকলেই চলে। কিন্তু যেহেতু পর্দার কারণে বিবাহের মজলিসে বরের সামনে কনেকে হাজির করা মানানসই নয়, সেহেতু এ বিয়েতে কনে রাজি কিনা তা জানার প্রয়োজন হয়। নিয়ম হলো, কনে তার নির্ভরশীল কোন লোককে তাকে বিয়ে দেবার এখতিয়ার দেয়। যাকেই এখতিয়ার দেওয়া হয় তাকেই উকিল বলে। এ উকিলকে যে এখতিয়ার দেওয়া হলো এর দুজন সাক্ষী থাকতে হবে। উকিল ও দুই সাক্ষীর কেউ বরপক্ষের লোক হওয়ার কোন যুক্তি নেই। অর্থাৎ অনেক সময় বরপক্ষ থেকে একজন সাক্ষীর দাবি জানানো হয়। এটা একেবারে অন্যায় দাবি।

কনের এজিন নেওয়ার ব্যাপারটা কনে পক্ষেরই দায়িত্ব। উকিল এবং সাক্ষী কনের দুজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়া উচিত যাদের সঙ্গে পর্দা করতে হয় না ও যারা তার গলার আওয়াজ চেনে। এযিন নেবার সময় কনে ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় থাকে এবং খুবই নিম্নস্বরে সম্মতি জানায়। লজ্জার কারণে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি দিলেও চলে।

আমার থানা ও জেলা

থানার নাম নবীনগর। এর চেয়ে বেশি প্রিয় নাম কী হতে পারে? এ নাম নিতে প্রাণ ভরে যায়। কবে এ নাম শুরু হয় সে ইতিহাস জানি না। এ নামটি নিশ্চয়ই মুসলিম চেতনার প্রমাণ বহন করে। অবশ্য জেলার নামটি এর বিপরীত। থানা নবীনগর বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণের অধীন। জেলার নাম ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। সংক্ষেপে বি-বাড়ীয়াও বলা হয়। এ নামের ইতিহাসও জানা নেই।

'ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সংবাদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় এ নামের ইতিহাস নামে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। লেখক কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির ভিত্তিতে যা কিছু লিখেছেন তা ইতিহাস হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তবে এককালে সেখানে বাহ্মণদের প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব নিশ্চয়ই ছিলো। তা না হলে ব্রাহ্মণ শব্দটি নামের প্রধান অংশ হতো না।

ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত বঙ্গদেশের কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় অফিস ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেই ছিলো। পাকিস্তান আমলে তাদের কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।

বাল্যকাল থেকেই সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছি। ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করায় শিক্ষা, চাকরি, পেশা, ব্যবসা, জমিদারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা প্রতিপত্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। আমাদের বীরগাঁও ইউনিয়নের পাশেই কৃষ্ণনগর

ইউনিয়ন। কৃষ্ণনগরে এখনও বিরাট প্রাচীরে ঘেরা হিন্দু জমিদার বাড়িটি রয়েছে। ছোট সময় শুনেছি যে, এ বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে মুসলমানদেরকে জুতাপায়ে ও ছাতামাথায় যাতায়াত করতে দেওয়া হতো না।

মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন না হলে এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত না হলে আজও মুসলমানরা হিন্দু প্রাধান্য থেকে মুক্তি পেতো না।

নবীনগর থানাটি দেশের বড় বড় কয়েকটি থানার মধ্যে একটি। জিয়াউর রহমানের আমলে এ থানার এমপি মন্ত্রীও ছিলেন। কিন্তু থানায় তেমন উন্নয়নমূলক কিছু হয়নি। এমপিগণ যদি সড়ক পথের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করতেন তাহলে যাতায়াতের দুরবস্থা থেকে থানাবাসী রক্ষা পেতো।

ঢাকা থেকে নবীনগর খুব দূরে নয়। রেলে ঢাকা থেকে ভৈরব হয়ে মেঘনা নদীপথে লঞ্চে মাত্র ৮/৯ মাইল। সড়ক পথে যেতে হলে এর তিনগুণ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। ঢাকা থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক দিয়ে কুমিল্লা শহরে পৌছাবার আগেই ময়নামতি (যেখানে কুমিল্লা সেনানিবাস অবস্থিত) হয়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পথে যেতে হয়। নবীনগর থেকে স্থলপথে বীরগাঁও আসতে হলে মানব জাতির প্রাচীনতম পদ্ধতিতেই হেঁটে যেতে হয়। তাই সবাই নদীপথেই যেতে বাধ্য হয়।

কুমিল্লা শহরের বৈশিষ্ট্য

কুমিল্লা গিয়ে পয়লাই শুনলাম এ শহরটি ব্যাংক ও ট্যাংক (দীঘি)-এর জন্য বিখ্যাত। বেশ কয়টি বড় বড় Bank কুমিল্লায় ছিলো। সবক'টি ব্যাংকের মালিকানা ও পরিচালনা হিন্দুদের হাতে ছিলো।

সেকালে জেলার নাম ছিলো ত্রিপুরা ও জেলা কেন্দ্র ছিলো কুমিল্লা। জেলা শহরের বাইরে গংগাসাগর ও কমলাসাগর নামি বিরাট দু'টি দীঘি অত্যন্ত বিখ্যাত। এমনকি শহরের ভেতরে নানুয়ার দীঘি নামে এমন একটি বিরাট দীঘি রয়েছে যার তুলনা বাংলাদেশের কোন শহরে নেই। এ দীঘির পারেই সকাল-বিকাল ভ্রমণের ভীড় হতো। দীঘির পানি পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনে দীঘিতে গোসল করা বা কাপড় কাচা নিষেধ ছিলো। মিউনিসিপ্যালটিও শহরটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কর্মতৎপর ছিলো।

ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে গেলে একচেটিয়া হিন্দুদের হাতেই ছিলো। হিন্দুদের পরিচালিত ঈশ্বর পাঠশালা নামের হাইস্কুলটি সেরা স্কুল হিসেবে পরিচিত ছিলো। সে স্কুলে মুসলমান ছেলেকে ভর্তি করা হতো না। মুসলমান মেধাবী ছেলেরা সরকারি জেলাস্কুলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই স্থান পেতো। ডাক্তারী পেশায়ও হিন্দুদের প্রাধান্য ছিলো। আইন ব্যবসায় বড় বড় হিন্দু এডভোকেট ছিলেন। ব্যবসায় মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্যই ছিলো। পাকিস্তান কায়েম হবার পর পূর্ব-পাকিস্তানে কংগ্রেসের নেতৃত্ব কুমিল্লা বারের উকিলরাই দিয়েছে এবং তাদের মধ্য থেকে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও হয়েছে।

সেকালে বঙ্গদেশে পাঁচটি ডিগ্রি কলেজকে প্রিমিয়ার কলেজ বলে গণ্য করা হতো। যার মধ্যে ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া আর সবক'টি বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত। এর একটি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ। অপর তিনটি বরিশাল ব্রজ মোহন কলেজ, মোমেনশাহীতে আনন্দ মোহন কলেজ ও রংপুরে কারমাইকেল কলেজ। বলাবাহুল্য, এর সবক'টি হিন্দু জমিদারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

সর্বক্ষেত্রে হিন্দু প্রাধান্য

আমার কুমিল্লার ছাত্রজীবনে এটা উপলব্ধি করেছি যে, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় অনেক অগ্রসর এবং মুসলমানরা সকল ক্ষেত্রে দুর্বল। একমাত্র মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ভূমিকাই মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, মুসলিম জাতীয়তাবোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা জুগিয়েছে।

৬.

আমার বংশ পরিচয়

নবী করীম (স) বলেছেন, 'যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।' এ থেকে বুঝা গেলো বংশ নিয়ে গৌরব করার কিছু নেই। আসল হলো ঈমান ও আমল। নবীর বংশেও কাফের পয়দা হয়েছে। কাফেরের বংশেও নবী পয়দা হয়েছে। এ সত্ত্বেও বংশের একটা মর্যাদা আছে। উন্নত চরিত্র এবং উন্নত বংশের সমন্বয়ের অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে।

কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত, নবী ও রাসূলগণ সমাজের মর্যাদাবান বংশেই পয়দা হয়েছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (স)-এর চরম দুশমন আবু সুফিয়ানও রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রশ্নের জওয়াবে এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছে যে, মুহাম্মদ (স) সবচেয়ে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নবী করীম (স) নিজের বংশ সম্পর্কে বলেন, 'ইসমাঈল বংশ হতে আল্লাহ তাআলা কিনানা বংশকে বাছাই করেছেন। কিনানা বংশ থেকে কুরাইশ বংশকে বাছাই করেছেন এবং কুরাইশ বংশ হতে হাশেমী বংশকে বাছাই করেছেন, আমাকে ঐ হাশেমী বংশ থেকে পয়দা করেছেন।' আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা জগৎ সৃষ্টি করে আমাকে জগতের সেরা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর গোত্রসমূহকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রভুক্ত করলেন। এরপর গৃহসমূহকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গৃহের সদস্য করলেন। সুতরাং আমি মানুষ ও বংশ অনুযায়ী সবার সেরা।'

সকল মানুষই আদম সন্তান। যখন আদম সন্তানের মধ্যে কেউ এমন সব গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী হয় যা মানুষের প্রশংসা লাভ করে তখন জনগণের নিকটও সে

সম্মানের অধিকারী হয়। তার সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং তার সন্তানরাই তার বংশধর হিসেবে সমাজে মর্যাদা ভোগ করে। এভাবেই কোন কোন বংশ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়। কিন্তু এই বংশেরই কোন লোক যদি মানুষ হিসেবে ঘৃণার পাত্র হয় তাহলে শুধু বংশের দোহাই দিয়ে সে কারো কাছ থেকে সম্মান পায় না। যোগ্যতা ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর কারণে কোন বংশ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলে পরবর্তী বংশধররা পূর্ব পুরুষের উন্নত চরিত্র ও সুনাম-সুখ্যাতি থেকে প্রেরণা বোধ করলে এতে দোষের কিছু নেই। বরং বংশগত গৌরববোধ তাকে উন্নত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এ উদ্দেশ্য ছাড়া বংশের গর্ব অর্থহীন ও দূষণীয়। এ হিসেবেই আমার বংশ পরিচয়ের উল্লেখ করছি।

আমার বংশের ইতিহাস লেখা নেই। বাপ-দাদা থেকে যতটুকু জানা যায়, তাতে আমার আব্বার পূর্বের চার পুরুষ পর্যন্ত নাম জানতে পেরেছি। আমার আব্বা মাওলানা কাজী গোলাম কবির, পিতা মাওলানা আব্দুস সুবহান, পিতা শেখ সাহাবুদ্দীন মুন্সী, পিতা শেখ বখতিয়ার, পিতা শেখ তকী। সম্ভবত শেখ তকী পয়লা মেঘনার তীরে বীরগাঁও এসে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন সেটা জানা নেই। তাদের নাম থেকে শেখ বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দাদা নিজের নামে শেখ না লেখায় পরবর্তীকালেও আর কেউ লেখেনি।

দাদার কাছ থেকে একথাও জানা গেছে, তার পূর্ববর্তী সাত পুরুষ পর্যন্ত পরিবারের একজন মাত্র সদস্য থাকায় এ বংশ বৃদ্ধি পায়নি। দাদার ছোট এক ভাই ছিলেন যিনি বিবাহের আগে মারা যান। দাদার লেখাপড়া শেষ হলে তার পিতা এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশে তাকে বিয়ে করান। বিয়ে করাবার পর তিনি হজ্জে রওয়ানা হবার পূর্বে আমার দাদাকে বলে যান, 'আমি আল্লাহর ঘরে গিয়ে দোয়া করব যেন আল্লাহ তোমাকে ৪টি পুত্র সন্তান দান করেন, যাতে এ বংশের বৃদ্ধি ঘটে। সংসারের দায়িত্ব তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। আমি বাকি জীবন আল্লাহর ঘরের পাশে কাটাতে চাই, দেশে ফিরে আসতে চাই না।' আল্লাহর ইচ্ছায় ঐ বছরের পর দ্বিতীয় হজ্জের জন্য আরাফাহর ময়দানে অবস্থানকালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আমার জীবনে দাদার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি অনুভব করি। তাঁর সান্নিধ্য আমি যথেষ্ট পেয়েছি। আমি যখন ক্লাস ফাইভের ছাত্র তখন আমার দাদা ইন্তিকাল করেন। তখন আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর। যদিও দাদার আব্বা (আমার বড় আব্বা)-কে আমার দেখার কথা নয় কিন্তু তার দীনী উন্নতি ও জীবনযাপন পদ্ধতির কথা যতটুকু জেনেছি তাতে আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনি নিশ্চয়ই তার পরবর্তী বংশধরের দীনী উন্নতির জন্য আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতেন।

দিনের বেলায় দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে মাসলা-মাসায়েল জানার জন্য যারা আসত তিনি তাদেরকে যত্ন করে দীনের শিক্ষা দিতেন। রাতের বেলা তিনি বাড়িতে কমই

থাকতেন। আমাদের গ্রামের শেষে উত্তর দিকে কবরস্থান রয়েছে এবং কবরস্থানের পরেই একটি আম বাগান আছে। এ বাগানটি আমার বড় আব্বাই তৈরি করেছেন। তিনি একটি কুঁড়েঘর করে সেখানে রাত যাপন করতেন এবং দিনের বেলা বাড়ি আসতেন। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন বাড়ি থাকতাম তখন আমের মওসুমে দিনের বেলা আমার ছোট চাচা ও আমরা দু'ভাই ঐ আম বাগানে লেখাপড়া করতাম। আর ফাঁকে ফাঁকে আম কুড়িয়ে খেতাম। আম বাগানে ৭/৮টি বড় বড় আম গাছ ছিলো যার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ও অদ্ভুত মোটা ১টি গাছ ছিলো যা আমার বড় আব্বার হাতে লাগানো, আর বাকি সব গাছ দাদার লাগানো। একদিকে কিছু গাছ পুরনো হয়ে যাওয়ায় কেটে ফেলার পর দাদা যখন নতুন করে গাছ লাগান তখন আমিও তার সাথে কাজ করেছি। গাছ-গাছড়া লাগানোর আমার যে নেশা আছে তা দাদার কাছ থেকেই শেখা। পরবর্তীকালে চান্দিনায় আব্বার কাছ থেকে গাছ লাগানোর ব্যাপারে আরো অনেক কিছু শিখেছি।

আমার আব্বা, দাদা ও বড় আব্বার যে সব গুণাবলি আমাকে প্রেরণা দিয়েছে সে সবকে স্মরণ করি বলেই বংশের গুরুত্ব অনুভব করি। এ কারণেই আমার দাদার বংশের সবার মধ্যেই দীনের দিক দিয়ে উন্নতির জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করি।

আমাদের বংশের দৈহিক গড়ন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পড়ার সময় এক পেপার ছিলো সমাজবিজ্ঞান বা সোসালজী (Sociology). প্রফেসর এ. কে. সেন এ পেপারটা পড়াতেন। এ বিষয়ে এমন চমৎকার জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেলাম যা থেকে আমার মনের একটি বিরাট প্রশ্নের জওয়াব পেয়েছি। আমার সে প্রশ্নটি ছিল, সকল মানুষ আদম সন্তানই হয়ে থাকলে তাদের মধ্যে চেহারার গড়নে এত পার্থক্য কেমন করে হলো? কেউ একেবারেই সাদা, কেউ কালির চেয়ে কালো কি কারণে হলো? এত ভাষাই বা কি করে সৃষ্টি হলো? এ সব প্রশ্নের বিস্তারিত জওয়াব জানা না গেলেও একটি বুঝ পেয়েছি।

সমাজবিজ্ঞানে মানুষের উপরে ভূগোলের প্রভাব আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন পেশার কারণে মানুষের দৈহিক গড়নে, গায়ের রং-এ এবং ভাষায় হাজার হাজার বছরে কিভাবে পরিবর্তন এসেছে এর মোটামুটি যুক্তিপূর্ণ ধারণাই পেয়েছি। ভাষার উপরে ভূগোলের প্রভাব আমাদের দেশেও লক্ষ্য করা যায়। যে এলাকায় লোকসংখ্যা বেশি এবং রাত-দিন জীবিকার জন্যে ব্যস্ত থাকতে হয় সেখানে লোকদের ধীরে সুস্থে কথা বলার অবসর নেই। তাই তারা দ্রুত ও সংক্ষেপে কথা বলতে বাধ্য হয়, এতে ভাষা এক বিশেষ রূপ নেয়। যে এলাকায় মানুষের যথেষ্ট অবসর থাকে এবং ধীরে সুস্থে টেনে টেনে কথা বলার মতো সময় পায় তাদের ভাষা ভিন্ন রূপ নেয়। এ কারণেই একই বাংলা ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও নোয়াখালী ও মোমেনশাহীর ভাষায় বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। এভাবেই ভাষার রূপ

বদলাতে বদলাতে ভিন্ন ভাষায় পরিবর্তিত হয়। চট্টগ্রাম ও সিলেটের ভাষার ব্যবধান সুস্পষ্ট। সমাজবিজ্ঞানের এ জাতীয় আলোচনায় আমি খুবই মজা পেতাম।

প্রফেসর এ. কে. সেন নৃতাত্ত্বিক (Anthropology) বিষয়ে আলোচনার সময় ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে কার চেহারায় কত পার্সেন্ট Arian blood আছে কত পার্সেন্ট Dravidian blood আছে তা হিসাব কষে দেখিয়ে দিতেন। লম্বাটে চেহারা, খাড়া নাক, বড় চোখ, পাতলা ঠোঁট এবং প্রশস্ত কপাল এ সব হলো আর্যদের চেহারা। আর মোটা ঠোঁট ও নাক, ছোট চোখ, এ সব হলো দ্রাবিড়দের লক্ষণ। এ সব পড়াতে গিয়ে প্রফেসর সেন আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, তোমার মধ্যে ৭৫% এরিয়ান ব্লাড রয়েছে।

আমাদের গ্রামে বিভিন্ন বংশীয় লোক আছে। তাদের মধ্যে দেহের দৈর্ঘ্য ও চেহারার কাঠামো দেখে কে কোন বংশের লোক তা মোটামুটি বুঝা যায়। আমার দাদা, আব্বা ও চাচাদের দৈহিক গড়ন ও চেহারার ধরন অন্য সব বংশের লোকদের থেকে স্পষ্টই ভিন্ন।

আমার উপরে দাদার প্রভাব

দাদার ৫ ছেলে ও ১ মেয়ের মধ্যে আমার আব্বাই সবার বড়। আমি আব্বার প্রথম সন্তান এবং নতুন প্রজন্মে বংশের প্রথম। দাদা নবীনগর থানার প্রথম বড় আলেম। ঢাকার বিখ্যাত মুহসিনিয়া মাদ্রাসা থেকে পাস করে সেখানেই তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। সে মাদ্রাসাটিই নিউস্কীমে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত হয়। দাদার পিতার কাছে মানুষ দীনের যে আলো পেতো তিনি এলাকায় না থাকায় এলাকাবাসী দাদার কাছ থেকেও তা পাওয়ার দাবি জানায়। তাই তিনি নবীনগরের ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এবং কাজীর পদকে উপলক্ষ করে এলাকায় চলে যান। ৬৫ বছর বয়সে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বাকি জীবন গ্রামেই কাটান।

আমি বড় নাতি হিসেবে দাদা ও দাদীর সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আব্বা সপ্তাহে একদিন মাত্র বাড়িতে থাকতেন। ৬ দিনই থাকতেন নবীনগরে। তাই আব্বার সান্নিধ্য কমই পেতাম। রাতে আমি ও আমার ছোট ভাই গোলাম মুয়ায্যাম দাদীর দু'পাশে ঘুমাতাম। দাদা আমাকে সাথে না নিয়ে খেতেন না।

খুব ছোটকালের কথা তো মনে নেই। যে সময়ের কথা মনে আছে তাতে বলতে পারি দাদাই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। দাদার কাছে আর কেউ না থাকলে আমাকে ডেকে নিতেন এবং মুখে মুখে অনেক কিছু শেখাতেন।

দাদার কাছে বিয়ে, তালাক, ফারায়েয সম্পর্কে জানার জন্য বহু দূর থেকেও লোক আসতো। তাঁর তৈরি ও দস্তখতকৃত এবং সীলমোহরযুক্ত ফারায়েযপত্র উকীলরা সনদ হিসেবে কোর্টে পেশ করতো।

দাদার সাথে এত ঘনিষ্ঠতার কারণে একবার বিপদে পড়েছিলাম। আম্মাকে নিয়ে দাদা নিজেই একবার ঢাকায় বেড়াতে আসলেন। দাদা ছাত্রজীবনে এ বাড়িতেই লজিং থাকাকালে বড় মামার গৃহশিক্ষক ছিলেন। দাদা আম্মাকে রেখে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় বললেন, 'কি ভাই, তুমি কি আমার সাথে যাবে? তোমাকে ছাড়া আমি বাড়িতে কেমন করে থাকবো?' দৌড়ে গিয়ে আম্মাকে বললাম, 'আমার জামা-কাপড় দিন, দাদার সঙ্গে বাড়ি চলে যাবো।' আম্মা বিস্মিত হলেন। আপত্তিও করলেন, কিন্তু আমাকে আটকাতে পারলেন না। আবেগ তাড়িত হয়ে দাদার সঙ্গে চলে এলাম। কিন্তু দু'তিন দিন পরেই আম্মা, ছোট ভাই ও ছোট বোনদের কথা মনে হলে চোখে পানি আসতো, কিন্তু দাদা-দাদীর সামনে সামলে নিতাম। আমার এখনও মনে পড়ে মনটা বেশি খারাপ লাগলে চুপ করে নিরিবিলি জায়গায় যেয়ে কাঁদতাম।

দাদা মৃত্যুর পূর্বে বড় চাচাকে ডেকে অসিয়তনামা লেখালেন। সম্পত্তি সম্বন্ধে সেখানে লিখালেন, তোমার বোনের অংশ বাদে বাকি সব ভাইয়ের সঙ্গে আমারও সমান হিস্যা থাকবে। আমার হিস্যাটা আমার বড় নাতিকে দেবে। ১৯৩৬ সালে দাদা ইন্তিকাল করলেন। যতদিন বড় চাচা জীবিত ছিলেন তিনি সকল জমি দেখাশুনা ও ভোগ করতেন। চাচার ইন্তিকালের পর থেকে এখনও আমি দাদার হিস্যা ভোগ করছি। দাদার স্নেহের পরশ এভাবে এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। আব্বা-আম্মার জন্য যখন দোয়া করি তখন দাদা-দাদীকেও সমানভাবেই দোয়াতে শরীক করি।

দাদার মৃত্যু

দাদার ইন্তিকালের পূর্বে আর কোন লোককে মৃত্যুকালীন অবস্থায় দেখার সুযোগ আমার হয়নি। আমার এক চাচার কথা সামান্য মনে পড়ে যিনি যক্ষ্মা রোগে মারা যান। রুগ্ন অবস্থায় তাকে আমি শয্যাগত দেখেছি মনে পড়ে। তার মৃত্যুকালে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না।

প্রসঙ্গক্রমে ঐ চাচা সম্বন্ধে একটু কথা বলতে হয়। তিনি ঢাকা কলেজে ছাত্র থাকাকালে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। সেকালে যক্ষ্মার কোন চিকিৎসা ছিলো না। এ কথাই প্রচলিত ছিলো যে, 'যার হয় যক্ষ্মা তার নাই রক্ষা'। সেকালে যেটুকু চিকিৎসা ছিলো তা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তার মৃত্যু অনিবার্য। আমার আব্বা ও বড় চাচার পরে একমাত্র ফুফু। ঐ ফুফুর কাছেই এ চাচার কথা শুনেছি। আমার ফুফুর পরেই এ চাচার জন্ম হয়। ফুফু তার এ ভাইটিকে এত স্নেহ করতেন যে, ঢাকা কলেজের একদল ছাত্রের সঙ্গে ঐ চাচার ফটোটিকে বাঁধাই করে সিন্দুকে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে সিন্দুক থেকে খুলে আমাদেরকে দেখাতেন। এ ফুফুর কাছেই শুনেছি ঐ চাচা বলতেন, 'আমার চিকিৎসা করে কোন লাভ হবে না। কারণ আমার দাদা হজ্জে যাওয়ার সময় আব্বাকে বলেছেন, তিনি চার ছেলের জন্য দোয়া করবেন। তার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন বলে আমাদের বংশ বেড়েছে। তিনি তো দোয়া করেছেন ৪ ছেলের জন্য।

আমরা তো এখন ৫ ভাই। আমার বড় দু'ভাই ও ছোট দু'ভাই। একজনকে তো মরতেই হবে, যেহেতু ৪ জনের জন্য দোয়া করেছেন। তাই যক্ষ্মার মতো রোগ হয়েছে আমার।'

আমি দাদার ইন্তিকালের কথাই বলছিলাম। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাস। তখন রমযান চলছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটির কারণে বাড়িতেই ছিলাম। পড়াশুনা ছাড়া বেশি সময় দাদার কাছেই থাকতাম। বার্ধক্য ছাড়া তাঁর বড় কোন অসুখ ছিলো না। বেশ কিছুদিন থেকে নরম পায়খানা হচ্ছিল এবং দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। তিনি অনুভব করছিলেন যে, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তাই যে-ই দেখতে আসতো তার কাছে একথা বলে দোয়া চাইতেন, 'আমার রূহ নিয়ে যাবার জন্য আল্লাহ যে ফেরেশতা পাঠাবেন, সে যেন আসানির সঙ্গে আমার জান নিয়ে যায় এ দোয়া চাই।'

যেদিন তাঁর ইন্তিকাল হয় সেদিন ফজরের নামাজের পর আমি আমার এক চাচা ও দাদী দাদার বিছানার পাশেই বসা ছিলাম। শুয়ে শুয়ে তায়াম্মুম করলেন এবং শুয়ে শুয়েই ফজরের নামায পড়লেন। তার নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথেই দাদী ঐ ঘরে নামাযে দাঁড়ালেন। দাদা হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে দাদীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনি আমাকে বিদায় দিয়েই নামায পড়তে যান। এখনই ফেরেশতা আসবে।' আমরা হতবাক হয়ে চেয়ে থাকলাম, দাদী কাছে এসে বললেন, 'আপনার একমাত্র মেয়ে না দেখতে পেলে কেঁদে কেটে জান দিয়ে ফেলবে। এখনই আপনি বিদায় নিলে কেমন হবে?' দাদা বললেন, 'দেরি করলে তো আমার কষ্ট হয়।' তখন দাদী নামায পড়লেন।

আমার ফুফু ঠিক দশটায়ই তাল শহর থেকে পাল্কিতে চড়ে বাড়িতে পৌছলেন। আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলাম আদরের কন্যাকে দেখতে পেয়ে তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। দীর্ঘক্ষণ পিতা ও কন্যার মধ্যে আলাপ-আলোচনা চললো। ফজরের সময় তিনি দাদী থেকে বিদায় চাইলেন। অথচ সারাটা দিন আগের তুলনায় সুস্থ বলে মনে হলো। ঐ দিন মাগরিবের পর ফুফু এক কাপ দুধ হাতে নিয়ে দাদাকে খেতে বললেন। তিনি বললেন, 'আমাকে ধরে বসাও।' গত কিছু দিন থেকে তিনি বসতে অক্ষম ছিলেন বলে বসাব কিনা সে বিষয়ে আমরা দ্বিধায় পড়লাম। তিনি আরো একটু উচ্চৈঃস্বরে বসাতে বললে আমরা তাঁকে ধরে বসিয়ে পিঠে ঠেস দিয়ে বসলাম। ফুফুর হাতে তিনি দুধটুকু খেলেন। আমরা এ অবস্থা দেখে আশ্বস্ত হলাম যে, তিনি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকবেন। দুধ খাওয়া শেষে তিনি বললেন, 'আমাকে শুইয়ে দাও।'

তাঁর বিছানা এমন ছিলো যে, শয্যাগত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম শিয়রে শুতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি উত্তর শিয়রে শোয়াবার জন্য নির্দেশ দিলেন। দুধ পান করাবার পর তাঁকে আমরা শুইয়ে দিলাম। তাঁর এক পাশে দাদী ও ফুফু বসা আরেক পাশে আমি ও আমার এক চাচা বসা। দাদার সুস্থ অবস্থা দেখে খুশি হয়ে আমরা আলাপ-সালাপ করছি। কয়েক মিনিট পর দাদা বললেন, 'আমাকে ডান পাশে কাত

করে দাও।' আমরা কাত করে দিলাম। তিনি ডান হাতটা গালের কাছে নিয়ে রাখলেন। আমাদেরকে বললেন, 'তোমরা কথাবার্তা বলো না, আমাকে ঘুমুতে দাও।' এই বলে তিনি চোখ বুঁজে রইলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম ধীরে ধীরে ঠোঁট নড়ছে এবং ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে তিনি গুণছেন। কিছুক্ষণ পর পরই এক গিরা এক গিরা করে আঙুল অগ্রসর হচ্ছে। ছয় নম্বর গিরায় যেয়ে আঙ্গুলটা থেমে গেলো। আমরা সবাই বুঝলাম দাদা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ১৫/২০ মিনিট পর আমার চাচা নাড়ী ধরে টিপে দেখলেন যে, নাড়ীর কোন স্পন্দন বুঝা যায় না। নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলেন নিশ্বাস বেরুচ্ছে বলেও মনে হয় না। দাদী সামান্য একটু দূরে ছিলেন। চাচা চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'মা, এসে দেখুন, বাজান কি ঘুম ঘুমাচ্ছেন।' বাড়ির সবাই উপস্থিত হয়ে নিশ্চিত হলো যে, তিনি ইন্তিকাল করেছেন।

এ রকম মৃত্যুর কথা আমি আর কখনও শুনিনি। দাদার এই মৃত্যু দেখে তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা আরো বেড়ে গেলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রিয় ছিলেন। এর পর থেকে দাদার স্মৃতি আমার জীবনে প্রভাবশালী বলে অনুভব করেছি। এর ফলে তাঁর উপদেশাবলি আগে অবহেলা করলেও তাঁর মৃত্যুর পর আর অবহেলা করতে সাহস হতো না। এ কারণে আমি অনুভব করি যে, আমার জীবনে তাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। মুরুব্বীর উপদেশ মেনে চলার মধ্যে যে তৃপ্তি তা আমি অনুভব করি। তাঁর উপদেশ আমার জীবনে কতো কল্যাণময় হয়েছে, সে কথা মনে হলে প্রাণভরে তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকি।

৭.

ঢাকায় আমার পাঠ্যজীবন

আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমার ছোট চাচা জনাব শফিকুল ইসলাম সরকারি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র ছিলেন। কুমিল্লায় আমার ক্লাসের সেকেন্ড বয় আমার চেয়ে ১০০ নম্বরেরও কম পাওয়ায় আব্বা মনে করলেন যে, পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে আমার চেয়েও ভালো ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতার সুযোগ পেতে হবে। তাই ছোট চাচার সাথে পরামর্শ করে ঢাকায় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান কবি নজরুল কলেজে) ভর্তির সিদ্ধান্ত নিলেন।

ঢাকায় ভর্তি করার উদ্দেশ্যে আব্বা কুমিল্লা হাই মাদ্‌রাসায় টিসির জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট গেলেন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব খুবই বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ক্লাস এইটের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রটিকে আপনি নিয়ে গেলে আমার মনে খুব কষ্ট লাগবে। হাই মাদ্‌রাসার ফাইনাল পরীক্ষায় সে বৃত্তি পাবে বলে আমি আশা করি।' আব্বা বললেন, 'যাতে আরো ভালো ফল করতে পারে সে কারণেই আমি ঢাকায় নিয়ে যেতে চাই। সেখানে অনেক মেধাবী ছাত্র রয়েছে। তাদের সাথে প্রতিযোগিতা

করতে বাধ্য হলে আরো ভালো ফল করতে পারে।' সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব শেষ-পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন।

১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ক্লাস নাইনে ভর্তি হলাম। কলেজের নিকটবর্তী কলতাবাজার হোস্টেলে স্থান পেলাম। কুমিল্লার তুলনায় ঢাকায় শিক্ষকদের মান যে রকম উন্নত ছিলো ছাত্রদের মানও সে রকম ভালো ছিলো। প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় ক্লাসে আমার পজিশন ছয় নম্বরে চলে গেলো। ক্লাস ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত ক্লাসের ফার্স্ট বয় হিসেবে যে গর্ববোধ ছিলো তা চূর্ণ হয়ে গেলো। এ খবর পেয়ে আব্বা আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'কুমিল্লায় তো তোমাকে এ রকম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। এ কারণেই আমি সেখান থেকে নিয়ে এসেছি। তোমাকে আরো সিরিয়াসলি লেখাপড়া করতে হবে।' আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তোমাকে ক্লাসে ফার্স্টই হতে হবে এরকম কোন দাবি আমার নেই, কিন্তু পরীক্ষায় শতকরা ৭৫-এর উপর নম্বর থাকতে হবে। ক্লাস টেনে ৪র্থ হয়ে প্রমোশন পেলাম। কিন্তু ফার্স্ট বয় থেকে আমার নম্বর তেমন কম ছিলো না। ফার্স্ট পজিশন পেলাম না, সেজন্য আমার দুঃখবোধ সত্ত্বেও নম্বর ভালো পাওয়ায় নিরাশ হলাম না।

স্কাউট আন্দোলন

ঢাকায় ক্লাস নাইনে থাকাকালেই স্কাউট আন্দোলনে যোগ দিলাম। কলতাবাজার হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব স্কাউট মাস্টার ছিলেন। তারই প্রেরণায় আমি স্কাউট-এ যোগদান করি। স্কাউট-এর মাধ্যমে এমন কিছু শিক্ষা পেলাম বাস্তব জীবনে যা সব সময় কাজে লাগে। তার একটি হচ্ছে মানবদেহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান। যেমন নার্ভাস সিস্টেম, ব্লাড সার্কুলেটরি সিস্টেম, রেসপিরেটরি সিস্টেম, এ সব শেখার জন্যে ইংরেজিতে একটি বই ছিলো যাতে ছবিসহ মানবদেহের বিস্তারিত বর্ণনা ছিলো। এ বিষয়টি আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে শিখেছিলাম যা এখনও আমার কাজে লাগে।

স্কাউট আন্দোলনে কুকিং সিস্টেমও শিখতে হতো। আমি কুকিং কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়ে 'কুকিং ব্যাজ' পেয়েছিলাম। এ শিক্ষাটাও আমার জীবনে কাজে লেগেছে। রংপুর কলেজে শিক্ষকতা নিয়ে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাসায় কাজের ছেলেকে পাক শিখিয়েই আমাকে চলতে হতো। পাক না জানলে বিরাট সমস্যা হতো। এটাও লক্ষ্য করেছি যে, আমার কাছ থেকে শিখে ভালো পাক জানে এ সুবাদে আমার দুটো কাজের ছেলে অন্যত্র চাকরি পেয়ে যায়।

স্কাউট-এ আরো বিভিন্ন বিষয় শিখার সুযোগ পেয়েছিলাম যা বাস্তব জীবনে অত্যন্ত জরুরি। আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখন আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট ট্রুপ লিডারের দায়িত্ব পেলাম। স্কাউটদেরকে রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা, দুর্ঘটনায় উদ্ধার

তৎপরতা (rescue activity) এবং আরো বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিখাবার জন্য আমাকে ট্রুপ পরিচালনা করতে হতো। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে জয়দেবপুরে (গাজীপুর জিলার) বিখ্যাত রাজবাড়ি ময়দানে এক বিরাট স্কাউট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিনের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তিনি সরকারি মুসলিম হাইস্কুলের স্কাউট ট্রুপ লিডার হিসেবে ঐ জাম্বুরীতে যোগদান করেন।

স্কাউট আন্দোলন আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিলো বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউওটিসিতে যোগদান করার খুবই আগ্রহ ছিলো। এতে স্কাউট থেকেও উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু দাড়ি থাকায় সেখানে আমাকে ভর্তি করা হলো না। ইউওটিসি'র কর্মকর্তা জনাব মতিউর রহমান আমার স্কাউট সার্টিফিকেটগুলো দেখে আফসোস করে বললেন, 'টেকনিক্যাল কারণে তোমাকে নিতে না পেরে আমিও অত্যন্ত দুঃখিত।' তিনি আরও বললেন, 'ব্রিটিশ সরকার দাড়ি-পাগড়ীকে ইউনিফর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে শিখদেরকে অনুমতি দেয়। আমাদের এখানে যে ইউনিফর্ম আছে তাতে সে সুযোগ নেই।'

আমার হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সে পরীক্ষায়ও আমি আশানুরূপ ফল থেকে বঞ্চিত হই। প্রিন্সিপালের আশা ছিলো আমাদের ক্লাসের কমপক্ষে ৪ জন ফার্স্ট গ্রেড স্কলারশীপ পাবে। আমার ব্যাপারে প্রিন্সিপালের সে আশা পূরণ হয়নি। এর মূল কারণ হলো অসুস্থতা। ঐ সময় গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দেয়। ম্যালেরিয়ায় বহু লোকের মৃত্যু হয়। এ অঞ্চলকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করতে দশ বছর লেগে যায়।

কুমিল্লায় ক্লাস এইটের ছাত্র থাকাকালে আমি প্রথম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হই এবং কয়েক মাস এই জ্বরে ভুগি। ১৯৪২ সালে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত বার বার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হই। আমার এই জ্বরকে এতো ভয় হতো যে, আমি বলতাম, আমার জ্বরাতঙ্ক রোগ হয়ে গেছে। এ জ্বরে এতো হাই টেম্পারেচার হতো এবং শরীরে এতো বেশি কাঁপুনি হতো যে দু-তিনটা লেপ দিয়ে আমাকে চেপে ধরে রাখতে হতো। যখন জ্বর ছাড়তো তখন এতো ঘাম হতো যে বিছানা ভিজে যেতো। বিছানার চাদর না বদলালে চলতো না। এ জ্বর একটানা ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা পরে কমা শুরু হতো। কিন্তু সম্পূর্ণ ছেড়ে যাওয়ার পরে ১০-১৫ ঘণ্টা পর আবার জ্বর আসতো। জ্বর অবস্থায় মাথায় যন্ত্রণা হতো। দেড়-দুই সপ্তাহ চিকিৎসার পর সুস্থ হলেও শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যেতো। এ রোগের কোনো প্রতিষেধক না থাকায় কয়েক মাস পর আবার জ্বর হতো। চার বছর এভাবে কষ্ট পেয়েছি।

এ রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও বিরক্তিকর ছিলো। হাত এবং নিতম্বের 'মাংসল'-এ ইঞ্জেকশন দেওয়া হতো। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর এতো ব্যথা হতো যে কাপড় দিয়ে লবণের পুরিয়া বানিয়ে হারিকেনে গরম করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেঁক দিতে হতো। অপরদিকে কুইনাইন খেতে হতো, যা এতো তিক্ত ছিলো যে, জিহ্বার তিক্ততা দূর করার জন্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত মিঠা জিনিস খেতে হতো।

পরীক্ষার পূর্বে প্রচণ্ড জ্বর

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে হাই মাদ্‌রাসা ফাইনাল পরীক্ষা দেই। ফাইনাল পরীক্ষার তিন সপ্তাহ আগে তীব্র ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হই। প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। সেকালে এটাই একমাত্র সরকারি হাসপাতাল ছিলো এবং হাসপাতাল সংলগ্ন একমাত্র মেডিকেল স্কুল ছিলো। হাইস্কুল বা হাই মাদ্‌রাসা পাস করলে ঐ স্কুলে ভর্তি হওয়া যেতো। ডিগ্রির নাম ছিলো এলএমএফ। এটা ৪ বছরের কোর্স ছিলো। প্রিন্সিপাল সাহেব হোস্টেলে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে এই মর্মে চিঠি দিলেন যে, এ ছাত্রটি তিন সপ্তাহ পরে বৃত্তি পরীক্ষা দিবে এবং আমার খুব আশা সে বৃত্তি পাবে। তাই আশা করি যত্নসহকারে চিকিৎসা করবেন, যাতে সে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসার ঠেলায় আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। দু'হাতে ও দু'নিতম্বে ইঞ্জেকশন দেওয়া হলো। ইঞ্জেকশনের ব্যথায় নিজ হাতে লবণ সেঁক দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়লো। ভীষণ তিক্ত কুইনাইন খেতে খেতে মন বিষিয়ে উঠতো। মনে হয় ৪ বছরের ম্যালেরিয়াতে কয়েক গ্যালন কুইনাইন গিলেছি। সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব রোজ একবার এসে দেখে যেতেন। ফলে ডাক্তার-নার্সরা আমার বিশেষ যত্ন নিতো। এক সপ্তাহ পর ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি পেলাম বটে কিন্তু শরীর এতো দুর্বল হলো যে একটানা দু'ঘণ্টাও পড়তে পারতাম না।

হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার দু'সপ্তাহ পর ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হলো। তখন এতো দুর্বল ছিলাম যে, কিছুক্ষণ লিখলেই হাতের আঙুল বেঁকে যেতো এবং কলম হাত থেকে পড়ে যেতো। কয়েক মিনিট আঙুল টিপে আবার লিখতে শুরু করতাম। ফলে সব প্রশ্নের জওয়াব জানা থাকা সত্ত্বেও ম্যাথাম্যাটিক্স ছাড়া কোনো বিষয়ে ৮০/৮৫ নম্বরের বেশি লেখাই সম্ভব হয়নি। ম্যাথাম্যাটিক্স-এ আমি ফুল মার্কস পাব বলে নিশ্চিত ছিলাম। পরীক্ষার পর আব্বাকে বললাম, ফার্স্ট ডিভিশন পাবো কিন্তু স্কলারশিপের আশা করি না। এ দুর্বল শরীর নিয়ে পরীক্ষা শেষ করে চান্দিনায় গেলাম। ১৯৩৬ সাল থেকে আব্বা চান্দিনায় কর্মরত থাকার কারণে গ্রামের বাড়িতে খুব কমই যাওয়া হতো। আব্বা-আম্মা সেখানে থাকার কারণে সেখানেই ছুটি কাটাতাম।

তিন মাস পরে পরীক্ষার ফল বের হওয়ার কথা। তখন আবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হই। এতো দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, টয়লেট থেকে আসবার পথে সিঁড়ি দিয়ে ঘরে উঠার সময় ফিট হয়ে পড়ে গেলাম। সাধারণত ১০৫ থেকে ১০৬ ডিগ্রি পর্যন্ত জ্বর উঠতো। একদিন জ্বর ১০৭ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠেছিলো। এতে আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম। হুঁশ হওয়ার পর আগুনের কাছে থার্মোমিটার ধরে ১০৭ ডিগ্রি পর্যন্ত তুলে দেখে বিস্মিত হলাম যে, এতো জ্বর হয়েছিল! যেদিন ফল প্রকাশ হলো দু'দুটো লেপের নিচে শুয়ে মাথার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি। এমন সময় আব্বা তার অফিস থেকে আমার শোবার ঘরে দৌড়ে এসে খুশি হয়ে বললেন, 'এইমাত্র কুমিল্লা থেকে শফিকের (আমার চাচা) টেলিগ্রাম পেলাম।' তিনি টেলিগ্রাম পড়ে শোনালেন। লেখা ছিল– My dear nephw Ghulam Azam has stood 13th. আমিও আবেগতাড়িত হয়ে লেপ ফেলে দিয়ে উঠে বসলাম। এ অপ্রত্যাশিত সুফলের খবর জেনে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। বিস্ময়ের ব্যাপার এরপর কয়েক মাস আর জ্বর আসেনি। আমি বিস্মিত হলাম যে, মানসিক অবস্থার প্রভাব দেহের উপর কিভাবে এতটা বিস্তার লাভ করে।

সেকালে ঢাকা শহরে সকল হাই স্কুল ও গোটা বঙ্গদেশের হাই মাদ্‌রাসার পরীক্ষা ঢাকা বোর্ডের পরিচালনাধীন ছিলো। ঢাকা শহরের বাইরের সকল হাই স্কুলের পরীক্ষা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো।

প্রসঙ্গক্রমে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হাই স্কুলসমূহে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হয়ে গেলেও ঢাকা বোর্ডে তখনো শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজিই ছিলো। আমার হাই মাদ্‌রাসা পাস করার বছর দুই পর ঢাকা বোর্ডেও বাংলা শিক্ষার মাধ্যম হয়।

আমার ইসলামী জীবন গঠন

১৯৪২ সালে হাই মাদ্‌রাসা যখন পাস করি তখন আমার বয়স ১৯ বছর। প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে কুরআন শিক্ষার জন্য ২ বছর, বীরগাঁও প্রাইমারী স্কুলে ৩ বছর, বড়াইল জুনিয়র মাদ্‌রাসায় ৪ বছর, কুমিল্লা হাই মাদ্‌রাসায় ২ বছর ও ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ২ বছর এভাবে মোট ১৩ বছরে নিজে নিজে কুরআন পড়তে সক্ষম হয়েছি। বাংলা, ইংরেজি ও আরবী ভাষা যতটুকু সম্ভব শিখেছি এবং ইসলামের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাসআলা-মাসাইল ও পাঠ্যপুস্তকে কুরআন ও হাদীসের কোর্সের অনুবাদ শেখার সুযোগ পেয়েছি। এ ছাড়া বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশিত বেশ কিছু জাগতিক জ্ঞান ও মূল্যবান উপদেশাবলি অবগত হয়েছি। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে চিন্তামূলক কোনো বই পাঠ্যসূচিতে ছিলো না। তাই ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত ইসলামকে জানা এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলার ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বাইরের অবদানই বেশি।

বাড়িতে দাদার সঙ্গ থেকেই নিয়মিত জামাতে নামায আদায় ও কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে উঠেছে। খাওয়ার ইসলামী আদব-কায়দা– বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু ও শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, বাসন পরিষ্কার করে খাওয়া, আঙ্গুল চেটে খাওয়া, খাবার জিনিস ঝুটা না করা, খাবারের অংশ দস্তরখানে পড়ে গেলে তুলে খাওয়া, খাবার জিনিস নষ্ট না করা ইত্যাদি দাদার কাছ থেকে শেখা যা আজীবন কাজে লেগেছে।

হোস্টেলে ও হলের ডাইনিং টেবিলে কর্মচারীরা আমাকে বলতো, 'স্যার, খাওয়ার পরে আপনার বাসন যে রকম পরিষ্কার থাকে সবাই যদি এভাবে খেতো তাহলে ধোয়ার সময় ভালো লাগতো। আপনি বাসনে হাত না ধোয়ায় টেবিল থেকে বাসন নিতে কষ্ট হয় না। অনেকের বাসন তুলবার সময় ঘৃণাবোধ হয়।'

আমি ডাইনিং টেবিলে ছাত্রদের খাবারের ধরন দেখে হিসাব করতাম কে কি রকম পরিবার থেকে এসেছে। কাউকে দেখতাম ভাতের নলা মুখে দেবার আগেই জিহ্বা অনেকটা বের করে নেয়। হাতের তালুতে পর্যন্ত খাবার লেগে যায়, লম্বা জিহ্বা বের করে আঙ্গুল চুষে, এমনভাবে চিবায় যে চপ্‌চপ্ আওয়াজ হয়, বাসনে খাবারের কিছু অংশ রেখেই বাসনে হাত ধোয়, এ সব দেখলে রীতিমতো বিরক্তিবোধ হতো। এর দ্বারা বুঝা যায়, যদি ছোট সময় পরিবারে এ সব শেখানো না হয় তাহলে বড় হয়েও এগুলো শেখার সুযোগ হয় না।

ওয়ায শুনবার নেশা

কেন জানিনা ওয়ায শুনতে আমার খুব ভালো লাগতো। যার জন্য পাড়ার ছেলেদেরকে সংগঠিত করে দুই-তিন মাইল ছুটে যেয়েও ওয়ায শুনতাম। সেকালে ওয়ায়েযদের মুখে কুরআন-হাদীসের চেয়ে শেখ সাদী ও মাওলানা রুমীর কবিতাই বেশি শোনা যেতো। চমৎকার সুর করে ফার্সী বয়াত আবৃত্তি করার সময় লোকেরা খুব তৃপ্তির সঙ্গে শুনতো। ফার্সীর কথাগুলো না বুঝলেও উচ্চারণ শুনে মনে হতো ভাষাটা বড় মিষ্টি। ফার্সী বয়াত শুনাবার পর এর ব্যাখ্যা স্বরূপ যে আলোচনা করতেন তা অত্যন্ত উপদেশমূলক ও আকর্ষণীয় হতো। এ সব ওয়াযের উপদেশাবলির প্রভাবও আমার জীবনে অনুভব করেছি। তার মধ্যে সুন্দর শিক্ষামূলক গল্প, সত্য বলার উপকারিতা, মিথ্যা বলার মারাত্মক পরিণতি, কারো ক্ষতি করলে নিজের আরো বড় ক্ষতি হওয়া, কাউকে ঠকালে অপরের প্রতারণার শিকার হওয়া, ওয়াদা খেলাপ করলে মানুষের কাছে হেয় হওয়া ইত্যাদি এমন চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করা হতো যে, এ সব গোনাহ করলে দুনিয়াতেই বিপদে পড়তে হয়, সে কথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রায় সকল ওয়ায়েযই আদমের প্রতি ইবলিসের বিরোধিতার বিস্তারিত কাহিনী শুনাতেন। তা থেকে উপদেশ গ্রহণের চেয়ে আমার মনে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হলো যার

সন্তোষজনক জওয়াব কারো কাছ থেকে পাইনি। এ প্রশ্নগুলোতে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করতাম। পরবর্তীকালে মাওলানা মওদূদী (র)-এর তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' পড়ে এর সদুত্তর পেয়ে তৃপ্তি বোধ করেছি। অনেক প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ।

১.
আল্লাহ্ তাআলা আদমকে গোপনে কিছু শিক্ষা দিয়ে কোশ্চেন (Question) আউট করে দিলেন, যার ফলে আদম প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারল, ফেরেশতারা জওয়াব না দিয়ে ফেল হয়ে গেলো। আল্লাহ্ কি এ রকম পক্ষপাতিত্ব করেন?

২.
বেহেশতে আদম ও হাওয়া যদি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিষিদ্ধ ফল না খেতেন তাহলে তারা চিরকালই বেহেশতে থাকতে পারতেন বলে কাহিনী থেকে ধারণা দেওয়া হয়। তাহলে আল্লাহ্ যে ঘোষণা করেছেন, তিনি মানুষকে খলীফা হিসেবে দুনিয়ায় পাঠাচ্ছেন, সে কথা কি অর্থহীন হয়ে যায় না।

৩.
বেহেশতে ভুলের কারণে শাস্তি স্বরূপ যদি আদম (আ) দুনিয়ায় আসতে বাধ্য হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি নবীর মর্যাদা কি করে পেলেন ইত্যাদি।

এ জাতীয় যতোগুলো প্রশ্ন আমাকে বিব্রত করতো তার চমৎকার জওয়াব তাফহীমুল কুরআনে পেয়ে এ বিষয়ে লেখার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলাম। ১৯৯২-৯৩ সালে জেলে প্রচুর সময় হাতে পেয়ে 'আদম সৃষ্টির হাকীকত' নামে একটি বই লিখলাম। কুরআন মাজীদে সাতটি সূরায় আদম ও ইবলিসের ঘটনাটির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হয়েছে। এর সবগুলোকে বিশ্লেষণ করে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, এ ঘটনাটির যে বিস্তারিত রূপ ওয়াযের মাহফিলে শুনেছি তা থেকে সত্যিকার ঘটনা ভিন্ন।

৮.

ইসলামী বই পড়ার আগ্রহ

আগেই বলেছি পাঠ্যপুস্তকে ইসলামকে একটি জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শ হিসেবে জানার জন্য কোন বই ছিলো না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরী থেকে যে সমস্ত বই পেয়েছি তাও এ জাতীয় নয়। কুমিল্লায় আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমার লজিং থেকে হাই মাদ্‌রাসায় যাওয়ার পথে আমারই দুই ক্লাস উপরের আব্দুল কাইয়ুম নামে এক ছাত্রের লজিং ছিলো। রাস্তার পাশেই তার থাকার ও পড়ার ঘরটি ছিলো। বিকেলে লজিং-এ ফেরার পথে আমিসহ দু-তিনজন যারা একসাথে চলতাম তাদেরকে ডেকে নিয়ে তিনি কিছু নাস্তা করায়ে একটা মাসিক পত্রিকা থেকে পড়ে শুনাতেন। কয়েকদিন শুনার পর বেশ ভালো লাগলো। জানতে চাইলাম, তিনি এটা কী পড়ে শুনাচ্ছেন। জানা গেলো 'নেয়ামত' নামে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা। তাতে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (র) উর্দু ওয়াযের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হতো। অনুবাদকের নামও জানা গেলো—মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী। উক্ত পত্রিকায় মাওলানা ফরিদপুরীর অনূদিত থানবী সাহেবের ২/৩ টি বই-এর বিজ্ঞাপন দেখে আঃ কাইয়ুম সাহেব সেগুলো আনালেন। ইনি আমাদেরকে বই নিয়ে যেতে দিতেন না, পড়ে শুনাতেন। কয়েকদিন পর অন্য ছেলেরা আর আসতো না, কিন্তু আমি মজা পেয়ে নিয়মিত তাঁর কাছে এসে শুনতাম।

থানবী সাহেবের ওয়াযের বৈশিষ্ট্য আমাকে খুব মুগ্ধ করলো। যে বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দিতে চান সে বিষয় সম্পর্কিত পয়লা তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপর আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় যুক্তি দিয়ে এবং বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়ে কুরআনের বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন। এভাবে 'নকলি দলিল' কে 'আকলী দলীল' দিয়ে সমন্বিতভাবে পরিবেশন করতেন। যেমন একটি ওয়াযের শিরোনাম ছিলো 'আত্মার শান্তি'। আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমায়িন্নুল কুলূব' অর্থাৎ জেনে রাখ! একমাত্র আল্লাহর যিকিরেই আত্মা শান্তি পায়। এ আয়াতকে কেন্দ্র করে তার গোটা ওয়ায। যত যুক্তি এবং যত ঘটনা এ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তা তিনি পেশ করতেন। বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কোন কথা তিনি বলতেন না। এভাবেই মাসিক নেয়ামতের একেকটি বিষয়ভিত্তিক ওয়াযের অনুবাদ প্রকাশিত হতো।

আমি আব্দুল কাইয়ুম সাহেবের অনুগত শিষ্যে পরিণত হয়ে গেলাম। পরবর্তী মাসিক পত্রিকার অপেক্ষায় থাকতাম। পত্রিকা না আসা পর্যন্ত মাওলানা থানবীর অনূদিত বই পড়ে তিনি শুনাতেন। ইসলামী বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে আঃ কাইয়ুম

সাহেবের অবদান আমি কোনদিন ভুলব না। এভাবে আমি মাওলানা থানবী (র) ও মাওলানা ফরিদপুরীর (র) প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

ঢাকায় ক্লাস নাইনে ভর্তি হওয়ার পর পরই মাসিক নেয়ামত পত্রিকা অফিসে গিয়ে নেয়ামতের নিয়মিত গ্রাহক হই। পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সালাম ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার লোক ছিলেন। সে হিসেবে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাঁরই সহযোগিতায় আমি ক্লাস নাইনের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা শামছুল হক সাহেবের মতো বিরল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করি।

এতদিন বাপ-দাদার অনুসরণ ও অনুকরণ করার তাকিদেই ইসলামকে ধর্ম হিসেবে জানতাম এবং তাদের নির্দেশ মেনে চলতাম। মাওলানা থানবীর (র) বই থেকে প্রথম উপলব্ধি করলাম যে, ইসলাম অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। তখন পর্যন্ত এ ধারণা পাইনি যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তবে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের তৃষ্ণা বেড়ে গেলো। এটাই আমার জীবনে মাওলানা থানবী (র)'র বড় অবদান।

আরো কিছু বই-এর সন্ধান

আমার একমাত্র ফুফুর বিয়ে হয় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও আশুগঞ্জের রেলপথের মধ্যস্থ তালশহর নামক স্টেশনের নিকট। ফুফু নিঃসন্তান ছিলেন বলে আমাদের ছোট চাচা ও আমার দুই ভাইকে ঘন ঘন তালশহর বেড়াতে যেতে হতো। না গেলে ফুফু মনে খুব কষ্ট পেতেন। আমার ফুফা ভৈরবে একজন নামকরা ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তাঁরই ঘরে ইসলাম সম্বন্ধে কয়েকটি চমৎকার বই পাই। একটি বইয়ের কথা আমার ভালোভাবে মনে আছে, বইটির নাম ছিলো 'মানবধর্ম'। লেখক ছিলেন মাওলানা ফজলুল করীম এমএ, বিএল। পরবর্তীকালে ঢাকায় তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি ল' ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় মেশকাত শরীফের অনুবাদক। ফুফার কাছে যে কয়টি বই পেয়েছি পড়ে শেষ না করে ফিরে আসিনি।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ইসলামী জীবন গঠনের তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। লেখাপড়া এবং হল ইউনিয়ন ও ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের ব্যস্ততা যথেষ্ট সময় দাবি করতো। ইসলামকে একটি 'যুক্তিপূর্ণ ধর্ম' হিসেবেই মেনে নিয়ে নামায, রোযা, খতমে তারাবীহ, তিলাওয়াত, সৎভাবে জীবনযাপন ও সচেতনভাবে চরিত্রবান হয়ে চলার চেষ্টা করেছি। এমএ ফাইনাল পরীক্ষার দুমাস পূর্বে ইসলামী জীবন গঠনের নতুন ধারা শুরু হয় যার বিবরণ পরে আসবে। প্রথমে তাবলীগ জামায়াত, পরে একই সাথে তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিস এবং সবশেষে জামায়াতে ইসলামী আমার ইসলামী জীবন গঠনে যে অবদান রেখেছে তা ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

ধর্মীয় ব্যাপারে আব্বার কড়াকড়ি

ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় যে সব কাজ করণীয় সেসব ব্যাপারে আব্বা আপসহীন ছিলেন।

১. মসজিদে জামাতে নামায

চান্দিনায় থাকাকালে মসজিদ বাসা থেকে সামান্য দূরে ছিলো। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে নামায আদায় করতেন এবং আমাদেরকেও তাকীদ দিতেন। কোন ওয়াক্তে মসজিদে না গেলে তিনি রীতিমত রাগ করতেন। ১৯৫৩ সালে আব্বা যখন বদলী হয়ে ঢাকা আসলেন তখনও তিনি রমনা থানার নিকটবর্তী মসজিদে যেয়ে নিয়মিত নামায আদায় করতেন। মগবাজারস্থ বাড়ি থেকে রমনা থানা মসজিদ যতটুকু দূরে চান্দিনার মসজিদও ততটুকু দূরেই ছিলো। আমার বড় ছেলে যখন সিক্সে পড়ে তখন তিনি বাড়িতে জামাতের বন্দোবস্ত করেন। প্রথমত এ কারণে যে, তার হাঁটুতে আর্থারাইটিস থাকার কারণে হাঁটতে কষ্ট হতো। ৫ ওয়াক্ত মসজিদে যাওয়া কষ্টকর ছিলো। দ্বিতীয় কারণ নাতিকেও তিনি জামাতে শরীক হওয়ার অভ্যস্ত করা প্রয়োজন মনে করেন। ঐ সময় তিনি মগবাজারস্থ তার জমিতেই মসজিদ তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সময় তিনি বলেছিলেন, তোমরা রমনা থানা মসজিদে গিয়ে নামায পড়লেও নাতিদেরকে নিয়ে যাওয়া কঠিন হবে, তাই বাড়িতেই একটি মসজিদ প্রয়োজন। বর্তমানে মগবাজারে কাজী অফিস লেইন মসজিদ নামে পরিচিত যে তেতলা মসজিদটি রয়েছে এর প্রথম তলা এককভাবে নিজেই তৈরি করেন। কারো কাছ থেকে কোন আর্থিক সহযোগিতা তিনি চাননি। ১৯৭১ সালের ১ রমযান থেকে এ মসজিদ চালু হয়।

২. দাড়ি রাখা

আমার ছোট চাচা জনাব শফিকুল ইসলাম বয়সে আমার তিন বছর বড় ছিলেন এবং তিন ক্লাস উপরেই পড়তেন। ১৯৩৯ সালে আমি যখন কুমিল্লায় ক্লাস এইটে পড়ি তিনি তখন নবীনগর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আইএসসি-তে ভর্তি হন। কিছুদিন পর ছুটিতে চান্দিনায় গেলেন। তখন আব্বা দেখতে পেলেন চাচার দাড়ি উঠেছে এবং তিনি দাড়ি কামান। আগে থেকেই ছোট চাচার লেখাপড়ার খরচ আব্বাই দিতেন। আব্বা চাচাকে বললেন, 'দেখ দাড়ি রাখা সুন্নাত এবং আল্লাহ তাআলা দাড়ি পুরুষের মুখেই দিয়ে থাকেন। দাড়ি না রাখলে বুঝা যায় যে, মেয়েদের মতো থাকাই পছন্দ। আমি চাই, তুমি দাড়ি রাখবে। যদি না রাখ তাহলে তোমার পড়ার খরচ আমার দেওয়া উচিত হবে বলে মনে করি না।' এরপর গ্রীষ্মের ছুটিতে চাচা যখন চান্দিনায় গেলেন তখন আব্বা চাচার দাড়ি দেখে এতো খুশি হলেন যে, ছোট ভাইকে বুকে নিয়ে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'আল্লাহ ও রাসূলের পথে যদি চলো দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হবে।' আরেক

সময় আমার আম্মা একটা আয়না নিয়ে চাচার মুখের সামনে ধরে বললেন, দেখতো এখন তোমার চেহারাটা কত চমৎকার দেখাচ্ছে।

চাচার এই দাড়ি রাখার ঘটনা আমাদের বংশে এমন প্রভাব ফেলেছে যে, আমরা ৪ ভাই এবং আমার বড় চাচার বড় দুই ছেলে যারা আব্বার প্রভাবাধীন ছিলো তাদের কেউই কখনো দাড়ি কামায়নি। অথচ এরা সকলেই আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত।

১৯৪২ সালে আমি যখন হাই মাদ্‌রাসা পাস করে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই তখন আমার দাড়ি উঠা শুরু হয়। পাটের আঁশের মতো চিকন ছোট ছোট চুল দেখে সহপাঠীরা বললো, তুমি এখনই দাড়ি রেখে দিলে? বললাম, দাড়ি কামালে বাড়ি যাওয়া যাবে না। তারা বললো, 'দাড়ি রাখতে চাইলেও প্রথম কিছুদিন কামাতে হয়, তা না হলে দাড়ির চুল সুন্দর হয় না।' যতটুকু মনে পড়ে আমার এক রুমমেট নিজের দাড়ি কামিয়ে আমার অল্প অল্প দাড়ি কয়েকবার কামিয়ে দিলো। আমি বিবেকের নিকট অপরাধী বোধ করতে লাগলাম। দু'মাস পরে চান্দিনা যেতে হবে একথা খেয়াল করে আর দাড়ি কামাতে দিলাম না। গ্রীষ্মের ছুটি ভোগ করে ঢাকায় যখন হোস্টেলে ফিরে এলাম তখন আমার স্পষ্ট চোখে পড়ার মতো পরিমাণ দাড়ি ছিলো। সহপাঠীদের কয়েকজন এটা মোটেই পছন্দ করলো না। তারা বললো, 'ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পরে তুমি দাড়ি রাখতে পারতে।' কিন্তু আবার সহপাঠীদের বেশকজন খুব উৎসাহ নিয়ে আমাকে বললো, 'তোমার দাড়ি দেখে আমরা দাড়ি রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের ধারণা ছিলো বেশ কিছুদিন দাড়ি না কামালে দাড়ি সুন্দর দেখায় না। তোমার সুন্দর দাড়ি দেখে সে ধারণা দূর হলো।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হলাম তখন ছাত্রদের মধ্যে দাড়ি ছিলো না বললেই চলে। আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজের ছাত্ররাও সকলে দাড়ি রাখতো না। তারা যেহেতু মাদ্‌রাসা পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো সেজন্য তাদের বেশির ভাগ ছাত্রই দাড়ি রাখতো। কিন্তু আরবী বিভাগের প্রধানসহ অধিকাংশ অধ্যাপকেরই দাড়ি ছিলো না। আমি যখন এমএ পড়ি তখন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ অবসর জীবনযাপন করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পর বগুড়া আযীযুল হক কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে বেশ ক'বছর ছিলেন। এরপর যখন ঢাকায় অবসর জীবনযাপন করছিলেন তখন ফজলুল হক মুসলিম হলে Prayer room-এ সপ্তাহে একদিন কুরআন ক্লাস পরিচালনা করতেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ হলের প্রথম প্রভোস্ট ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আমাদের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন তারা শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ছাত্র ছিলেন। সে হিসেবে তিনি আমাদের দাদা শিক্ষক। পরবর্তীকালে আমার দু'ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে তাঁর সাথে নানা-নাতির সম্পর্ক হয়ে গেলো।

দাড়ি প্রসঙ্গেই ড. শহীদুল্লাহ্‌র উল্লেখ করছি। তাঁর কুরআন ক্লাসে যারা নিয়মিত উপস্থিত থাকতো তাদের মধ্যে আমি একজন। আমার আগ্রহ দেখে তিনি আমাকে

খুবই স্নেহ করতেন। কুরআনের দারস দেওয়া ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং হাল্কা রসিকতাও করতেন। দৈহিকভাবে তিনি খাটো ছিলেন। সে তুলনায় তাঁর দাড়ি বেশ লম্বা ছিলো। তিনি তাঁর দাড়ি ধরে জিজ্ঞাসা করলেন 'আমি যদি আমার এ দীর্ঘ দাড়ি কামিয়ে দাঁড়ি-পাল্লায় রাখি তাহলে ওজন কত হবে?' আমরা বললাম 'চুল কি ভারী হয় নাকি?' তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা যারা দাড়ি রাখ না তারা কি ওজনের ভয়ে রাখ না? আল্লাহ তোমাদেরকে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি পুরুষদের মুখেই দাড়ি দিয়ে থাকেন। তাহলে তোমরা কি মেয়ে হলে খুশি হতে?' যাদের দাড়ি ছিলো না তারা এতে লজ্জায় বিব্রতবোধ করেনি, তারা কথাটাকে হাল্কা রসিকতা হিসেবেই গ্রহণ করলো।

তিনি আরো একটি চমৎকার কথা বললেন, 'দেখ যারা দাড়ি রাখে তাদেরকে লোকেরা শ্রদ্ধার সাথে দেখে।' একথাটা আমার জীবনে অনেক সময় উপলব্ধি করেছি। ইউনিভার্সিটি ছাত্র ইউনিয়নে নির্বাচিত ১৭ জনের মধ্যে একজন মহিলা হলের ছাত্রী ছিলো। ইউনিয়নের বৈঠকে যোগদানের জন্য কামরার কাছে পৌঁছে ভিতরে বেশ হাসাহাসির আওয়াজ পেতাম। কিন্তু আমার ঢুকার সাথে সাথেই পরিবেশ বদলে যেতো। যদিও আমি তাদের মতোই ছাত্র ছিলাম তবুও তারা আমার উপস্থিতিকে মর্যাদা দিতো এবং মহিলা হলের ছাত্রীটিও একটু নড়েচড়ে ভালোভাবে মাথায় কাপড় দিয়ে বসতো।

৩. টাখনুর নিচে পায়জামা পরা

আব্বা যে কোন লোককে টাখনুর নিচে কাপড় পরা অবস্থায় দেখলে নসীহত না করে থাকতেন না। এ ব্যাপারে হাদীসে অবশ্যই কড়া কথা রয়েছে যার জন্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকীদ দেওয়া যথার্থই বটে।

আমার সহপাঠীদের মধ্যে এবং আমাদের কলেজের অন্য ছাত্রদের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতা খুব কমই ছিলো। যার ফলে আমিও সবার মতো পায়জামা টাখনুর নিচেই পরতাম। শুধু নামাযের সময় পায়জামা নিচের দিকে গুটিয়ে টাখনুর উপরে তুলে রেখে নামায পড়তাম। নামাযের পরে আবার পূর্ববত খুলে দিতাম। এখনও সর্বত্র এটাই লক্ষ্য করা যায়। যারা প্যান্ট পায়জামা পরা অবস্থায় নামায পরেন তাদের অনেকেরই এটা সাধারণ অভ্যাস। কিন্তু আব্বার সামনে কখনও টাখনুর নিচে পায়জামা পরতে সাহস করিনি। পায়জামা উপরের দিকে গুটিয়ে আব্বার সামনে যেতাম। আব্বা থেকে আড়াল হলেই পায়জামা আবার নামিয়ে নিতাম। এ আচরণ মোটেই ঠিক নয়, এটা অনুভব করতাম। পরবর্তীকালে মাওলানা মওদূদী (র)-এর 'ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি' বইটি পড়ে উপলব্ধি করলাম যে, ঈমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টি হওয়া এবং ইসলামের অনুসরণ করার সঠিক জযবা সৃষ্টির পূর্বে এরকম আচরণ হওয়াই স্বাভাবিক। ঐ বইটিতে মাওলানা চমৎকার করে ব্যাখ্যা করেছেন যে, টাখনুর উপরে কাপড় পরা, বাহ্যিক লেবাস পোশাক

ইত্যাদিতে মুত্তাকী হওয়া তখনই সম্ভব যদি অন্তর থেকে ইসলামের অনুসারী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাঁর মতে, প্রথমে ঈমান মজবুত হতে হবে এবং শরীয়তের বিধানকে মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাহলে তাকওয়ার দাবি পূরণের জন্যে বাইরে থেকে চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একথার সত্যতা প্রমাণিত। ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে আমি যখন সচেতন হলাম তখন টাখনুর নিচে কাপড় পরা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেলো। স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার পর যখন আমাকে লন্ডনে বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবনযাপন করতে হয় তখন গরম প্যান্ট টাখনুর উপরেই পরেছি এবং গরম শার্টও প্যান্টের উপরেই ঝুলিয়ে রেখেছি। আমার পরিচিত কেউ কেউ বলেছে যে, লোকেরা আপনাকে দেখে হাসবে। আপনি প্যান্ট আরো নিচে পরুন এবং শার্টও প্যান্টের নিচে ঢুকিয়ে রাখুন। আমি তাদের কথায় কান দেইনি। প্যান্টের ভিতর জামা ঢুকিয়ে চলা আমার নিকট তাকওয়ার খেলাফ মনে হতো। এ অবস্থায় কোথাও বসলে সতরের শালীনতা রক্ষা হয় বলে আমি মনে করি না। এ বিষয়ে আমার সাথে কারও একমত হওয়া জরুরি নয়। আমি যে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে, যদি দীনের দাবি মনে করে আন্তরিকভাবে কেউ জীবনযাপন করতে চায় তবেই তাকওয়ার দাবি পূরণ করা সম্ভব।

৪. স্যুট-প্যান্ট পরা

আমাদের পরিবারে কেউ স্যুট-প্যান্ট পরায় অভ্যস্থ ছিলো না। আমার চাচা জনাব শফিকুল ইসলাম ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তেন। পাকিস্তান আন্দোলনে ছাত্র নেতাও ছিলেন। কোলকাতার বিখ্যাত বেকার হোস্টেলে থাকতেন। তিনি শার্ট-পায়জামা পরেই চলতেন, কখনও স্যুট-প্যান্ট পরতেন না। আমার ছোট ভাই গোলাম মুয়ায্যাম কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বর্ষে প্রমোশন পাওয়ার পর যখন হসপিটাল ডিউটি শুরু হলো তখন সে আব্বার নিকট প্যান্ট পরার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলো। ধর্মীয় ব্যাপারে আব্বার কড়াকড়ির কারণেই আব্বার অনুমতি ছাড়া প্যান্ট পরার সাহস পেলো না। প্যান্ট পরার পক্ষে সে যুক্তি দেখালো যে, হাসপাতালে রোগী দেখার সময়ে শার্ট খোলা অবস্থায় রোগীদের গায়ে লাগে। তাই সকল ছাত্র ও ডাক্তারই প্যান্ট পরে এবং শার্ট প্যান্টের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখে। পায়জামার ভিতরে শার্ট ঢুকিয়ে রাখলে দেখতে বিশ্রী দেখায়। তাই হাসপাতালের ডিউটির প্রয়োজনে প্যান্ট পরা দরকার। এ চিঠির জওয়াবে আব্বা লিখলেন 'প্যান্ট পরা ছাড়া যদি ডাক্তারী পড়া সম্ভব না হয় তাহলে ডাক্তারী পড়ার প্রয়োজন নেই।' আমার ঐ ভাইটি আল্লাহর রহমতে শার্ট পায়জামা পরেই কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে গোল্ডমেডেল নিয়ে পাস করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অধিকাংশই স্যুট-প্যান্ট পরতো। কিন্তু আমি শার্ট-পায়জামা পরেই ছাত্রজীবন কাটিয়েছি এবং হল ও ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নে জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন করেছি।

১৯৫০ সালে ডিসেম্বর মাসের শুরুতে রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পর প্রচণ্ড শীতে সমস্যায় পড়লাম। কলেজে শার্ট পায়জামা পরে শীত নিবারণ করা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। বাধ্য হয়ে গরম শেরোয়ানী ও প্যান্ট তৈরি করতে হলো। দর্জির নিকট প্যান্ট তৈরি করার জন্যে মাপ দেবার সময় সমস্যায় পড়লাম। দর্জিকে বললাম টাখনুর নিচে যেন প্যান্ট না যায়। দর্জিটি আমার দিকে তাকিয়ে বললো 'এটা কেমন দেখাবে?' আমি বললাম, 'আপনি নামাযী মানুষ। আপনি দাড়িও রেখেছেন। টাখনুর নিচে কাপড় পরা নিষেধ, এটা কি আপনি জানেন না!' দর্জির নাম এখনও মনে আছে। তার নাম ছিলো মতিউর রহমান। বাড়ি ছিলো বিক্রমপুর। তিনি বললেন, 'জানি তো স্যার, কিন্তু এ পর্যন্ত টাখনুর উপরে প্যান্ট তৈরি হতে দেখিনি। আমি অনেক লোকের প্যান্ট তৈরি করেছি, তারা কেউ আমাকে টাখনুর উপরে প্যান্ট বানাতে বলেনি।' ডিসেম্বরের শেষ দিকে ছুটিতে শেরোয়ানী ও প্যান্ট পরেই ঢাকার বাড়িতে আসলাম। ঘরের বারান্দায় আব্বাকে এবং ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্‌যামকে বসা অবস্থায় পেলাম। সালাম দিয়ে আমিও বারান্দায় এক চেয়ারে বসলাম। আমার ভাইটি একবার আমার প্যান্টের দিকে, আরেকবার আব্বার দিকে তাকাতে থাকলো। এ রকম তাকাবার অর্থ আব্বার বুঝতে বাকি থাকলো না। আব্বা আমার ভাইকে বললেন, 'প্যান্ট পরা আমি কখনো হারাম মনে করি না। কিন্তু টাখনুর উপরে প্যান্ট পরা হয় এটা আমি কখনো দেখিনি। যেহেতু প্যান্ট পরতে হলে টাখনুর নিচে পরতেই হয় সে কারণেই তোমাকে প্যান্ট পরার অনুমতি দেইনি। টাখনুর উপরে প্যান্ট পরলে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে স্যুট পরা নাজায়েয না হলেও আমি স্যুট পরা পছন্দ করি না।' এরপর ভাইও শীতকালে পরার জন্য প্যান্ট বানিয়ে নিলো।

ডা. গোলাম মুয়ায্‌যাম যখন লন্ডনে উচ্চ ডিগ্রি নেওয়ার জন্য গেলো তখন গরম শেরোয়ানী ও প্যান্ট পরেই গেলো। স্যুট না পরার কারণে তার সহপাঠী অনেকেই তাকে বলল 'তোমার এই পোশাক দেখে তোমাকে কেউ ডিগ্রি দেবে না।' কিন্তু আমার ভাইয়ের কাছে শুনেছি তার এই স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য তাকে অধিকতর গুরুত্ব দিতো এবং ভালো ছাত্র হিসেবে আনুকূল্যও পেতো।

ডা. গোলাম মুয়ায্‌যাম Pathology'র শিক্ষক হিসেবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত থাকাকালে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল একটু বিরক্তির সুরে বললেন, You should come properly dressed. মুয়ায্‌যাম জিজ্ঞাসা করলো, 'কোন ড্রেসকে আপনি proper dress বলে মনে করেন?' প্রিন্সিপাল সাহেব একটু ঝাঝাল সুরে জওয়াব দিলেন, 'আপনি দেখেন না সকল ডাক্তার কি পোশাক পরে আসে?' মোয়ায্‌যাম দৃঢ়তার সাথে বলল, 'বিলাতে আমি ঝাড়ুদারদেরকেও এ পোশাক পরতে দেখেছি। এটা তাদের জাতীয় পোশাক এটা ডাক্তারদের ইউনিফর্ম নয়।' এরপর প্রিন্সিপাল সাহেব আর কথা বাড়াতে সাহস পাননি।

ধর্মীয় ব্যাপারে আব্বার এই কড়াকড়ি কারো কারো কাছে পছন্দনীয় নাও হতে পারে, কিন্তু আমি এ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি। আমরা সবাই সন্তানদের শুধু দুনিয়ার উন্নতির জন্য সব কিছু করে থাকি। এ উদ্দেশ্যে ত্যাগ কুরবানী করতেও দ্বিধা করি না। তাদের পার্থিব যোগ্যতা অর্জনের জন্যে এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে সবকিছু করার পরও তারা যেন সব সময় সুখে থাকে সে ধান্দা আমাদের লেগেই থাকে।

আখিরাতের জীবনে তাদের সাফল্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টা কয়জন পিতা-মাতা সিরিয়াসলি বিবেচনা করেন? অনেক দীনদার, পরহেযগার ও নামাযী লোক দেখা যায় যারা তাদের ছেলেদেরকে নামাযের জন্য চাপ দেওয়া দূরের কথা তাকীদও দেন না। তাদের মেয়েরা বেপর্দা চলে সেদিকে খেয়ালও করে না। তারা এতেই খুশি যে, ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভালো করছে এবং দুনিয়ার দিক দিয়ে উন্নতি করছে। তারা এ কথা ভুলে যান যে, আখিরাতে তাদের সন্তানদের পথভ্রষ্টতার জন্য তাদেরকে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে। রাসূল (স) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেরই কারো না কারো উপরে দেখাশুনার দায়িত্ব রয়েছে। যাদেরকে গড়ে তোলার দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে।' রাসূল (স) আরো বলেছেন, 'সাত বৎসর বয়স থেকেই সন্তানদেরকে নামাযে অভ্যস্ত করো। দশ বৎসর হয়ে গেলেও যদি নামাযে অভ্যস্ত না হয় তাহলে তাদের উপরে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করো।'

আমার আব্বা যদি এ সব বিষয়ে কড়াকড়ি না করতেন তাহলে তাঁর সন্তানদের মধ্যে দীনের প্রতি যেটুকু কর্তব্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক শিক্ষার পরিবেশে তা কিছুতেই সম্ভব হতো না। আমাদের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠার কোন ব্যবস্থাই নেই। এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে যারা মুসলিম চেতনা নিয়ে জীবন যাপনের চেষ্টা করছে তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের পিতা-মাতার প্রভাবেই তারা শিক্ষালয়ের অধার্মিক পরিবেশ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

৯.

ঢাকায় ইসলামী জ্ঞান চর্চা

১৯৪০ সালে ঢাকায় ক্লাস নাইনে ভর্তি হওয়ার পর কুমিল্লায় থাকাকালে পরিচিত মাসিক নেয়ামত পত্রিকার সন্ধানে বড় কাটারা মাদ্‌রাসায় নেয়ামত পত্রিকা অফিসে যাই। পত্রিকার সম্পাদক জনাব আব্দুস সালাম সাহেবের সাথে পরিচয় করতে গিয়ে জানতে পারলাম, তার বাড়িও বি. বাড়ীয়া। তার বয়স ৪০-এর মতো মনে হলো।

আমার মতো একজন কিশোরকে তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং আমি নেয়ামতের নিয়মিত গ্রাহক হয়ে গেলাম। আগেই বলেছি নেয়ামত পত্রিকাটিতে প্রধানত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-এর উর্দু ওয়াযের বাংলা অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো। কুরআন ও হাদিসের কথাকে চমৎকার যুক্তি ও আকর্ষণীয় উদাহরণ দিয়ে তিনি ওয়ায করতেন। অনুবাদক হিসেবে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর নাম উল্লেখ থাকতো।

নেয়ামত পত্রিকার সম্পাদক থেকে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর পরিচয় জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, তিনি বড় কাটারা মাদ্‌রাসার মুহতামিম। তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানালাম। আমাকে পরামর্শ দিলেন, চকবাজার শাহী মসজিদের হুজরায় তিনি আসরের নামাযের পরে বসেন এবং সাক্ষাৎ প্রার্থীদেরকে দেখা করার সুযোগ দেন। সে কথা জেনে একদিন আসরের নামায পড়ার পর মাওলানার সঙ্গে আমার পয়লা সাক্ষাত হয়। আমি লক্ষ্য করলাম যে, সাক্ষাৎপ্রার্থী কিছু লোক তাঁর নিকট বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাদেরকে অল্প কথায় হাসি মুখে জওয়াব দিতে থাকলেন। কেউ কেউ তাদের সমস্যা তাঁর কাছে জানিয়ে সমাধানের জন্য পরামর্শ চাইলেন। কথাবার্তা থেকে আমি অনুভব করলাম তারা সবাই মাওলানা সাহেবকে পীরের মতো মহব্বত করেন। আমি এ অবস্থায় পয়লা চুপচাপ থাকলাম। আর সবাই যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা বিভিন্ন বয়সের লোক। দাড়ি-টুপি ও পায়জামা দেখে তাদেরকে আলেমদের মতোই মনে হয়। একমাত্র বালক বয়সী আমিই ছিলাম এবং আমার পরনে পাজামা ও শার্ট ছিলো।

আমি এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম এবং কিভাবে তাঁর সাথে পরিচিত হওয়া যায় ভাবছিলাম। এমন কোন পরিচিত লোক ছিলো না যার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করা সহজ হয়। আমি লক্ষ্য করলাম, বিভিন্ন লোকের প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। সবার প্রশ্নের জওয়াব শেষ হয়ে গেলে তিনি হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে হাত মিলালাম। তিনি স্নেহের সুরে জানতে চাইলেন, আমি কে এবং কী চাই। কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি একটানা বেশ কিছুক্ষণ কথা বললাম। সবাই আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাচ্ছিলেন এবং পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখছিলেন, হুযুর কিভাবে আমার মতো বালকের কথা শুনছেন। আমার বক্তব্যের সারকথা ছিল, 'আমি কুমিল্লায় এক বছর আগে থেকে 'নেয়ামত' পত্রিকা পড়ছিলাম এবং ঢাকায় এসে এর গ্রাহক হয়েছি। এ পত্রিকা আমার কাছে খুব ভালো লাগে এবং এ পত্রিকায় লেখা প্রধানত মাওলানা থানভীর (র) অনুবাদই প্রকাশিত হতো।

বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারলাম মাওলানা থানভীর (র) বেশ কয়েকটি বই আপনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। থানভীর (র) লেখা ও আপনার অনুবাদে আকৃষ্ট হয়ে

'নেয়ামত' পত্রিকার সম্পাদক থেকে আপনার ঠিকানা যোগাড় করে আপনার খেদমতে হাযির হলাম। আপনার অনুবাদ করা বই কোথায় পাওয়া যায় সেখান থেকে কিনে নিয়ে পড়তে চাই এবং মাঝে মধ্যে আপনার খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি চাই।' আমার কথা শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং হাসিমুখে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে যে কোন দিন চকবাজার মসজিদেই আসরের সময় হাযির হবার অনুমতি দিলেন। মসজিদের নিচে এমদাদিয়া লাইব্রেরীতে বই পাওয়া যায় বলে জানালেন।

মাওলানার সাথে আমার সম্পর্ক নিয়মিত জারি থাকল

মাওলানা সাহেব বড় কাটারা মাদ্‌রাসার শিক্ষক ছিলেন, এটাই জানতাম এবং মাঝে মাঝে চকবাজার মসজিদে এসে বসতাম। কোন সময় তাঁকে একা পাইনি। ১০-১৫-২০ জন তাঁর সামনে বসা পেতাম। তাঁরা মাওলানা সাহেবকে যে সব কথা জিজ্ঞাসা করতেন তা থেকে মাসআলা-মাসায়েল ছাড়াও নসীহতমূলক কথাবার্তা শুনে দীন সম্পর্কে বেশ কিছু শিখে নিতাম। আমি তেমন কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না। প্রশ্নোত্তর শেষ হলে অল্প কথায় তিনি আমার খোঁজ-খবর নিতেন। আমি কী বই পড়ছি, কোন বই পড়া জরুরি সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।

আমার সঠিক মনে নেই, সেটা কোন বছর ছিলো। আমি চকবাজারে তাঁকে না পেয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তিনি এখন এখানে বসেন না। বেগম বাজার মসজিদে গেলে পাওয়া যায়। আরো জানলাম, তিনি এখন বড় কাটারা মাদ্‌রাসায় নেই, তিনি লালবাগ শাহী মসজিদে নতুন মাদ্‌রাসা শুরু করেছেন।

বড় কাটারা মাদ্‌রাসারই একটি কামরায় 'নেয়ামত' অফিস থাকার কারণে 'নেয়ামত' অফিসে আমার যাতায়াত থাকায় পীরজী হুযুর নামে পরিচিত মাদ্‌রাসার মুহতামিম সাহেবের সাথে দেখা করার সুযোগ হয়। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, তাঁর বড় ভাই আমার আব্বার খালু। সে সুবাদে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) বড় কাটারা মাদ্‌রাসা থেকে চলে গেছেন, এ বিষয়ে সঠিক খবর জানার জন্য পীরজী হুযুরের নিকট হাযির হলাম। আমি বেগম বাজার মসজিদে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (র) সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলাম। বড় কাটারা মাদ্‌রাসা কেন ছেড়ে দিলেন জানতে চাইলাম। তিনি পীরজী হুযুরের বিষয়ে কিছুই বললেন না। শুধু এটুকুই জানালেন, তিনি লালবাগে আলাদা মাদ্‌রাসা শুরু করেছেন। কিন্তু পীরজী হুযুর মাওলানা ফরিদপুরী সম্পর্কে কিছু অভিযোগ করলেন।

ছাত্র জীবনের পর

বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মাওলানা সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক কমে যায়। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে এমএ পরীক্ষার পর পরই তাবলীগ জামায়াতের সাথে তিন চিল্লায় (চার মাস) বেরিয়ে যাই। ঐ সময় তাবলীগ

জামায়াতের মাসিক ইজতিমা লালবাগ শাহী মসজিদে হতো। ১৯৫০ সালে আমি রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করার ফলে যোগাযোগ আবার কম হয়ে যায়। বছরে অন্তত কয়েকবার তাবলীগের মাসিক ইজতেমায় শরীক হওয়ার সুযোগে তাঁর সাথে দেখা হতো।

সম্ভবত '৫২ সাল থেকে শাহী মসজিদে অনুষ্ঠিত মাসিক ইজতিমায় আমাকে বক্তৃতা করতে হতো। মাওলানা সাহেব আমার বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন বলে পরবর্তীকালে আমি জানতে পেরেছি। ১৯৫৪ সালে আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি উল্লসিত হয়ে আমার সাথে কোলাকুলি করলেন। উপস্থিত সকলের মধ্যেই একটু বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করা গেলো। তিনি মন্তব্য করলেন যে, 'তাবলীগের ইজতিমায় তাঁর বক্তৃতার ভাষা থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, তাবলীগী জামায়াতের কর্মসূচি একে আটকিয়ে রাখতে পারবে না।' তিনি উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি মিয়ারা, আমি এ মন্তব্য করেছিলাম না?' বেশ কয়েকজন এর জওয়াবে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, আপনি কয়েকবারই একথা বলেছিলেন।'

জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা ফরিদপুরী

১৯৫৫ সালে অধ্যাপক মাওলানা হেলাল উদ্দীন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পর আমাকে নিয়ে তিনি মাওলানা সাহেবের নিকট গেলেন। অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন সাহেব মাওলানা সাহেবকে বললেন, 'মাওলানা সাহেব, আপনার সঙ্গে আমার পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকে দীর্ঘ আন্তরিক সম্পর্ক। রাজনৈতিক চিন্তার দিক দিয়ে আপনার সাথে আমার সম্পূর্ণ মিল পেয়েছি। আর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে তাঁর স্কুল জীবন থেকেই চেনেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করায় আপনি খুশি হয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। তাই আমার জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের খবর আপনার নিকট দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছি।'

মাওলানা সাহেব অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন সাহেবকে মুবারকবাদ জানিয়ে বললেন, আমি জামায়াতে ইসলামীকে অনেক আগে থেকেই জানি। ব্রিটিশ আমলেই জামায়াতে ইসলামী যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমি মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজনবোধ করি। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মাসিক তরজমানুল কোরআন' গোটা হিন্দুস্তানের বড় বড় আলিমদের কাছে যেতো।

'৪১ সালে জামায়াত কায়েম হবার পূর্বে ঐ পত্রিকার বেশ কিছু সংখ্যা দেখার সুযোগ আমারও হয়েছিলো। পত্রিকার মাধ্যমেই তাঁকে আমি জানতাম এবং তা দ্বারা ইসলামের বিরাট খেদমত হবে বলে ধারণা পোষণ করতাম। তাই তিনি জামায়াতে ইসলামী নামে পৃথক সংগঠন শুরু করায় আমি একটু বিব্রতবোধ করলাম। কারণ মুসলমানদের মধ্যে আগে বেশ ক'টি বিভিন্ন নামে জামায়াত কায়েম ছিলো। তিনি

আবার আর একটি জামায়াত গঠন করে বিচ্ছিন্নভাবে মুসলিম জাতির কি খেদমত করতে পারবেন, এ প্রশ্ন আমার মনে জাগে। তখন মাওলানা মওদূদী পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটে দারুল ইসলাম নামে একটি কেন্দ্র কায়েম করে কাজ করছিলেন। আমি দীর্ঘ সফর করে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আমার সাথে দীর্ঘ সময় মতবিনিময় করলেন। সর্বশেষে তাঁর এ কথাটি আমার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে হয় ঃ

'যে সব জামায়াত দেশে আছে তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং ইসলাম সম্বন্ধে ঐসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যে সব ধারণা রাখেন তাঁরা সে অনুযায়ী কাজ করছেন। ইসলাম সম্বন্ধে যে ধারণা আপনার নিকট প্রকাশ করলাম এবং এই ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে আমি যে চিন্তা-ভাবনা রাখি এই কর্মসূচি অন্য কোন দলের উপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ আমাকে যতটুকু সমঝ (বুঝ) দিয়েছেন সে অনুযায়ী পৃথক জামায়াত কায়েম করা ছাড়া আমার উপায় কি? মুসলমানদের মধ্যে বেশি দল থাকা কোন দূষণীয় ব্যাপার নয়। ইসলাম ও মুসলিম জাতির স্বার্থে যদি যার যার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ করতে থাকে তাহলে উম্মতের কল্যাণই হতে পারে। যদি একদল অপর দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার না চালায় এবং মুসলিম জাতির মধ্যে একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি না ছড়ায় তাহলে বিভিন্ন দল থাকা সত্ত্বেও উম্মতের কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই।' মাওলানা সাহেব বললেন, 'আমি তাঁর এ কথায় মুৎমাঈন হয়ে ফিরে আসি।'

অধ্যাপক মাওলানা হেলাল উদ্দীন সাহেব তখন বললেন, 'আমরা তো মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাইনি। আপনি তাঁর সম্পর্কে ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামায়াত সম্পর্কে অন্য কারো কাছ থেকে না জেনে পাঠানকোট পৌঁছে মাওলানা মওদূদীর কাছ থেকে জানার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এদিক দিয়ে আপনি আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী। আপনি কি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার চিন্তা করেন না? মাওলানা সাহেব বললেন, 'আমি মাওলানা মওদূদীকে মহব্বত করি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলনের কামিয়াবীর জন্য দোয়া করি।'

এ সত্ত্বেও আমি সরাসরি জামায়াতে ইসলামীতে না যোগদান করাকেই মুসলেহাত মনে করি। কারণ, যে ওলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সে মহলে মাওলানার ব্যাপারে যে ইখতিলাফ রয়েছে তা যাতে দূর করা যায়, অন্তত কমানো যায় সে জন্য আমার কিছু করণীয় আছে। আমি মাওলানা মওদূদীর বই পড়ি এবং তাঁর বিরুদ্ধে যে সব কথা আছে সেগুলোও পড়ি এবং এ সব বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের সাথে মতবিনিময়ও করি। আমি যদি জামায়াতে ইসলামীতে সরাসরি যোগদান করি তাহলে ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে মত বিনিময়ের এ সুযোগ থাকবে না। তখন তাদের সাথে আমার ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এবং তা দ্বারা দীনের কোনো কল্যাণ হবে না বলে আমি মনে করি। তাই আমাকে এভাবেই থাকতে দিন। আমরা দু'জনেই তাঁর এ কথায় মুৎমাঈন হলাম এবং তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে বিদায় নিলাম।

আমার জীবনে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (র) প্রভাব

মাওলানা ফরিদপুরীর (র) সাথে আমার দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমার দীনী জিন্দেগী গড়ায় বিরাট অবদান রেখেছে। তাই তাঁকে আমি আমার দীনী মুরুব্বী হিসেবে এখনো শ্রদ্ধা করি। তাঁর যে গুণটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে তা হলো তাঁর বিশাল উদার মন। সাধারণত দেখা যায় যে, যারা দীনের যে খেদমতে নিয়োজিত আছেন সেটাকেই দীনের প্রধান খেদমত মনে করেন এবং দীনের অন্যান্য খেদমতকে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। এমনকি কিছু লোক ভিন্ন ধরনের দীনের খেদমতকে তুচ্ছ মনে করেন। কিন্তু মাওলানা ফরিদপুরীকে (র) এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম পেয়েছি। যারা যেখানে যতটুকু দীনের কাজ করছে তার প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা আমি সব সময় অনুভব করেছি। তাবলীগ জামায়াতে থাকাকালেও তিনি আমাকে উৎসাহ-পরামর্শ দিতেন। জামায়াতে ইসলামীতে আসার পর আমি আরো বেশি উৎসাহ-পরামর্শ পেয়েছি।

১৯৫৯ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে জামায়াতে ইসলামী ও নেযামে ইসলাম পার্টিসহ সব দল বে-আইনী থাকায় জামায়াতের পক্ষ থেকে সারা দেশে ৫ থেকে ১০ দিন সেমিনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকল ইসলামী মহলকে এক প্লাটফর্মে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এর প্রথম সেমিনার ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুলে ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

মাওলানা ফরিদপুরী (র) এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যে বক্তব্য রাখেন তা ব্যাপক প্রেরণার সৃষ্টি করে। জামায়াতে ইসলামীর লোকদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সারা দেশে সেমিনার অনুষ্ঠানের এ অভিযান পরিচালনায় আমি তাঁর কাছ থেকে সব সময় উৎসাহ পেয়েছি। তিনি বলতে গেলে চির রুগ্নই ছিলেন। এ সত্ত্বেও ঢাকার বাইরেও কয়েকটি সেমিনারে স্বয়ং যোগদান করে আমাদের হিম্মৎ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সকল ধরনের ইসলামী খেদমতের আন্তরিক স্বীকৃতি দেবার যে উদারতা তাঁর কাছ থেকে আমি শেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি এরই ফলে আমার সাত বছর নির্বাসন জীবনের পর ১৯৭৮ সালে দেশে এসেই 'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' বইটি লিখি। এ বই-এ প্রকাশিত চিন্তাধারা তাঁরই সরাসরি অবদান। তাঁর নিকট থেকে আর একটি বড় শিক্ষা আমি এই পেয়েছি যে, সকল আলেমকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। মতপার্থক্য সবার মধ্যে থাকে কিন্তু ইলমের অধিকারী হওয়ার যে গুণ তার ফলে সকল আলেমের কাছ থেকেই ফায়দা সংগ্রহ করা সম্ভব। এ কারণেই আমি সকল আলেমকেই শ্রদ্ধা করি, তাঁদের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করি, এমন কি যারা মাওলানা মওদূদীকে (র) মন্দ বলেন বা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন তাদের সাথেও আমি ইহতিরামের সঙ্গে মিলিত হই।

নেতৃস্থানীয় সকল ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মাওলানা ফরিদপুরীর (র) মতো মনের উদারতা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে এ দেশের সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে

আর কোনো বাধা থাকবে না। দুর্ভাগ্যবশত আজ দেশে ইসলামের বিরাট শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইসলাম বিরোধী শক্তি জনগণের উপরে তাদের মনগড়া শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই মাওলানা ফরিদপুরীর (র) অভাব আমি তীব্রভাবে অনুভব করছি।

ইসলামী সেমিনার আন্দোলন

আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসনামলে সকল রাজনৈতিক দল বেআইনী ছিলো। তাই জামায়াতে ইসলামীর নামে প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ ছিলো না। ঐ পরিস্থিতিতে ইসলামী সেমিনার নামে জিলা ও মহকুমা শহরে পরিকল্পিতভাবে ইসলামী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঐ সময়ে জামায়াতের উদ্যোগে বিভিন্ন ইসলামী মহলের সহযোগিতায় সারা দেশেই বেশ কয়টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঐসব সেমিনারের প্রথম সেমিনারটি ১০ দিন অনুষ্ঠিত হবার পর কোথাও ৫ দিন কোথাও ৩ দিনের জন্য আয়োজন করা হতো।

এ সব সেমিনারে স্থানীয় গণ্যমান্য ওলামা-মাশায়েখ এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বকে সেমিনারের বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হতো। প্রতিদিন ৩টি করে অধিবেশন হতো। সকাল ৯টা থেকে ১২টা, বিকেল ৩টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত এবং মাগরিবের পরে ৩য় অধিবেশন হতো। এভাবে একেকটি সেমিনারে জামায়াতে ইসলামীর বাইরের অনেককেই সভাপতিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হতো। এ সব সেমিনারে ইসলামের বিভিন্ন দিকে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পেশ করা হতো। জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই এ সব বক্তৃতা করতেন। এর ফলে জামায়াতের নেতৃবৃন্দ অধিবেশনসমূহে সভাপতিগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেতেন। ফলে তাদের মধ্যে যারা জামায়াত সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখতেন না তারাও আকৃষ্ট হন।

মাওলানা ফরিদপুরীর সাথে গাইবান্ধা সফর

১৯৬১ সালে গাইবান্ধায় ৩ দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ঢাকা থেকে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ও আমি ট্রেনের একটি সেকেন্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করে গাইবান্ধা যাই। মাওলানা ফরিদপুরীর খাদেম হিসেবে একজন তরুণ আলেম সাথে ছিলেন। তিনি একটি বই পড়ছিলেন। এক সময় তার হাত থেকে বইটি নিয়ে আমি পড়া শুরু করলাম। বইটির নাম ছিলো 'দীন ও দুনিয়া'। উর্দু ভাষায় বইটি ৩০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ ছিলো। বইটি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) সাহেবের বিভিন্ন বক্তব্যের একটি সংকলন। বিরাট সূচিপত্রের একটি বিষয় আমাকে আকৃষ্ট করে। বিষয়টির হেডিং ছিলো 'মুরীদ হওয়া কি জরুরি?' এমনিতেই আমি মাওলানা থানবীর ভক্ত ছিলাম। তিনি একজন বড় পীরও ছিলেন। তাই ঐ হেডিংটি আমাকে খুব আকৃষ্ট করলো। ঐ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের একটি অংশ মাওলানা ফরিদপুরীকে শুনাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। বইটি নিয়ে মাওলানার

পাশে বসে তাকে শুনাবার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি অনুমতি দিলেন। যে অংশটুকু পড়ে শুনালাম তা নিম্নরূপ−

'প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য যে জীবনে সে যা কিছু করুক তা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করতে হবে। তাই সে যে কাজটিই করার সিদ্ধান্ত করুক ঐ বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ জানতে হবে। যদি তা জানা না থাকে তাহলে কাজটি শুরু করার পূর্বেই কোনো ভালো আলেমের কাছ থেকে তা জেনে নিতে হবে। এ মনোভাব সঠিক নয় যে সব সময় শুধু একজন আলেমের কাছেই যাবে। কোনো বড় আলেমের সন্ধান পেলে তার কাছেও যেতে হবে। যদি কোনো আলেমকে বেশি পছন্দ হয় এবং তার নিকট মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে তিনি রাজি হলে মুরীদ হওয়াতেও দোষ নেই। জরুরি হলো, দীন সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা ও তা মেনে চলা।'

এটুকু শুনে মাওলানা ফরিদপুরী মন্তব্য করলেন, 'মাওলানা থানভী (র) জীবনের শেষ দিকে মুরীদ করা পছন্দই করতেন না। খুব অল্প লোককেই মুরীদ হবার সুযোগ দিতেন। তিনি বলতেন যে, লোকেরা মুরীদ হওয়ার পরে কিছুদিন যিকির আযকার করার ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে বলে ধারণা করে বসে এবং দীনের এলেম হাসিল করার চেয়ে নফল যিকির করাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়।'

একবার ঢাকা মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে ৭ দিনব্যাপী একটি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এ শিক্ষা শিবিরের গোটা কর্মসূচি নিয়ে মাওলানা সাহেবের নিকট লালবাগ মাদ্রাসায় হাজির হই। এ কর্মসূচির মধ্যে যে সব বিষয়ে বক্তৃতা ও পাঠচক্রের উল্লেখ ছিলো সে বিষয়গুলোও মনোযোগ দিয়ে তিনি দেখলেন। ঐ কর্মসূচিতে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ারও প্রোগ্রাম দেওয়া ছিলো। কর্মসূচি দেখার পর তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এভাবে যে কর্মীকে গড়ে তোলা হয় তাকে কোনো পীরের কাছে মুরীদ হওয়ার প্রয়োজন আছে কি? জওয়াবে বললেন, 'মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্য কী? দীনী জিন্দিগী গড়াই তো আসল উদ্দেশ্য। মুরীদ হওয়াটাই উদ্দেশ্য নয়।'

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র)-এর সান্নিধ্য

আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসনামলে জেনারেল আযম খান এখানে গভর্নর ছিলেন। গভর্নর হিসেবে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। সচিবালয়ের কর্মচারীগণ এক বিরাট সিরাতুন্নবীর (স) আয়োজন করে এবং তা উদ্বোধন করার জন্য গর্ভনর সাহেবকে দাওয়াত দেয়। সভাপতিত্ব করার জন্য মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর নিকট ধরনা দেয়। তিনি তাদেরকে বললেন, 'আমি তো স্বাস্থ্যগত কারণেই অল্প সময় কথা বলতে পারবো। আপনারা যদি আমার মনোনীত একজন ভালো বক্তাকে প্রধান হিসেবে দাওয়াত দেন তাহলে আমি সভাপতির দাওয়াত কবুল করতে পারি।' তারা মাওলানা সাহেবের এ শর্ত মেনে নিলে আমাকে প্রধান বক্তা হিসেবে দাওয়াত দেওয়া হয়।

গভর্নর সাহেব উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করার পর আরো জন দুই বক্তা বক্তব্য রাখলেন। এরপর এক ঘণ্টা আমি বক্তৃতা করলাম। বক্তৃতাকালে আমি লক্ষ্য করলাম, শ্রোতাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে মাওলানা সাহেব খুশি হচ্ছেন। বক্তৃতার শেষে তাঁর পাশে যখন গিয়ে বসলাম তখন তিনি মন্তব্য করলেন যে, আপনার কথাগুলো শ্রোতারা খুব পছন্দ করেছে দেখে আমার কাছে ভালো লাগলো। আমি বললাম, হুযুর তারা আমার মতোই ইংরেজি শিক্ষিত, তাই তাদের মনের অবস্থা আমার ভালোভাবে জানা। ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাবে এক সময় আমার মনে যে সব প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মনেও সেসব প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। আমি সে সব প্রশ্নের জওয়াব দিতে চেষ্টা করেছি। এ কারণে তারা আমার বক্তব্য পছন্দ করেছে।

মাওলানা ফরিদপুরী সাহেব আমাকে বক্তা হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতেন। গোপালগঞ্জ শহরে ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষে সম্ভবত তাঁরই সাথে দু'বার গিয়েছি এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত গওহারডাঙ্গা মাদ্‌রাসার মাহফিলে একবার গিয়েছি। তিনি আমাকে যতো জায়গায় নিয়ে গেছেন সেখানে তিনি আমাকে বক্তব্য রাখার যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। এভাবে ক্লাস নাইন থেকে শুরু করে তাঁর মূল্যবান সোহবত পাওয়ার বিরাট সুযোগ হয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহ তাআলা যে সব গুণাবলিতে ভূষিত করেছিলেন তা আমাকে প্রভাবিত করেছে। তাবলীগী জামায়াতের চিল্লা উপলক্ষে চার বছর এদেশের সকল জেলা শহরে এবং অধিকাংশ মহকুমা শহরে ব্যাপক সফর করেছি। একবার তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট।' আমি বললাম, 'যথেষ্ট সফর করেছি।' তিনি বললেন, 'আপনার মতো যুবক বয়সে স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে, খাওয়া ঘুম বিশ্রামের কোনো নিয়মনীতি পালন না করে আমি চির রোগীতে পরিণত হয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে যতোটুকু যোগ্যতা দিয়েছিলেন স্বাস্থ্যের কারণে তা আমি কাজে লাগাতে পারছি না। আল্লাহর দেওয়া স্বাস্থ্যের মতো নেয়ামতকে অবহেলা করার কী কৈফিয়ত দিব তা ভাবছি। আমার এ তিক্ত অভিজ্ঞতা আপনি মনে রাখবেন। সঙ্গে সব সময় শুকনা ফল বা বিস্কুট ইত্যাদি খাবার কিছু না কিছু রাখবেন। সফরে যথা সময়ে খাওয়া সম্ভব হয় না। যখনই ক্ষুধা অনুভব করবেন তখন অবশ্যই কিছু খাবেন। আর যখনই ক্লান্তি অনুভব করবেন বিশ্রাম করবেন। গোসল, খাওয়া, ঘুম ইত্যাদি যতোটা সম্ভব নিয়মিত করবেন। মনে রাখবেন, সমাজ আপনার খবরও নিবে না। স্বাস্থ্য আল্লাহর দান। এর যত্ন নেয়ার দায়িত্ব আপনার নিজের। এ ব্যাপারে আপনি অবহেলা করবেন না।' তিনি আমাকে এ নসীহত করলেন ৫০ সালে।

১৯৫৭ সালে আইয়ুব খান যখন মার্শাল ল' জারি করলো তখন হঠাৎ করে কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে গেলো। এক বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্‌যম-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসার সুযোগ কমই হতো। সে মেডিকেল কলেজে ডিউটি করতে চলে যেতো। তার খাওয়ার Time ও আমার খাওয়ার Time-

এর মিল ছিলো না। কিন্তু সামরিক শাসনামলে যখন বেকার অবস্থায় বেশ কিছুদিন বাড়িতে থাকতে হলো তখন ডাক্তার হিসেবে দেখার সুযোগ পেয়ে আমার ভাই বলল, 'আপনার তো বেশ কয়েক রকম রোগ হয়ে গেছে বলে মনে হয়।' সে আমাকে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে তার সহপাঠী ডা. নুরুল ইসলাম (জাতীয় অধ্যাপক)-এর কাছে নিয়ে গেলো। তিনি বললেন, 'আপনাকে যতটুকু জানি তাতে আউট ডোর প্যাশেন্ট হিসেবে চিকিৎসা করা যাবে না। আপনাকে এরেস্ট করতে বাধ্য হলাম। তিনি তার আন্ডারে একটি Paying bed যোগাড় করলেন। হাসপাতালে আছি এ খবর পেয়ে মাওলানা ফরিদপুরী (র) ও তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও তাঁরই মতো চির রুগ্ন মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী (র) এক সাথে হাসপাতালে আমাকে দেখতে আসলেন। মাওলানা ফরিদপুরী আমাকে বললেন, 'স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়ার জন্য বেশ ক'বছর আগে আপনাকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমার মনে হয় আপনি গুরুত্ব দেননি। এরই ফলে আপনাকে হাসপাতালে রোগী হিসেবে আসতে হলো।' আমি বললাম, 'হুযুর, এটাই আমার অভিজ্ঞতা হলো যে, না ঠেকলে কেউ মুরুব্বীদের উপদেশ মেনে চলে না। আমি ঠেকে শিখলাম। আপনার উপদেশগুলো এখন থেকে যথাযথ মেনে চলব ইনশাআল্লাহ।' আল্লাহর মেহেরবানীতে তার ঐসব উপদেশ মেনে সারা জীবনই উপকৃত হয়েছি।

১০.

মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী (র)-এর সান্নিধ্য

মরহুম মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী (র)-এর সাথে মরহুম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর (র) মাধ্যমেই প্রথম পরিচয় হয়। ১৯৪৩ সালে আমি যখন ক্লাস নাইনের ছাত্র তখন থেকেই মাওলানা ফরিদপুরীর সাথে আমার সম্পর্ক হয়। কিন্তু মাওলানা আযমীর সাথে আমার পরিচয় জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পূর্বে হয়নি। ১৯৫৪ সালে আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। তখন আমি রংপুর কারমাইকেল কলেজে শিক্ষকতা করতাম। ১৯৫৫ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে ঢাকা চলে আসি।

১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার কায়েম হয় এবং জনাব আতাউর রহমান খান প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জনাব আতাউর রহমান খান একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। শিক্ষা কমিশনের সদস্যদের সামনে বক্তব্যে তিনি মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় ও অপচয় বলে মন্তব্য করেন। আমি তখন 'ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা' নামে এক বিরাট প্রবন্ধ লিখে তাতে মাদ্‌রাসা শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করি। প্রবন্ধটি নিয়ে দৈনিক আজাদের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আকরাম খাঁর সাথে দেখা করি। মাওলানা প্রবন্ধটি পছন্দ করেন ও দৈনিক আজাদ

পত্রিকায় তা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন উপসম্পাদকীয়তে প্রবন্ধটির পক্ষে বেশ কিছু মন্তব্য করেন।

এই প্রবন্ধটিই মাওলানা আযমীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার প্রধান উপলক্ষ। লালবাগে জামেয়া কোরআনিয়ায় মাওলানা ফরিদপুরীর কামরায় ইতঃপূর্বে মাওলানা আযমীর সাথে পরিচয় হয়; কিন্তু তখনও তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর বাড়িতে একটি বৈঠক ডাকেন যেখানে মাওলানা ফরিদপুরী, মাওলানা আযমী, মাওলানা আবদুর রহীম এবং আরো কয়েকজনকে দাওয়াত দেন। আমাকেও সেখানে তিনি উপস্থিত থাকার জন্য খবর দেন। সেখানে আমি পৌঁছার সাথে সাথে মাওলানা আযমী অত্যন্ত আবেগের সাথে আমার সাথে কোলাকুলি করে তাঁর পাশেই বসিয়ে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ভাষায় আজাদে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধটির জন্যে মুবারকবাদ জানান। তাঁর স্নেহের পরশে আমি অত্যন্ত অভিভূত হই এবং এরপর তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরো গভীর হতে থাকে।

মাওলানা আকরাম খাঁর আহূত ঐ বৈঠকে 'ইসলামী শিক্ষা কমিশন' নামে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় মাওলানা আকরাম খাঁকে এবং সেক্রেটারি করা হয় আমাকে। এ কমিটি শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ এবং মাদ্‌রাসার শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষাকে সমন্বয় করার জন্য একটি সুপারিশমালা তৈরি করে সরকারের নিকট পেশ করে। এ সুপারিশমালা প্রণয়নে মাওলানা আযমীর অবদান সবচেয়ে বেশি ছিলো। এ কারণেই তাঁর সাথে আমার দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে এবং বেশ কয়টি বৈঠকে মাওলানা ফরিদপুরীও যথেষ্ট সময় দিয়েছেন।

এভাবেই মাওলানা আযমীর সাথে আমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠলো তার ফলে যতদিন দুনিয়ায় ছিলেন ততদিন তাঁর ঢাকায় অবস্থানকালে বারবার তাঁর সাথে ইসলামের বিভিন্ন ইস্যুতে মত বিনিময় হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীকে তিনি এতো ভালোবাসতেন যে, যখনই কোন ইসলামী ইস্যু সামনে আসতো তখনই তিনি জামায়াতের কী করণীয় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, যাতে ঐ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী যথাযথ ভূমিকা পালন করে।

তিনি এক সময় চকবাজারে এমদাদিয়া লাইব্রেরীর মালিক মাওলানা আবদুল করীমের বাড়িতে থাকতেন। আমি সে বাড়িতে গিয়েই তাঁর সাথে দেখা করতাম। পরবর্তীকালে তিনি দীর্ঘদিন ফরিদাবাদের জামেয়া এমদাদিয়ায় অবস্থান করতেন। এখানেও আমি বহুবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি বলতে গেলে চির রুগ্ন ছিলেন। যার কারণে তাঁর কোন পরিবার ছিলো না। তাই তাঁর নিজস্ব কোন বাসা বাড়িও ছিলো না। তিনি যেখানে থাকতেন একাই থাকতেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া ও দেখাশোনার দায়িত্ব তারাই পালন করতেন যারা তাঁকে থাকার জায়গা দিতেন।

মাওলানা আযমী ইসলাম সম্পর্কে এমন গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি যে সুচিন্তিত অভিমত দিতেন তাতে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হতাম। বাংলা ভাষায় তাঁর মতো দক্ষ আলেম আমি সে সময় খুব কমই দেখেছি। তিনি বাংলায় মেশকাত শরীফের যে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখেছেন তার সাহিত্যিক মানও বেশ উন্নত। তাঁর স্বাস্থ্যগত অবস্থা দেখে দুঃখ হতো। আফসোস করতাম যে, সুস্বাস্থ্যের অভাবে মুসলিম জাতি এতবড় প্রতিভার অবদান থেকে বঞ্চিত রইল। তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁর কাছে আমি অত্যন্ত আবেগের সাথে দাবি জানালাম যে, আপনার সুচিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন, যাতে আপনি যতদিন হায়াতে আছেন ততদিন দীনের জন্যে বড় কিছু খেদমত করে যেতে পারেন। এর জওয়াবে তিনি বলেন, ডাক্তারদের কাছ থেকে এ ধারণা পেয়েছি যে, আমার আরোগ্যের কোন আশা করা যায় না। শুধু হায়াত আছে বলেই আমার বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই তাই আল্লাহ তাআলার কাছে এই দোয়া করছি, যেন আমার বাকি হায়াতটুকু মাওলানা মওদূদীকে দান করেন, যিনি দীনের বিরাট খেদমত করছেন। তিনি মাওলানা মওদূদীকে যে এতো মহব্বত করতেন একথা বলার আগে বুঝতে পারিনি। সেদিন থেকে তাঁর প্রতি আমার মহব্বত আরো বেড়ে যায়।

এদেশে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার ব্যাপারে তিনি এতো উৎসাহী ছিলেন যে, যখনই তিনি প্রয়োজন মনে করতেন আমাকে ডেকে নিতেন এবং জামায়াতের কার্যকলাপ সম্পর্কে খবর নিতেন ও মূল্যবান পরামর্শ দিতেন। এ দেশে যে কয়জন উদারচেতা, ইসলাম দরদী, দেশপ্রেমিক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সৌভাগ্য হয়েছে তার মধ্যে এক নম্বরে একই সাথে দু'জনকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা, মহব্বত ও আবেগের সঙ্গে স্মরণ করি। এ দু'জন হলেন মাওলানা ফরিদপুরী ও মাওলানা আযমী। ইসলামের যারাই যেখানে যতটুকু খেদমত করছেন তাদের খেদমতকে তাঁরা দু'জনেই স্বীকৃতি দিতেন। কোন মহলের বিরুদ্ধেই তাঁদের কাছ থেকে কোন মন্তব্য শুনিনি। ইকামাতে দীনের আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালিত হোক তাঁরা তা মনে প্রাণে চাইতেন বলেই আমাকে পরামর্শ দিতেন। ঘটনাক্রমে দু'জনেই চির রুগ্ন ছিলেন। দু'জনকে একসাথে আমি এতোবার দেখেছি যে, মনে হতো তাঁরা যেন ইসলামী চিন্তাধারার দিক দিয়ে একাত্ম ছিলেন।

অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) ও মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী (র)-এর সাথে যে পরিমাণ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছি এবং তাঁদের যতটা স্নেহের পরশ অনুভব করেছি তা আমার ইসলামী জীবন গঠনে বিরাট অবদান রেখেছে।

তাবলীগ জামায়াতে সাড়ে ৪ বছর একাগ্রতার সাথে কর্মরত থাকাকালে (১৯৫০-৫৪) এ দেশের ঐ জামায়াতের আজীবন আমীর (প্রায় ৫০ বছর) মাওলানা আব্দুল আযীয

(খুলনাভী) (র) এবং মাওলানা জিয়াউদ্দীন আলীগড়ীর (র) সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

সাংবাদিকতায় মুসলিম বাংলার প্রাণপুরুষ মাওলানা আকরাম খানের (র) স্নেহধন্য হবার সৌভাগ্যও হয়েছিলো। নেযামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আতাহার আলীর (র) সাথেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

যাদের দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য না পেলেও ইসলামী আন্দোলন সূত্রেই একান্তে বিভিন্ন সময় মত-বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছি তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে যাদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি তাঁরা হলেন–

১. মাওলানা মুফতী দীন মুহম্মদ (র)

২. মাওলানা মুফতী আমীমুল ইহসান (র)

৩. মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকি আল কুরাইশ (র)

৪. মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশ (র)

৫. মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (র) (নেযামে ইসলাম পার্টি)

৬. মাওলানা সাইয়েদ মুসলেহুদ্দীন (র) (নেযামে ইসলাম পার্টি)

৭. মাওলানা সাইয়েদ মুস্তাফা আল মাদানী শহীদ (র)

৮. মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল আহাদ আল মাদানী (র)

৯. মাওলানা তাজুল ইসলাম (র) (ফখরে বাংগাল)।

বিজ্ঞানের প্রতি আমার ঝোঁক

ম্যাথাম্যাটিক্স-এ খুব ভালো থাকায় আমার শিক্ষকরাও আইএসসি পড়ার জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করলেন। আইএসসি পড়তে হলে তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হতে হতো। আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ ছিলো না। কিন্তু আব্বা কিছুতেই আইএসসি-তে ভর্তি করতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আইএসসি পড়লে আরবী পড়ার সুযোগ থাকবে না। তুমি কি ভুলে গেছো যে, তোমার দাদা বলেছিলেন, তোমাকে আরবী, ইংরেজি ও বাংলা তিনটি ভাষা ভালোভাবে শিখতে হবে।' দাদার দোহাই সত্ত্বেও আমি বিজ্ঞান পড়ার জন্য আবদার জানাতে থাকলাম। আব্বা রাগ করে বললেন, 'দুনিয়ার স্বার্থেই তোমাকে মাদ্‌রাসায় ভর্তি করলাম না। মাদ্‌রাসায় কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ শিক্ষা সত্ত্বেও আয়-রোযগারের ময়দানে উন্নতির উপায় নেই বলে বাধ্য হয়ে নিউ স্কীমে ভর্তি করলাম। তুমি বংশের বড় ছেলে। আরবী ভাষা তুমি ভালো করে না শিখলে কুরআন অধ্যয়ন করার যোগ্যতা হবে না। এ যোগ্যতা না হলে তোমার পরে ছোট ভাই-বোনদেরকে দীনের পথে পরিচালনা করবে কে?' এতো কথা সত্ত্বেও আমি যেন আব্বার কথা মেনে

নিতে পারছিলাম না। আমার চেহারা দেখে তিনি আমার মনোভাব আঁচ করে রাগতস্বরে বললেন, 'তাহলে তোমাকে শেষ পর্যন্ত মাদ্‌রাসায়ই ভর্তি করতে হবে। বাংলা-ইংরেজি যে পরিমাণ শিখেছো এতেই চলবে। এখন কুরআন-হাদীস-ফিকাহ্ আরবী বেশি করে শিখ।' আব্বার এ ধমকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করায় মাদ্‌রাসায় পড়া থেকে বেঁচে গেলাম। সে সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইএসসি পড়তে না পারায় বেশ কিছুদিন আব্বার প্রতি অসন্তুষ্টই ছিলাম। বিজ্ঞান পড়তে না পারলেও যে কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নেওয়া সম্ভব বলে সান্ত্বনা বোধ করলাম।

১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করি। বিএ-তে যে কোর্স নিয়েছিলাম তাতে আরবী একটি বিষয় ছিলো। খারাপ ছাত্র ছিলাম না বলে আরবী যে পরিমাণ শিখা হলো তা ইসলামী আন্দোলনে বিরাট নিয়ামত বলে উপলব্ধি করলাম। তখন থেকে আব্বার জন্য প্রাণভরে দোয়া করি যে, তিনি আমাকে আরবী পড়তে বাধ্য করে আমার দীনী জিন্দেগীকে উন্নত করার যে ব্যবস্থা নিলেন এর জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাকে অফুরন্ত পুরস্কার দান করুন। আরবী ভাষা অতটুকু না শিখলে মুসলিম হিসেবে আমার জীবন হয়তো ব্যর্থ হয়ে যেতো।

আমার ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা

ইতঃপূর্বে ঐ সময়ে প্রচলিত চার প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে যে, একমাত্র নিউ স্কিম সিস্টেম অব এডুকেশনেই আধুনিক শিক্ষা এবং আরবী ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা হয়। এ স্কিমে সেকেন্ডারি স্টেজ পাস করার পর আর্টস, সাইন্স, কমার্স যে কোনো দিকেই পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হতো। আর নিউ স্কিমে ইন্টারমিডিয়েট পাস করলে আর্টসের যে কোনো বিষয়েই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যেতো। এ কারণেই যারা তাদের সন্তানদেরকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সাথে কুরআন হাদিস অধ্যয়ন করার যোগ্য বানাতে চেয়েছিলেন তারাই এ শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে এ শিক্ষাব্যবস্থার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

১৯৫৬ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার কায়েম হয় তখন এ শিক্ষাকে উৎখাত করার হীন উদ্দেশ্যেই জুনিয়র মাদ্‌রাসাগুলোকে সরকারি সাহায্য দিয়ে জুনিয়র হাইস্কুলে রূপান্তরিত করা হয়। সরকারি সাহায্যের লোভে জুনিয়র মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণ সরকারি সাহায্যের খপ্পরে পড়েন। জুনিয়র মাদ্‌রাসাগুলো হাই মাদ্‌রাসার ফিডার প্রতিষ্ঠান ছিলো। জুনিয়র মাদ্‌রাসা বন্ধ হওয়ার ফলে হাই মাদ্‌রাসার কোর্সে ভর্তি হওয়ার মতো ছাত্র পাওয়া সম্ভব ছিলো না। এভাবেই ঐ চমৎকার শিক্ষাব্যবস্থাটির অপমৃত্যু ঘটে। আর এর কৃতিত্ব আওয়ামী সরকারের উপরই বর্তায়।

ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি

পুরোনো ঢাকার বাহাদুর শাহ্ পার্কের কাছেই সরকারি কবি নজরুল কলেজ যে কমপ্লেক্সে অবস্থিত, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ওখানেই ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ অবস্থিত ছিলো। আমি এ কলেজ থেকেই হাই মাদ্‌রাসা পাস করি। নিউ স্কিম শিক্ষা পদ্ধতিতে ক্লাস সেভেন থেকে আইএ পর্যন্ত একই প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রিন্সিপালের পরিচালনাধীন ছিলো, জুনিয়র সেকশন কলেজ সেকশন থেকে পৃথক ছিলো, যদিও একই ক্যাম্পাসে অবস্থিত ছিলো।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ঐ কলেজে আইএ ক্লাসে ভর্তি হই। সারাদেশ থেকে হাই মাদ্‌রাসা পরীক্ষায় স্কলারশীপ হোল্ডার ও ফার্স্ট ডিভিশনে পাস বেশ কিছু ছাত্র ঐ কলেজে ভর্তি হয়। ফলে ক্লাসে বেশ প্রতিযোগিতা চলতো। শিক্ষকগণ ক্লাসে যে টাস্ক দিতেন তার ফলে এ প্রতিযোগিতা জমে উঠেছিলো। এর ফলে বেশ খেটেখুটেই পড়াশুনা করতে বাধ্য হতাম। এ প্রতিযোগিতা আমার নিকট খুব উপাদেয় ছিলো।

আইএ ক্লাসে এক হাজার নম্বরের জন্য দশটি পেপার ছিলো। এর মধ্যে বাংলা ২০০, ইংরেজি ২০০, আরবী ২০০, কুরআন ১০০, হাদিস ১০০ এবং ফিকাহ্ ১০০ এ ৯টি পেপার সকলের জন্যে বাধ্যতামূলক ছিলো। বাকি ১০০ নম্বরের জন্য দুটো বিষয়ের যে কোনো একটি বাছাই করার ইখতিয়ার ছিলো। সে দুটো বিষয় ছিলো ইংরেজি ও 'লজিক কালাম'। অধিকাংশ ছাত্রই স্কলারশীপ পাওয়ার আশায় লজিক কালাম নিতো। কারণ এতে যথেষ্ট নাম্বার পাওয়ার সুযোগ থাকে। লজিক কালামের বদলে ইংরেজি নিয়ে কেউ ফার্স্ট গ্রেড স্কলারশীপ পায়নি ইতঃপূর্বে। এ সত্ত্বেও আমি ইংরেজি নিতে দ্বিধাবোধ করিনি। কারণ ইংরেজি, বাংলা, আরবী এ তিনটি ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যেই আমি নিউ স্কিমে ভর্তি হই। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমিই সর্বপ্রথম ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইংরেজি নেওয়া সত্ত্বেও ফার্স্ট গ্রেড স্কলারশীপ পাই। তবে ১০ম স্থানের উপরে উঠা সম্ভব হয়নি।

১১.

আইএ ক্লাসের শিক্ষকগণ

ইংরেজি, বাংলা, কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্‌র শিক্ষকগণকে বেশ উচ্চমানের মনে হতো এবং তাদের পাঠদান থেকে যা শিখতাম তাতে উৎসাহবোধ করতাম। কিন্তু আরবী ভাষার শিক্ষকগণ কোর্সের আরবী সিলেবাসটুকু শুধু ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতেন। আরবী ভাষা শিক্ষার উপযোগী পদ্ধতি যা ছিলো তাতে বেশি শিখতে পারছি বলে মনে হতো না।

ইংরেজি ও বাংলা ভাষা ভালোভাবে শিখছি বলে যে উৎসাহবোধ করতাম আরবী ভাষায় তা মোটেই অনুভব করতাম না। ইংরেজি ভাষার শিক্ষকগণ শুধু লেকচার দেওয়া যথেষ্ট মনে করতেন না। তারা হোম টাস্কও দিতেন। মাঝে মাঝে লেকচারের বদলে ক্লাসে লেখার জন্য টাস্ক দিতেন। ক্লাসেই খাতা দেখে ভুল শুদ্ধ করে দিতেন, নম্বরও দিতেন। এভাবে তারা আমাদেরকে ইংরেজি শিখতে বাধ্য করতেন। যদি আরবী শিক্ষকগণও এভাবে শেখাবার চেষ্টা করতেন তাহলে কতই না ভালো হতো। ক্লাসে ইংরেজি শিক্ষকগণ ইংরেজি ছাড়া কখনো বাংলা বলতেন না। অথচ আরবী শিক্ষকগণ ইংরেজি ছাড়া কখনো আরবী বলতেন না।

১৯৪০ সালে মার্চ মাসে ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষা হয়। জুন মাসে ফল প্রকাশ পায়।

আমার হোস্টেল জীবন

বিশ্ববিদ্যালয়ে হল জীবন শুরু হবার পূর্বে ক্লাস নাইন থেকে আইএ পরীক্ষা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার বছর ঢাকায় আমার হোস্টেল জীবন কেটেছে।

১৯৪০ সালে ক্লাস নাইনে ভর্তি হয়ে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের উত্তর পার্শ্বের কলতাবাজার নামে পরিচিত মহল্লায় ২২ নম্বর দ্বিতল বাড়িটিতে অবস্থিত হোস্টেলে ছিলাম। হোস্টেলটির অতি নিকটে মসজিদ থাকায় পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে নামায পড়তাম।

১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে ইসলামপুর রোডে অবস্থিত ঢাকার নওয়াব বাড়ির গেইটের দ্বিতল বাড়িটিতে আমাদের হোস্টেল স্থানান্তরিত হয়। '৪২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে হাই মাদ্‌রাসা পরীক্ষা পর্যন্ত এ হোস্টেলেই ছিলাম। আইএ পড়ার সময়ে '৪২ সালের জুলাই থেকে ৪৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত নওয়াব বাড়ির দেয়ালের পূর্ব পার্শ্বে একটি প্রশস্ত একতলা বাড়িতে অবস্থিত প্যারাডাইস হোস্টেলে ছিলাম।

কলতাবাজার হোস্টেল

এ হোস্টেলে ক্লাস এইট থেকে টেন পর্যন্ত ২০/২৫ জন ছাত্র ছিলো। আমি প্রথমে ৪ সিটবিশিষ্ট একটি কামরায় ছিলাম। বছরের শেষ দিকে সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেব আমাকে দুই সিটবিশিষ্ট একটি কামরায় স্থানান্তরিত করেন। হোস্টেল সুপারিন্টেনডেন্ট আমাদের স্কাউট টিচার ছিলেন। তারই অনুপ্রেরণায় আমি স্কাউট আন্দোলনে যোগদান করি। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং আমার লেখাপড়ার ব্যাপারেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। হোস্টেলে খুব কঠোর আইন-শৃঙ্খলা ছিলো। এ ব্যাপারে সুপার সাহেব বেশ কড়া ছিলেন। সবাই তাকে অত্যন্ত ভয় করতো। তবে তার যোগ্য পরিচালনার কারণে তাকে শ্রদ্ধাও করতো। মাগরিব থেকে এশার মাঝখানে দোতলায় অবস্থিত তার কামরা থেকে পর্যবেক্ষণে বের হতেন। ছাত্রদের মধ্যে যারা উপরতলায় থাকতো তাদের কামরাগুলো পর্যবেক্ষণ করে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তার চটি জুতার আওয়াজ শুনে নিচের কামরার সবাই যার যার পড়ার টেবিলে অত্যন্ত

মনোযোগ দিয়ে পড়ায় নিবিষ্ট হতো। তিনি কামরায় ঢুকতেন না এবং ছাত্ররা বেরিয়ে তাকে সালাম দিক তা পছন্দ করতেন না। তিনি এটাই চাইতেন যে তারা ঠিকমতো লেখাপড়া করুক। তিনি ধূমপানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কোনো কামরার সামনে দিয়ে যেতে বিড়ি-সিগারেটের গন্ধ পেলে কড়া ভাষায় উচ্চারণ করতেন যে, ধূমপান করলে জরিমানা করা হবে। তাই যারা ধূমপান করতো তারা এতো সাবধানতা অবলম্বন করতো যে, শুধু কামরার ভিতরে নয়; হোস্টেলের কোনো জায়গায়ই বিড়ি-সিগারেটের চিহ্নও পাওয়া যেতো না।

হোস্টেলটি সরকারি হোস্টেল ছিলো। আমাদের মাসিক খাওয়া খরচ ছিলো সাড়ে চার টাকা। খাওয়ার মান মোটামুটি ভালোই ছিলো। সুপারিন্টেনডেন্টের কড়াকড়ি করার কারণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও সন্তোষজনক ছিলো। আমার আম্মা খুব চিন্তিত ছিলেন যে, খাওয়ার মান কেমন হবে এবং আমার স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে কি না। কয়েকমাস পর যখন বাড়ি গেলাম তখন আমার আম্মা আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, কুমিল্লায় তোমার স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিলো না। ঢাকায় গিয়ে তুমি ভালোই করেছো।

জুনিয়র মাদ্রাসায় ফার্স্ট ডিভিশনে পাস ছাত্র যারা ছিলো তাদেরকে হোস্টেল খরচ বাবদ হাজী মহসিন ফান্ড থেকে মাসিক দুই টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হতো। সে হিসেবে আমিও এ বৃত্তি পেতাম। হোস্টেলে খাওয়া বাবদ আমাকে মাসিক মাত্র আড়াই টাকা দিতে হতো।

কুমিল্লায় ক্লাস সেভেনে বাংলা পাঠ্য বইতে 'দানবীর হাজী মহসিন' নামে লেখা তাঁর জীবনী পড়েছি। তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর বিরাট সম্পত্তি মেধাবী ও গরীব মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সে সম্পত্তি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ছিলো। হুগলীতে হাজী মহসীন কলেজ নামে নিউ স্কিম পদ্ধতির একটি কলেজও ছিলো। ১৯৪৭ সালে বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ব বঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) হাজী মহসিন ফান্ডের সাহায্য পৌঁছতো কি না সেটা আমার জানার সুযোগ হয়নি।

হোস্টেল চত্বরে গোসলের জন্য কোমর সমান উঁচু একটি পাকা হাউস ছিলো, মগ দিয়ে হাউস থেকে পানি তুলে আমরা গোসল করতাম। ছুটির দিনে মাঝে মধ্যে সদরঘাট গিয়ে বুড়িগঙ্গায়ও গোসল করতাম। বিশেষ করে বর্ষাকালে পানিভর্তি বুড়িগঙ্গায় গোসল করে আনন্দ পেতাম। আগে বলেছি যে, ছোটসময় ছোট মামার সাথে বুড়িগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে বুড়িগঙ্গার পরিষ্কার পানির স্রোত দেখে গোসল করার ইচ্ছে হতো, কিন্তু অনুমতি পেতাম না। হোস্টেলে থাকাকালে ছোটকালের সে ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ পেলাম।

কলতাবাজার হোস্টেলে আমার হোস্টেল মেটদের কয়েকজন

প্রথমে ৪ সিট বিশিস্ট কামরায় যখন ছিলাম তখন আমার সাথে যে তিনজন ছিলেন তার একজন রংপুরের নূরুল হক। সে পরবর্তীকালে আইন ব্যবসা করে এবং রংপুর

আওয়ামী লীগের জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। ৭৩-এর নির্বাচনে সে এমপি হয়। ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আমরা একই সাথে আইএ পাস করি। সে ফার্স্ট গ্রেড স্কলারশীপও পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এমএ ও ল' পাস করে। নিউ স্কিমে আইএ পাস করেও অর্থনীতিতে এমএ পাস করতে কোন বেগ পায়নি।

আর একজন রুমমেট রহমত আলী। সে হাই মাদ্‌রাসা পাস করে মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল থেকে এল.এম.এফ. ডাক্তার হয়। ডাক্তার হয়ে জেল সার্ভিসে যোগদান করে। তার রিটায়ার করার পরেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমার তৃতীয় রুমমেট নূরে জালাল বয়সে আমাদের চেয়ে বেশ বড় ছিলো এবং দেখতেও বেশ সুপুরুষ ছিলো। আমরা যখন কিশোর সে তখন যুবক। সে হাই মাদ্‌রাসা পাস করতে পারেনি। ঢাকা জেলারই এক পীরের ছেলে ছিলো। অনেক বছর পরে ঢাকার ইসলামপুর রোডে আলখাল্লা পরা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে আকর্ষণীয় চেহারার এক ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে তাকালাম। তার পেছনে কয়েকজন ভক্তও ছিলো। খুব কাছে পৌঁছার পর আমি বড় আওয়াজে বলে উঠলাম 'আরে নূরে জালাল নাকি রে?' সেও হেসে আমার সাথে আলিঙ্গন করলো এবং ইশারায় আমাকে বুঝাল আমি যেন মুরীদদের উপস্থিতির কারণে সংযত হয়ে কথা বলি। এরপর তার সাথে আর দেখা নেই। তবে কয়েক বছর আগে তার দরবার থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার আকারের একটি সাপ্তাহিক বা মাসিক সংখ্যা আমার কাছে পাঠিয়েছিলো। সে পত্রিকায় ব্যানার হেডে লেখা ছিলো 'পীরকে সিজদা করা শরীআতে সম্পূর্ণ জায়েয।' কলতাবাজার হোস্টেলে পরবর্তীকালে দুই সিটবিশিষ্ট কামরায় যিনি আমার সাথে ছিলেন তিনি আমার এক ক্লাস উপরে ছিলেন। তিনি বেশ পড়ুয়া ছিলেন। হোস্টেল সুপার আমাকে পড়ুয়া হবার সুযোগ দেওয়ার জন্য ৪ সিটের কামরা থেকে এ কামরায় স্থানান্তরিত করেন। এ রুমমেটটি হলেন বিচারপতি নূরুল ইসলাম, যিনি বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন।

কলতাবাজার হোস্টেলের আরেকজন হোস্টেল মেট কাজী দীন মুহম্মদ। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে হাই মাদ্‌রাসা পাস করে হুগলী হাজী মহসিন ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এমএ পাস করেন এবং দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিভাগে প্রফেসর ছিলেন। বর্তমানে ড. কাজী দীন মুহম্মদ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর।

বিচারপতি নূরুল ইসলামের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়লো। ১৯৭১ সালের কথা। বিচারপতি নূরুল ইসলাম তখন হাইকোর্টে কর্মরত। এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে খুবই আবেগের সঙ্গে তার পরিচয় দিয়ে বললো যে, তার কষ্টে অর্জিত একটি সম্পত্তি মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কতক লোক দখল করার চেষ্টা করছে। নিম্ন আদালত থেকে আমার

পক্ষে রায় পেলেও হাইকোর্টে আমি রায় পাব কিনা আশংকা করছি। কারণ অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐ পক্ষে রয়েছে। এ মামলাটি বর্তমানে বিচারপতি নূরুল ইসলামের আদালতে আছে। আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি যে সত্যি এ সম্পত্তির মালিক এ বিষয়ে যদি আপনি বিচারপতি নূরুল ইসলামকে একটু বলে দেন তাহলে হয়তো প্রতিপক্ষ কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।

আমি আইনের লোক নই। আইনের দৃষ্টিতে বিচারপতিকে এ বিষয়ে কিছু বলা উচিত কিনা সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিলো না। কিন্তু লোকটির সামগ্রিক পরিচয়, তার চেহারা, তার বাচনভঙ্গি ও আবেগের প্রকাশ দেখে আমি প্রভাবিত হই। আমার কথায় যদি তার কোন উপকার হয় তাহলে সেটা আমার বলা উচিত বলে মনে করি।

আমি ঐ লোকটির সামনেই বিচারপতিকে তার বাসায় ফোন করলাম। যা বলার প্রয়োজন তা বললাম, তিনি জওয়াবে যা বললেন, তাতে আমি লজ্জা তো পেলামই বিব্রতও বোধ করলাম। তিনি বললেন, 'আপনি তো ঐ লোকটিকে সাহায্য করতে গিয়ে ক্ষতিই করে ফেললেন। আপনার কাছে তার সুপারিশ করার জন্য আসাটা মারাত্মক ভুল হয়েছে। যেহেতু আপনাকে আমি ভালোভাবে চিনি তাই সম্পত্তির মালিক যে সে-ই এ বিষয়ে আপনার কথায় আমি Convinced হয়ে গিয়েছি। ফলে এ মামলার একপক্ষে Biased হয়ে গেলাম। আইনের হিসাবে আমি এ মামলায় বিচার করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেললাম। তাই বাধ্য হয়ে প্রধান বিচারপতির নিকট এ মামলা আমাকে ফেরত দিতে হবে। অন্য বিচারপতির আদালতে এ মামলার নিষ্পত্তি হবে।

আমি ঐ লোককে বিব্রত হয়ে বললাম, 'আপনি এ বিচারপতির হাতে ইনসাফ পেতেন। সুপারিশ চাইতে এসে আপনি একজন ন্যায়বিচারকের আদালত থেকে বঞ্চিত হলেন। আইনের এ মারপ্যাচ জানলে আমি কখনও আপনার কথায় বিচারপতিকে ফোন করতাম না।'

কলতাবাজার হোস্টেল স্থানান্তর

১৯৪০ সালে কলতাবাজার হোস্টেলে থাকাকালে কয়েকবার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। কলতাবাজার ও রায়সাহেব বাজার (জনসন রোড) এলাকাটি মুসলমানদের এলাকা ছিলো। বাহাদুর শাহ পার্কের (সেকালে এর নাম ছিলো ভিক্টোরিয়া পার্ক) দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরমুখী শ্বেত পাথরে তৈরি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক বিরাট মূর্তি ছিলো। পার্কের দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত মুসলমানদের এলাকা মনে করা হতো। এরপর থেকে সদরঘাট, বাংলাবাজার ও পাটুয়াটুলী হিন্দু প্রভাবান্বিত এলাকা ছিলো। দাঙ্গা শুরু হলে দক্ষিণ দিকে ভিক্টোরিয়া পার্ক ও উত্তর দিকে নওয়াবপুর ও রায় সাহেব বাজারের পুল পর্যন্ত মুসলমানদের দখলে থাকতো। এ পুলের নিচ দিয়ে ধোলাইখাল প্রবাহিত হতো। বর্তমানে ধোলাইখালটি নেই; এখন সেখানে প্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এ খালটিই সেকালে ঢাকা শহরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিলো। শহরের যাবতীয় বর্জ্য এ

খাল দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়ে পড়তো।

আমাদের হোস্টেলটি এ খালের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিলো। উত্তর তীরে মৈশুণ্ডী এলাকা হিন্দুদের দখলে ছিলো। ওপার থেকে হামলার আশংকায় আমরা হোস্টেলের ছেলেরা ২৪ ঘণ্টা পাহারা দিতাম। রাতে হ্যাজাক জ্বালিয়ে ৪ জন ছাত্রকে দু'ঘণ্টা করে পাহারা দিতে হতো।

ভরা বর্ষায় হোস্টেলের দিক থেকে খালটি বেশ প্রশস্ত মনে হতো। নৌকাযোগে মৈশুণ্ডী থেকে হিন্দুদের হামলা হতে পারে বলে বর্ষাতেও পাহারার প্রয়োজন হতো। এক বছরে কয়েকবার দাঙ্গা হওয়ায় ছাত্রদেরকে এভাবে পাহারা দিতে হতো বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ হোস্টেলটি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি থেকে ইসলামপুর রোডের নওয়াব গেটে আমাদের নতুন হোস্টেল কায়েম হয়।

নওয়াব গেট হোস্টেল

ইসলামপুর রোডের দক্ষিণ পাশে ঢাকার নওয়াব বাড়ির বিরাট গেট। ঢুকলেই বামপাশে দ্বিতল বাড়িটিতে আমাদের হোস্টেল ছিলো। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি থেকে '৪২ সালের এপ্রিল (হাই মাদ্‌রাসা ফাইনাল পরীক্ষা) পর্যন্ত এ হোস্টেলেই ছিলাম। কলতাবাজার হোস্টেল থেকে কলেজ খুব নিকটে ছিলো। নওয়াব গেট থেকে কলেজের দূরত্ব সে তুলনায় তিনগুণ। এ এলাকাটি মুসলিম প্রধান হওয়ায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কারণে কলতাবাজার হোস্টেলের মতো আমাদেরকে পাহারা দিতে হতো না। এ হোস্টেলের ভেতরে খেলাধুলার সামান্য জায়গাও ছিলো না। তাই বিকেলবেলা খেলাধুলার জন্য কলেজ মাঠেই যেতে হতো। নওয়াব গেট থেকে পাটুয়াটুলী হয়ে সদরঘাটের পাশ দিয়ে গেলে রাস্তা একটু লম্বা হয়। আর ইসলামপুর থেকে শাঁখারীপট্টির ভেতর দিয়ে গেলে রাস্তা সংক্ষেপ হয়। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেধে গেলে আমরা কখনও শাঁখারীপট্টি দিয়ে যেতাম না। কারণ সেখানকার সকল অধিবাসী হিন্দু ছিলো।

হোস্টেলের দোতলায় তিন সিটবিশিষ্ট কামরায় আমার সিট ছিলো। বাকি ২ সীটে একজন ছিলেন নারায়ণগঞ্জের আবদুল খালেক আর একজন ঐ এলাকারই আবদুল কুদ্দুস। এরা দু'জনই আমার ক্লাসের ছাত্র ছিলো। আবদুল কুদ্দুসকে আমি কুদ্দুস ভাই ডাকতাম। বয়সে তিনি আমার কয়েক বছরের বড়। তিনি আমার আপন খালাতো ভাইয়ের চাচাতো ভাই হওয়ায় আত্মীয় হিসেবে ভাই সম্পর্কিতই ছিলো। রুমমেট ও সহপাঠী হওয়ার কারণে আচরণের দিক দিয়ে একে অপরের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণই করতাম। আমাদের হোস্টেলের নিকট নওয়াব বাড়ি মসজিদেই নামায পড়তাম। হোস্টেল থেকে আহসান মঞ্জিল নামক প্রাসাদের দিকে যাওয়ার পথেই মসজিদ অবস্থিত। বর্তমানে আহসান মঞ্জিল প্রাসাদটি যাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত। সে সময় নওয়াব পরিবারের লোকজন সেখানে বসবাস করতো। নওয়াব আহসান উল্লাহর নামে এ ভবনটির নামকরণ করা হয়।

নওয়াব আহ্‌সান উল্লাহর ছেলে নওয়াব সলিমুল্লাহ বিশ শতকের শুরুতে এদেশের মুসলমানদের দরদী নেতার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববাংলা ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ কায়েম হয়। ঢাকা এর রাজধানী ছিলো। কোলকাতাভিত্তিক হিন্দু নেতাদের আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সম্রাট ৫ম জর্জ দিল্লীতে এসে বঙ্গভঙ্গ রদ করে দেবার ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের যে বিরাট ক্ষতি হয় তা পূরণের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালান। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলটি স্যার সলিমুল্লাহর নামে এখনও পরিচিত। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা যে মর্যাদা পেয়েছিলো, তারই ফলে স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ঢাকায় গোটা ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনেই মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

আমি যখন নওয়াব গেট হোস্টেলে ছিলাম তখন স্যার সলিমুল্লাহর ছেলে হাবিবুল্লাহ ঢাকার নওয়াব ছিলেন। তিনি ঢাকায় কমই থাকতেন, কোলকাতায়ই বেশি থাকতেন। ১৯৩৭ সালে তাঁর ছোট ভাই নওয়াবজাদা খাজা নসরুল্লাহ বঙ্গীয় আইন সভায় নবীনগর থেকে নির্বাচিত হন। নবীনগর ও আশপাশের কয়েকটি থানা নিয়ে নির্বাচনী আসন ছিলো। এ এলাকাটি ঢাকার নওয়াবদেরই জমিদারী এলাকা।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সর্বপ্রথম প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৭ সালে ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমি তখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র। আমাদের বড়াইল জুনিয়র মাদ্‌রাসা মাঠে খাজা নসরুল্লাহর নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে সর্বসাধারণ ভোটার ছিলো না। একটি বিশেষ পরিমাণ ট্যাক্সদাতারা ভোটার ছিলো। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, মাদ্‌রাসা থেকে মাইলখানেক দূরে নদীতে খাজা নসরুল্লাহ সাহেব পানসি নৌকাতে আসলেন এবং সেখান থেকে পালকিতে চড়ে জনসভায়। বিরাট দেহবিশিষ্ট হলুদবরণ সৌম্যমূর্তি পালকি থেকে নেমে মঞ্চে বসলেন। তিনি বক্তৃতা করলেন না। যারা বক্তৃতা করলেন তাদেরকে আমি চিনতামও না। তারা কী বক্তব্য রাখলেন সেদিকে আমার কোন মনোযোগ ছিলো না। হয়তোবা ঐসব রাজনৈতিক কথা বুঝবার বয়স হয়নি। আমি ও আমার মতো বয়সী অনেকে ঐ অদ্ভুত সুন্দর মানুষটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম। যতোক্ষণ তিনি মঞ্চে ছিলেন একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে সামান্য কয়েক টান দিয়ে ফেলে দিতেন এবং লোকেরা কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যেতো। ঘণ্টাখানেক সভা চলার পর তিনি আবার পালকিতে চড়ে পানসি নৌকায় চলে গেলেন। বহুলোক পেছনে পেছনে পালকির চারপাশ ঘিরে নৌকা পর্যন্ত গেলো।

নওয়াব বাড়ির হোস্টেলের কথা বলতে গিয়ে নওয়াবদের অনেক কথা অপ্রাসঙ্গিকভাবে এসে গেলো। নওয়াব বাড়ি মসজিদে নিয়মিত নামায পড়া সত্ত্বেও নওয়াব বাড়ির কারোর সাথে দেখা-সাক্ষাত বা পরিচয়ের কোনো সুযোগ হয়নি।

জুমআর নামাযে নওয়াব বাড়ির যারা মসজিদে আসতো তারা সামনের দিকেই বসতো। আমাদের বয়সী যে কয়েকজনকে দেখেছি তারা নামাযের পরেই চুপচাপ চলে যেতো। তাদের কারো সাথে কথা বলা বা পরিচয় করার অবকাশ ছিলো না। তাদের চেহারা, গায়ের রং বা পোশাক দেখেই চেনা যেতো এরা নওয়াব বাড়ির লোক। নওয়াব বাড়ির মহিলাদেরকে বেপর্দা চলতে আমরা কখনও দেখিনি। ঘোড়ার গাড়িতে তারা যাতায়াত করতেন। তখন ঘোড়ার গাড়ির চারপাশে রেশমী কাপড় দিয়ে গোটা গাড়িটাকেই ঢেকে রাখতো। এমনকি মোটর গাড়ির জানালার ভেতর দিয়েও পর্দা টাঙ্গানো থাকতো।

নওয়াব বাড়ির ভেতরের আয়তন বিরাট ছিলো। এর দক্ষিণ প্রান্তে আহসান মঞ্জিল স্থাপিত। আহসান মঞ্জিলের দক্ষিণেই বাকল্যান্ড রোড যা বুড়িগঙ্গার তীরেই অবস্থিত। বুড়িগঙ্গা আমাদের হোস্টেলের অতি নিকটে হওয়ায় আমরা বেশ কয়েকজন ফজরের নামাযের পর পায়জামা ও হাফসার্ট পরেই বাকল্যান্ড রোডে গিয়ে দৌড়াতাম। এ ব্যাপারে আমার উদ্যোগই বেশি ছিলো।

প্যারাডাইস হোস্টেল

নওয়াব বাড়ির পূর্ব দিকেই দেয়াল ঘেঁষে যে রাস্তাটি ইসলামপুর থেকে বাকল্যান্ড রোডের দিকে চলে গেছে সে রাস্তার পাশেই একতলা প্রশস্ত একটি বাড়িতে এ হোস্টেলটি স্থাপিত হয়। ১৯৪২ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল (ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা) পর্যন্ত এ হোস্টেলে ছিলাম। এতে শুধু সরকারি ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্ররাই থাকতো। মাত্র ১৫টি আসনবিশিষ্ট হোস্টেলটিতে কড়া প্রশাসন ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কলেজের লাইব্রেরীয়ান মৌলভী সানাউল্লাহ সাহেব নামেমাত্র হোস্টেল সুপারের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি অত্যন্ত নিরীহ ভদ্রলোক ছিলেন। হোস্টেল পরিচালনার ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের হাতেই দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। ফলে প্রশাসনিক কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। আমরা অনুভব করতাম যেন আমরা একটা মেসে বসবাস করছি। ক্লাস নাইন থেকে আইএ পর্যন্ত তিনটি হোস্টেলে প্রায় সাড়ে চার বছর থাকাকালে সরকারি ডাক্তার সপ্তাহে একবার ছাত্রদের দেখার জন্য হোস্টেলে আসতেন। কলতাবাজার হোস্টেলে থাকাকালে যে ডাক্তার আসতেন তিনি বেশ বয়স্ক ছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে মুরুব্বিয়ানা ভাষায় কথা বলতেন। ডাক্তার সাহেব হিন্দু ছিলেন। তিনি ডাক্তার হিসেবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন। তিনি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক উপদেশ দিতেন। প্রয়োজন হলে প্রেসক্রিপশন নিয়ে আমরা সরকারি হাসপাতাল থেকে ঔষধ নিতাম।

বিকেলে খেলাধুলার পর যখন পড়তে বসতাম তখন ঘুম খুব জ্বালাতন করতো। ঘুমের জ্বালায় পড়তে না পেরে বার বার উঠে চোখে পানি দিতাম। একদিন ঐ ডাক্তারকে আবদারের ভাষায় বললাম, স্যার আপনি আমাদেরকে এতো আদর করেন বলে সাহস করে একটা দাবি জানাতে চাই। তিনি হেসে বললেন, কী বলতে চাও

বল। বললাম, স্যার! পরীক্ষা সামনে, পড়তে বসলে সন্ধ্যার পর ঘুমের জ্বালায় পড়তে পারি না। দয়া করে আমাকে এমন একটা ঔষধ দেন যাতে আমার ঘুম কমে। ডাক্তার সাহেব চোখের চশমাটি খুলে হাতে নিলেন। আমার দিকে এক মিনিট গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থাকলেন। আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। কাছে ডেকে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, বেটা! ঘুম কমাবার ঔষধ চাও, ডাক্তাররা কোনদিন ঘুম কমাবার ঔষধ দেয় না। ডাক্তাররা ঔষধ দিলে ঘুমাবার ঔষধই দেয়। আজকে তুমি আমার কাছে ঘুম কমাবার ঔষধ চাচ্ছো। একদিন আসবে যখন ডাক্তারের কাছে ঘুমাবার ঔষধ চাইবে। উপদেশের সুরে বললেন, পড়ার সময় ঘুম পেলে বাইরে গিয়ে একটু পায়চারী করবে, কারো সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলবে তাতেই ঘুম চলে যাবে।

১২.

সেকালের ঢাকা শহর

১৯৪০ সালে ঢাকায় ক্লাস নাইনে ভর্তি হওয়ার সময় ঢাকাকে যে অবস্থায় পেয়েছি তা ভালো করে দেখবার সুযোগ হলো যখন স্কাউট আন্দোলনে যোগদান করলাম। আমাদের স্কাউট মাস্টার ঢাকা শহরের একটা ম্যাপ তৈরির জন্য দায়িত্ব দিলেন। একটা এলাকা সার্ভে করার জন্য রাস্তাঘাটের ম্যাপ প্রয়োজন। এ কাজটি করতে গিয়ে সেকালের গোটা শহরের সব এলাকায় গিয়েছি। শহরটি তখন বিরাট ছিলো না। যদিও ঢাকার 'বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি' কথাটি প্রবচন হিসেবে চালু ছিলো।

আমি যখন রংপুর কলেজে শিক্ষকতা করি তখন ঐ এলাকার একটি ছেলে আমার বাসায় কাজ করতো। বয়স তার পনর-ষোল বছর। আমার বাড়ি ঢাকায় এ কথা জেনে সে খুব আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলো, স্যার! শুনেছি লোকেরা বলে, ঢাকা শহরের নাকি তলা নাই! সেখানে মফস্বল থেকে কেউ গেলে বাজারের পর বাজার, গলির পর গলি ঘুরে নাকি কোন কুল-কিনারা পায় না? ছেলেটির এ প্রশ্ন থেকে আমি ঢাকা সম্বন্ধে ঐ এলাকার একটা সাধারণ ধারণা পেলাম।

১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে মাওলানা মওদূদী (র) প্রথম ঢাকা আসলেন। ২০৫ নওয়াবপুর রোডের দোতলায় জামায়াতের প্রাদেশিক অফিস ছিলো। সিদ্দিক বাজারের 'কাওসার হাউস' নামের বাড়িতে শহর অফিস ছিলো। সে অফিসে যাতায়াত উপলক্ষে বংশাল, নাজিরা বাজার এসব জায়গায়ও তাঁকে যেতে হয়েছে। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, অফিস হিসেবে 'কাউসার হাউস' তিনি কেমন পছন্দ করেন। জওয়াবে বললেন, গলির পর গলি পার হয়ে এখানে আসতে হলো। এ সুন্দর বাড়িটা নওয়াবপুর রোডে নিয়ে যাওয়া যায় না? আরো বললেন, সাধারণত শহরে প্রধান রাস্তা কয়েকটি থাকে এবং দুই প্রধান রাস্তার মাঝখানে অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তাটিকে গলি বলা হয়। বড় রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকলে গলির শেষ মাথায় গিয়ে

আরেকটি বড় রাস্তা পাওয়া যায়। দুনিয়ার সবদেশেই শহরে এ রকমটা দেখা যায়। কিন্তু ঢাকায় দেখলাম একগলি থেকে আরেক গলি সেখান থেকে আরেক গলি, গলির পর গলি আসতেই থাকে। তার এ কথার পর আমি বললাম, ঢাকায় বড় রাস্তা শুধু দুটোই আছে– সদরঘাট থেকে নওয়াবপুর, আর একটা সদরঘাট থেকে চকবাজার। আদি ঢাকায় আর সবই গলি।

আমি ১৯৪০ সালের কথা বলছি। তখন ঢাকার আদি শহরের সীমানা ছিলো নিম্নরূপ।

শহরের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী। উত্তরে গেন্ডারিয়া রেলস্টেশন থেকে ফুলবাড়ীয়া রেলস্টেশন পার হয়ে হাতীরপুল পর্যন্ত। পূর্বে গেন্ডারিয়া ও ফরাশগঞ্জ, পশ্চিমে লালবাগ ও নওয়াবগঞ্জ। মাঝখানে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোর নাম– বখশীবাজার, চকবাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, সদরঘাট, বাংলাবাজার, কলতাবাজার, লক্ষ্মীবাজার, শ্যামবাজার, রায় সাহেব বাজার, শাঁখারী বাজার, তাঁতী বাজার, নওয়াবপুর, ঠাটারী বাজার, মৈশুণ্ডী, দয়াগঞ্জ, বংশাল, মালিটোলা, আর্মানী টোলা, নাজিরা বাজার, গোপীবাগ, টিকাটুলী, নারিন্দা ইত্যাদি। আরো বহু গলি ও বাজার আছে যা এ মুহূর্তে স্মরণে আসছে না। তবে হিসেব করলে 'বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি' হিসেব মিলবে কিনা জানা নাই।

১৯০৫ সালের পর ঢাকা শহর

১৯০৫ সালে পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা শহর উত্তর দিকে বর্ধিত হয়। নতুন ঢাকা ও পুরানা ঢাকার মাঝখানে গেন্ডারিয়া রেলস্টেশন থেকে ফুলবাড়ীয়া স্টেশন হয়ে হাতীরপুল পর্যন্ত। সেখান থেকে পিলখানা রোড আজিমপুর গোরস্তান পর্যন্ত।

রেল লাইনের উত্তরে রাজধানী ঢাকার জন্য সচিবালয়, আইন-সভা ভবন, গভর্নর হাউস, হাইকোর্ট ভবন, সচিবদের আবাস ইত্যাদি তৈরি হয়। বর্তমান সচিবালয় এলাকায় একটি দ্বিতল লম্বা দালান সচিবালয়ের জন্য , কার্জন হল আইন-পরিষদের জন্য, পুরানো হাইকোর্ট ভবন হাইকোর্টের জন্য, বর্তমান বঙ্গভবন ক্ষুদ্রাকারে গভর্নর হাউসের জন্য, মিন্টু রোড ও হেয়ার রোডে সচিবদের থাকার জন্য কোয়ার্টার তৈরি হয় এবং ব্যবহার করাও শুরু হয়।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারায়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হওয়ায় রাজধানীর উদ্দেশ্যে নির্মিত বিল্ডিং ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

হাইকোর্ট বিল্ডিং-এ ঢাকা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং সচিবালয়ের বিল্ডিং-এ ইডেন সরকারি মহিলা কলেজ কায়েম হয়। বর্তমান ফজলুল হক মুসলিম হল বিল্ডিং ঢাকা কলেজ হোস্টেল ছিলো।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়। এর জন্য যে বিরাট দ্বিতল বিল্ডিং তৈরি হয় সেখানে এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে সামরিক হাসপাতাল ছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের জন্য তৈরি হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং হিন্দু ছাত্রদের জন্য জগন্নাথ হল। কার্জন হলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার হল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর সচিবদের কোয়ার্টারগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে লাগে।

শেরেবাংলা ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশে ফজলুল হক মুসলিম হল শুরু হয় এবং এর প্রথম প্রভোস্ট হন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে শুরু হলেও এর আঘাত এ দেশে ১৯৪২ সালে অনুভূত হয় যখন ইংগ-মার্কিন মিত্র বাহিনী ঢাকা কলেজ ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে আস্তানা গাড়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন সামরিক হাসপাতালে পরিণত হয়।

১৯৪৭ সালে যখন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে পশ্চিম বঙ্গ ও ভারত থেকে পৃথক হয় তখন ঢাকা আবার প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পায়। ঢাকা কলেজ বিল্ডিং-এ আবার ঢাকা হাইকোর্ট এবং ইডেন মহিলা কলেজ বিল্ডিং আবার সচিবালয়ে পরিণত হয়।

১৯৪৮ সালে আমার চাচা জনাব শফিকুল ইসলামের উদ্যোগে আব্বা যখন রমনা থানার নিকট মগবাজারে জায়গা কিনেন তখন এ এলাকাটি অনাবাদী ছিলো। এখানকার আদিবাসীরা বাজার-সদাই করার জন্য চকবাজার, নওয়াবপুর, ঠাটারী বাজার যেতো। কোথায় যান জিজ্ঞেস করলে সবাই বলতো 'ঢাকা'। আমরা এখানে বসবাস শুরু করার পরও বেশ কয় বছর ঢাকা-ই যেতাম।

১৯৪৯ সালে এখানে বসবাস শুরু হলে দিনের বেলায়ও জবেহ্ করা মুরগি শিয়ালে নিয়ে যেতো।

১৯৪৭ পরবর্তী ঢাকা শহর

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার ফলে পাকিস্তান কায়েম হয়। আর বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানী হিসেবে গণ্য হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গের ফলে যে কয়টি বিল্ডিং তৈরি হয়েছিল তা একটি প্রাদেশিক রাজধানীর জন্য নগণ্যই ছিলো। বাংলাদেশের রাজধানী কোলকাতার সচিবালয়ে (রাইটার্স বিল্ডিং) কর্মরত মুসলমান সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং প্রায় সকল সরকারি অফিসের কর্মরত মুসলমানগণ, যাদের মধ্যে উর্দুভাষী ও বাংলাভাষী সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীই ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। পুলিশ ও রেল বিভাগে বাংলাভাষীর চেয়ে উর্দুভাষী বেশি ছিলো।

এতসব মানুষের থাকার জায়গা এবং অফিসের ব্যবস্থা করা এক বিরাট সমস্যা

ছিলো। তড়িঘড়ি করে নীলক্ষেত ও পলাশীতে মুলী বাঁশ দিয়ে বিরাট বিরাট ব্যারাক তৈরি করা হয়। আজিমপুরে চারতলা অনেকগুলো বিল্ডিং তৈরি করার ব্যবস্থা হয়।

এদিকে কোলকাতা ও ভারতের আরো বহু জায়গা থেকে মুসলমান ব্যবসায়ীরা ঢাকার হিন্দু ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পদ বিনিময় করে ঢাকায় ব্যবসা শুরু করে। বিহারে ব্যাপক দাঙ্গার ফলে মুসলমানরা বিরাট সংখ্যায় পূর্ববাংলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এভাবে হঠাৎ করে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ঢাকা শহর উত্তর দিকে দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে বিশেষ করে উর্দুভাষীদের আবাসভূমি গড়ে উঠে। শহরের বহু হিন্দু কোলকাতায় মুসলমানদের সঙ্গে বাড়ি বিনিময় করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে জড়িত হওয়ার ফলে শহরের সম্প্রসারণও সমান তালেই ঘটতে থাকে।

দেশ শাসনের সুযোগ যারা পেয়েছিলেন তারা ধানমন্ডি-গুলশান এলাকায় বড় বড় প্লটগুলো তাদের নামে বরাদ্দ নিয়ে আবাসিক এলাকা গড়ে তোলেন। সাথে সাথে ঐসব এলাকায় বড় বড় মার্কেটও গড়ে উঠে। এভাবেই নওয়াবপুর রেলক্রস নামে খ্যাত এলাকা থেকে উত্তর দিকে বহু দূর পর্যন্ত ঢাকা শহর সম্প্রসারিত হয়। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুরাতন ঢাকার তুলনায় নতুন ঢাকা পাঁচ-ছয় গুণ এলাকা দখল করে।

বর্তমান মগবাজার এলাকাটি তখন পুরোনো ঢাকা আর নতুন ঢাকার মাঝামাঝি বলে মনে করা হতো। মগবাজার এলাকাটি বেশ বড়ই বলতে হয়। এ মগবাজারের কিছু এলাকা বড় মগবাজার হিসেবে কেন পরিচিত তা আমার বুঝে আসে না। বড় মগবাজার থাকলে ছোট মগবাজারও থাকা উচিত। কিন্তু ছোট মগবাজার নামে এলাকা আছে বলে আমার জানা নেই। পুরনো ঢাকা শহরে বড় কাটারা যেমন আছে ছোট কাটারও তেমনি আছে। কিন্তু মগবাজারে শুধু বড় মগবাজারই আছে।

১৯৭১-এর পরের ঢাকা শহর

১৯৭১-এর ডিসেম্বরে ঢাকা শহর একটি স্বাধীন দেশের রাজধানীর মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই শহরের সম্প্রসারণ আরো দ্রুততর হয়। বর্তমানে ঢাকা শহর টঙ্গী পর্যন্ত বিস্তৃত বলা যায় এবং ক্রমেই জয়দেবপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে। বিদেশী দূতাবাসের বড় বড় অফিস এবং রাষ্ট্রদূতদের বাসভবন হিসেবে গুলশান-বনানী-উত্তরা ব্যাপকভাবে আবাদ হয়েছে। গত দশ বছরে নতুন শহরে বহু আকাশচুম্বী বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। অগণিত নির্মাণ কোম্পানি চারতলা থেকে দশতলা পর্যন্ত প্রতিযোগিতা করে ফ্লাট-বাড়ি তৈরি করছে।

ঢাকা শহর উত্তর দিকে যে গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে পূর্ব দিকে সে পরিমাণ (পূর্ব দিকে ফতুল্লাহ পর্যন্ত) না হলেও সেদিকেও সম্প্রসারিত হবে বলে মনে হয়। এভাবে ঢাকা শহর এখন পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোর মতো একটি শহর হিসেবে গড়ে উঠছে।

১৩.

ঢাকা শহরে আমাদের বাড়ি

ঢাকা শহরে আমার জন্ম হলেও আমাদের নিজস্ব কোনো জায়গা-জমি বা বাড়ি ছিলো না। ১৯৪০ সাল থেকে ৪৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছি। ৪৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর ৪৮ সাল পর্যন্ত চার বছর ফযলুল হক মুসলিম হলে ছিলাম। ১৯৪৮ সালে আমার ছোট চাচা জনাব শফিকুল ইসলাম সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি টিকাটুলীতে তারাবাগ নামে বাড়িতে দুটো কামরা নিয়ে বাসা ভাড়া নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ায় আমি হল ছেড়ে চাচার বাসায় উঠি। একই বিল্ডিং-এর অপর দুটো কামরা নিয়ে কবি সুফিয়া কামাল থাকতেন।

তারাবাগ নামক এ বাড়িটি বেশ বড় ছিলো। আমার এক মামার কোলকাতায় পার্ক সার্কাসে একটি বাড়ি ছিলো। তারাবাগে এ বাড়িটির মালিক ছিলেন এক হিন্দু। ৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সময় আমার মামাত ভাইয়েরা তাদের কোলকাতার বাড়ির বিনিময়ে তারাবাগের এ বাড়িটির মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ করেন। আমার মামা এর আগেই মারা যান। আমার মামী তাঁর ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে তারাবাগের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন।

১৯৪৮ সালে আমার চাচা জনাব শফিকুল ইসলাম আরো ৮/৯ জনের সঙ্গে শরীক হয়ে রমনা থানার নিকটে মগবাজারে এক হিন্দু জমিদারের ১৩ বিঘা আয়তনের একটি বাগান খরিদ করার ব্যবস্থা করেন। ঐ বাগানের মালিক ছিলো দু'ভাই। তাদের নাম রাজেন্দ্র কুমার দাস ও মনীন্দ্র কুমার দাস। তারা ঢাকা শহরের ফরাশগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। মগবাজারের বাগান বাড়িতে তারা থাকতেন না। কিন্তু বাগানে তাদের একটি চমৎকার বাংলো প্যাটার্নের বিরাট ঘর ছিলো। চৌচালা বিরাট ঘরটির চাল ও বেড়ার সকল কাঠ বার্মার বিখ্যাত টিক উড-এর ছিলো। মধ্যের হলঘরটির সেলিং খুব মিহিন শীতলপাটি দিয়ে তৈরি করা ছিলো এবং নানা রকম রঙিন রাংতা দিয়ে সাজানো ছিলো। আর চতুর্দিকে বেড়া ও ছাদের মাঝখানে চার ফুট প্রস্থ বিভিন্ন রঙের কাচ দিয়ে সাজানো ছিলো। এ ঘরটি জমিদার পরিবারের প্রমোদ ভবন নামে পরিচিত ছিলো। এ বাড়ির দারোয়ান মগবাজারেরই বাসিন্দা ছিলো। তার কাছে শুনেছি রাতে হলঘর যখন আলোকমণ্ডিত করা হতো তখন বেড়ার উপর রঙিন কাচ এবং উপরের সিলিং মিলিয়ে এমন এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হতো যে উপস্থিত সবাই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়তো। তারপর হলে যখন সুন্দরী তরুণীদের নাচ-গান শুরু হতো তখন গোটা বাগানে আনন্দের ফোয়ারা বয়ে যেতো।

বাগান বাড়ির অন্যান্য শরীক

তের বিঘা বাগান বাড়ি ৪৮ সালে কিনবার সময় যারা শরীক ছিলেন তাদের মধ্যে কেউ এক বিঘা, কেউ দু'বিঘা কিনেছেন। একমাত্র আমাদেরকেই তিন বিঘা নিতে হয়েছে। জায়গা কেনার এন্তেযামও আমার চাচাই করেছেন। জায়গা কেনার টাকা আব্বাকেই দিতে হয়েছে। আমার আব্বা তখন চান্দিনা থাকতেন। জায়গা কেনার জন্য চাচা যখন আব্বার কাছে টাকা চাইলেন তখন আব্বা বললেন যে, তোমাদেরকে ঘর ভাড়া করে থাকতে হচ্ছে, সেজন্যে এ ঘরটাসহ কিনলে আমি টাকা দেবো। অন্যান্য শরীকেরা বলল ঘরটাসহ নিতে হলে আপনাদেরকে তিন বিঘা নিতে হবে। এভাবে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে তিন বিঘা নিতে হয়েছে। আব্বা আরো বললেন, 'দু'বিঘার মূল্য দেবার পর আমার কাছে যে টাকা আছে তা হজ্জের জন্যে আমি রেখেছি। যদি ঘর পাওয়ার জন্য তিন বিঘা নিতেই হয় তাহলে হজ্জের টাকাটাও দিয়ে দিতে হবে। আমি এতেও রাজি আছি। কারণ ঘর করার জন্য আরো বেশি টাকা প্রয়োজন হবে। আমি না হয় ধার করেই হজ্জে যাবো। তবুও ঘরসহ জায়গা কিনতে চাই।' আরো আট শরীক যারা আমাদের সাথে জায়গা কিনেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীকালে জায়গা বিক্রি করে দিয়েছেন। যারা বিক্রি করেছেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইসলামী সঙ্গীত-সম্রাট ও মুসলিম জাগরনীর প্রখ্যাত গায়ক আব্বাস উদ্দীন। তিনি তাঁর জায়গাটুকু কয়েক বছর পরেই বিক্রি করে দেন। শরীকদের মধ্যে যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন তাদের কেউ আর এখন বেঁচে নেই। বেঁচে না থাকলেও তাদের সন্তানেরা এখনো আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফরিদপুরের বিখ্যাত জমিদার ও রাজনীতিবিদ জনাব মোহন মিয়ার ভাই তারা মিয়া। তারা যে ৪ তলা বিল্ডিং করেছিলেন তা ভেঙে বর্তমানে নির্মাণ কোম্পানিকে ৯ তলা বিল্ডিং করার জন্য দিয়েছেন।

আর একজন হলেন কিশোরগঞ্জের ইঞ্জিনিয়ার জামান সাহেব, যার ভগ্নীপতি ছিলেন জেলখানায় নিহত আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তিনি ঢাকায় আসলে কোনো হোটেলে থাকতেন না। তার সম্বন্ধীর এ বাড়িতে এসে উঠতেন। তাই তার সঙ্গে ঢাকায় আসলেই দেখা হতো। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি আমার বন্ধু। ৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপের সময়েও তার সঙ্গে আলাপ হতো।

শরীকদের মধ্যে আর একজন ছিলেন হাইস্পীড নেভিগেশন নামে বিখ্যাত শিপিং কোম্পানির মালিক জনাব মাহমুদুর রহমানের পিতা জনাব খোন্দকার মুহাম্মদ সাদেকুর রহমান। সাদেক সাহেব এককালে আমার শিক্ষক ছিলেন। তখন তিনি আর্মানীটোলা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আমি তাঁর কাছে অংক ও ইংরেজি প্রাইভেট পড়তাম।

পরবর্তীকালে যারা অন্যের কাছ থেকে জমি খরিদ করেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ইঞ্জিনিয়ার আবুল ফয়েজ সাহেব, যার স্ত্রী প্রাক্তন মন্ত্রী বেগম রাজিয়া ফয়েজ।

তাদের দ্বিতল ভবনটিও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। নির্মাণ কোম্পানি ২০০১ সালে নির্মাণ কাজ শুরু করেছে।

সেকালের জমির মূল্য

প্রতি বিঘা জমির মূল্য ছিলো আড়াই হাজার টাকা। আমাদের তিন বিঘার মূল্য ছিলো সাড়ে সাত হাজার টাকা। আর ঘরটির মূল্য ধরা হয়েছিল দেড় হাজার টাকা। সর্বমোট নয় হাজার টাকায় আমরা ঘরসহ তিন বিঘা জায়গা খরিদ করি। ৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা যখন ঘর দখল করি তখন মূল্যবান কাঠের দরজা একটাও ছিলো না। হলঘরের চারপাশে যে রঙিন কাচগুলো ছিলো সেগুলোও ছিলো না। পাকিস্তান হওয়ার পর জমির মালিকেরা কোলকাতায় চলে যান এবং এটা অনাবাদীই পড়ে থাকে। দারোয়ানও বেতন না পাওয়ায় পাহারার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করেনি। যার ফলে ঘরের অনেক কিছু লুট হয়ে যায়। দরজা-জানালা তৈরি করতে আমাদের মাত্র এক হাজার টাকা ব্যয় হয়। তিন বিঘা জমি, ঘর এবং এর মেরামত সর্বসাকুল্যে দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

বর্তমানে এ জায়গার মূল্য প্রতি কাঠা বিশ লাখ টাকা। প্রতি বিঘা আড়াই হাজার টাকা মূল্যের জমি দাম বেড়ে এখন চার কোটিতে পৌঁছেছে। আমার এক ভাইয়ের জায়গা বিক্রি হয়েছে। এ দামেই গ্রাহক পাওয়া গেলো।

আমরা যখন বসবাস শুরু করি

ঘর মেরামত করার পর ১৯৪৯ সালের মার্চ কি এপ্রিল মাসে আমরা এখানে এসে উঠি। এ বড় ঘরটির চারিদিকেই প্রশস্ত বারান্দা ছিলো এবং চার কোণায় চারটি কামরা ছিলো। বড় ঘরের পাশে জমিদারদের একটি পাকঘর ছিলো। সেটিও একই মানের কাঠ ও টিনের তৈরি। বাড়িটির উদ্বোধন করার জন্য একটি দোয়ার অনুষ্ঠান করা হয়। আমাদের অন্যান্য শরীকরা এখানে কেউ থাকতেন না বলে দোয়ার অনুষ্ঠানে কাউকে শরীক করা সম্ভব হয়নি। তবে সৌভাগ্যবশত গায়ক আব্বাস উদ্দীন তার কেনা জমিটি দেখতে এসেছিলেন বলে তিনি এ দোয়ার অনুষ্ঠানে শরীক ছিলেন। তার সাথে অল্প বয়সের তার একটি ছেলেও ছিলো।

তের বিঘার গোটাটাই একটা বিরাট বাগান ছিলো। এতে অনেক ফলের গাছ ছিলো। সবচেয়ে বেশি ছিলো আম ও কাঁঠাল গাছ। এমনকি ফজলী আম এবং কাঁচামিঠা আমের গাছও ছিলো। এ ছাড়া অনেক পেয়ারা ও সফেদা গাছ ছিলো আর ছিলো লিচু, কামরাঙ্গা, আমলকি, জলপাই, গোলাপ-জাম ইত্যাদি।

আমরা যখন এ বাড়িতে বসবাস শুরু করি তখন অযত্নে গোটা বাগানটি একটি জঙ্গলে পরিণত হয়েছিলো। এক জাতীয় জংলী গাছ, যার নাম আমার মনে নেই ৮/১০ হাত উঁচু ছিলো। লাকড়ীর জন্য উপযোগী ছিলো। আমরা কেটে রেখে দিতাম। কাটার কয়েকদিন পরেই এগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতো। যেহেতু শরীকদের

কেউ ঘর তুলে থাকা শুরু করেনি সেহেতু গোটা বাগানটিই বলতে গেলে আমাদের দখলে ছিলো।

গোলাকৃতি বাগানটির মাঝখানে ২২ ফুট প্রস্থ ও পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি রাস্তার জন্য জায়গা রাখা হয়। এ রাস্তার উত্তর ও দক্ষিণ পাশে শরীকদের জন্য প্লট বরাদ্দ করা হয়।

ঐ তের বিঘা বাগানের বর্তমান অবস্থা

ঐ বাগান বাড়িটি বর্তমানে দালান কোঠায় ভর্তি। আমরা কেনার সময় চারা গাছ ছিলো এমন দুটোর একটি আম গাছ আমার এক ভাইয়ের প্লটে এখনো আছে। আর একটি আমার প্লটে ছিলো যা বিল্ডিং করার প্রয়োজনে ১৯৯৬ সালে কেটে ফেলা হয়েছে। মূল বাগানের একটি গাছও অবশিষ্ট নেই। এ তের বিঘা জায়গাটি একটি পৃথক মহল্লা হিসেবে গড়ে উঠেছে। চারদিকে দেয়াল থাকায় ভিতরের রাস্তাটিও একদিকে বন্ধ। মহল্লার অধিবাসীদের গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি যাতায়াতের উদ্দেশ্যে এ মহল্লায় ঢুকে না। ফীলখানা থেকে হাতি সড়ক (এলিফ্যান্ট রোড) নামে প্রাচীন যে রাস্তাটি পরীবাগ ও রমনা থানার পাশ দিয়ে মধুবাগ গিয়েছে সে রাস্তা থেকেই এ মহল্লায় প্রবেশ করতে হয়। মহল্লার এ রাস্তাটি যেহেতু 'পাবলিক থরোফেয়ার' নয় সেহেতু মহল্লাবাসীরা নিরাপত্তার প্রয়োজনে রাস্তার প্রবেশ পথে একটি বিরাট গেট তৈরি করেছে। গেটে সার্বক্ষণিক প্রহরী থাকে।

মোগল শাসনামলে ফীলখানায় হাতির সরকারি আস্তানা ছিলো। সেখান থেকে হাতিকে গোসল করাবার জন্য যে পথ দিয়ে বর্তমান মধুবাগ আনা হতো এ দীর্ঘ সড়কটি হাতির সড়ক নামেই খ্যাত ছিলো। 'ফীল' আরবী শব্দ। এর অর্থ 'হাতি'। সে কারণেই এর নাম ছিলো 'ফীলখানা'। ফীলখানা মানে হাতির আস্তানা। এ ফীলখানাকেই বর্তমানে পীলখানা বলা হয়। মধুবাগের পরে নিম্ন জলাভূমিতে হাতিকে গোসল করানো হতো। সে কারণে এ জলাভূমির নাম ছিলো হাতিঝিল। আমরা মগবাজারে আসার পর হাতিঝিল কথাটি এলাকাবাসীদের কাছে শুনেছি।

আমাদের এ মহল্লাটির কোনো নাম ছিলো না। এ এলাকার বাড়িগুলোতে মিউনিসিপ্যালিটির নম্বর তখনও লাগেনি। চিঠিপত্রের ঠিকানা হিসেবে পোস্ট অফিসের সুবিধার জন্য অনেক কথা লিখতে হতো। কারণ মগবাজার এলাকাটি বিরাট। ১৯৫৩ সালে আব্বা চান্দিনা থেকে ঢাকায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হিসেবে বদলী হয়ে আসেন। গলির মাথায় হাতির সড়কে কাজী অফিসের সাইনবোর্ড লাগানো হলো। এরপর থেকে এ গলিটি 'কাজী অফিস লেন' নামে পরিচিত হয়। যেহেতু বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে সবাইকেই কাজী অফিসে যাতায়াত করতে হয়, সে কারণেই ঢাকার যে কোনো স্থান থেকে 'মগবাজার কাজী অফিস লেন' বললে রিক্সাওয়ালারা সহজেই পৌঁছিয়ে দেয়।

১৯৬৮ সালে আব্বা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং আমার ছোট ভগ্নীপতি মাওলানা পীরজাদা কাজী সৈয়দ শরীয়তুল্লাহ্ ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হন। এখনো ঐ অফিসটি এ পাড়াতেই রয়েছে। তাই 'কাজী অফিস লেন' নামটি স্থায়ী হয়েই আছে।

বর্তমানে এ পাড়াতে বহুতল বাড়ি বানানোর হিড়িক পড়ে গেছে। দ্বিতল, ত্রিতল বাড়িগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে বহুতল করা হচ্ছে। ফলে তের বিঘার ছোট্ট মহল্লাটির ফ্ল্যাট বাড়িতে যারা থাকেন তাদের অনেকেই গাড়ির মালিক। কয়েকটি বাড়িতে কারপার্ক থাকা সত্ত্বেও রাতে রাস্তার পাশে গাড়ি সারিবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। এ কারণেই নতুন বহুতলবিশিষ্ট বাড়ির নির্মাতারা আন্ডারগ্রাউন্ডেও কারপার্ক নির্মাণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

ঢাকা রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও সর্বত্রই সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য কায়েম আছে। আল্লাহর ফজলে আমাদের মহল্লার অধিবাসীরা এ বিষয়ে সতর্ক থাকার কারণে আমরা এ উপদ্রব থেকে বেঁচে আছি। এখানে কেউ বাড়ি করতে চাইলে কাউকে চাঁদা দিতে হয় না। মহল্লাবাসীদেরকে সন্ত্রাসীদের দাপট সহ্য করতে হয় না। এ মহল্লার অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়, সকল মহল্লাবাসীই এলাকার নিরাপত্তার প্রয়োজনে সংগঠিত হলে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের জুলুম থেকে রেহাই পেতে পারে। তাদের সংখ্যা বেশি নয় কিন্তু তারা সংগঠিত। মহল্লাবাসীরা সংগঠিত হলেই তাদের থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

সরকারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো সহায়তা আশা করা অর্থহীন। কারণ সন্ত্রাসীরা সরকারি দলের গড ফাদারদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই টিকে থাকে এবং পুলিশের হয়রানি থেকে দূরে থেকে নিরাপদে সন্ত্রাস চালিয়ে যায়।

১৪.

ভাই-বোনদের মধ্যে জমি বণ্টন

আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যাম ১৯৬০ সালে আলাদা ঘর করে থাকার প্রয়োজন বোধ করলো। ৪৮ সালে জায়গা কেনার সময় জমিদারের বিরাট প্রমোদ ভবনটি আমাদের অংশে পড়লেও ইতোমধ্যে ছোট চাচা, আমি ও ডা. গোলাম মুয়ায্যাম বিয়ে করায় স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। একদিকে ছোট চাচারও সন্তান হওয়ায় পৃথক ঘরের প্রয়োজন দেখা দিলো। তখন আব্বা তিন বিঘা জায়গার মধ্যে ১৪ কাঠা জায়গা ছোট চাচাকে দান করে দিলেন। এক কাঠা পারিবারিক গোরস্থানের জন্য রাখলেন। বাকি জায়গাটুকু আমরা চার ভাই ও আমার মৃত বোনসহ চার বোনের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। আমরা চার ভাই ও পাঁচ বোন। বোনদের মধ্যে দ্বিতীয় বোন নূরুন্নাহার বিবাহযোগ্য বয়সে নিউমোনিয়া হয়ে চান্দিনাতেই মারা যায়। সেখানকার মোকামবাড়ী ঈদগাহ ময়দান সংলগ্ন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আমি ও ডা.

গোলাম মুয়ায্যামের পরে শামসুন্নাহার নামে আমার যে বোনটি ছিলো সে ৫টি সন্তান রেখে মগবাজারেই মারা যায়। বোনদের মধ্যে সেই বড় ছিলো। বাড়ির জমি বন্টনের পূর্বেই বাড়ির এক কোণায় এ বোনকে কবরস্থ করা হয়। সে জায়গা থেকেই কবরস্থানের জমি চিহ্নিত করা হয়। আব্বা তাঁর কন্যা বেঁচে থাকলে যেটুকু জমি পেতো সেটুকু তার পাঁচ নাতি-নাতনীর জন্যে লিখে দেন। একেক ভাইয়ের জন্যে সাড়ে সাত কাঠা এবং বোনদের ভাগে সোয়া তিন কাঠা জমি পড়ে।

জায়গা ভাগ করার সময় আমাকে নিয়ে আব্বা একটু সমস্যায় পড়লেন। আমার ভাইদের ডেকে বললেন, তোমাদের একজন ডাক্তার, দুই জন ইঞ্জিনিয়ার; তোমরা ভালো চাকরিও করছো। তোমাদের জায়গায় তোমরা ঘর করার জন্য উদ্যোগও নিচ্ছো। কিন্তু তোমাদের বড় ভাই চাকরি ছেড়ে ইসলামী আন্দোলনের যে পথে আত্মনিয়োগ করেছে তাতে তার পক্ষে ঘর করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই তোমাদের আপত্তি না থাকলে পুরানো ঘরটি যেখানে আছে সে জায়গাটাই তার নামে বরাদ্দ করতে চাই। ভাইয়েরা সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি দিলো। কিন্তু দেখা গেলো, যে পরিমাণ জায়গা ঘরটি দখল করে আছে তার সবটুকু আমার ভাগে পড়ে না। আমাদের ভাগের জমিটুকু পাশে মাত্র চল্লিশ ফুট আর লম্বায় একশ' সাইত্রিশ ফুট। দেখা গেলো যে, ঘরটির তিন ভাগের দু'ভাগ আমার ভাগে ফেলা যায়। আর একভাগ আরেক ভাইয়ের জায়গায় পড়ে।

এভাবে জমি ভাগ করে দেওয়ার পর আমার ছোট ভাই মুয়ায্যাম প্রথমে তার প্লটে দালান নির্মাণ শুরু করে। এরপর আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিয়ার গোলাম মুকাররাম তার প্লটে বিল্ডিং উঠায়। আব্বা আমার তৃতীয় বোন আনোয়ারার প্লটটি তখন বাজার দর অনুযায়ী দাম ধরে (সম্ভবত চল্লিশ হাজার টাকা) সে টাকা দিয়ে মোমেনশাহী শহরে বাড়ি করার ব্যবস্থা করে দেন। আমার ভগ্নীপতি এডভোকেট মসিহুর রহমান ঐ বাড়িতে থেকে আইন ব্যবসা চালু রাখেন।

আমার বাসস্থান সংস্কার

আমার আদি ঘরটিতে আমার পরিবার ছাড়াও চাচাত ভাই ও চাচাত বোন কয়েকজন বসবাস করতো। একাংশে আব্বা ও আম্মা থাকতেন। ৭১-এর নভেম্বরের শেষ দিকে আমি জামায়াতে ইসলামীর কর্ম পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য লাহোর যাই। ৩ ডিসেম্বর করাচী থেকে পিআইএ বিমানযোগে ঢাকা রওয়ানা হই। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই ভারতের বিমান বাহিনী ঢাকা বিমান বন্দরে বোমা বর্ষণ করে। যার ফলে দেশে আমার ফিরে আসা সম্ভব হয়নি।

১৯৭৮ সালের ১১ জুলাই আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবনের শেষে ঢাকায় ফিরে আসি। এ সময়ে ঐ টিনের ঘরটিতে আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন বসবাস করতেন।

আমার প্লটের দক্ষিণ প্রান্তে দেয়ালের উপর টিন দিয়ে কাজী অফিস করা হয়েছিলো। সেই ঘরটিকে আমার বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করি। আমার ছোট ভগ্নীপতি তার কাজী অফিস অন্যত্র সরিয়ে নেন।

আগেই বলেছি, আদি ঘরটি দিয়ে গেলেও এর তিন ভাগের এক ভাগ আমার সবচেয়ে ছোট ভাই ড. মাহদীউয্যামান-এর প্লটে পড়েছিলো। তাই ঘরের ঐ অংশটি খুলে ফেলে আদি ঘরটি ছোট করতে হয় এবং ঐ অংশের চাল ও বেড়া দিয়ে বৈঠকখানা ও মূল ঘরের মাঝে আরও একটি ঘর তৈরি করা হয়। এভাবে আমার থাকার বন্দোবস্ত করে নেই। আমার ছয় ছেলের মধ্যে তখন তিনজন বিদেশে থাকায় কোন রকমে আমাদের বসবাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয়ে যায়।

আমার প্লটে বিল্ডিং তৈরির প্ল্যান

১৯৯৪ সালের শেষদিকে আমার বড় ছেলে আব্দুল্লাহিল মামুনকে ইসলামী আন্দোলনের দিক দিয়ে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে লন্ডনের একটি ভালো চাকরি ছেড়ে দেশে আসতে রাজি করি। কিন্তু দেশে তাকে বেশিদিন রাখা সম্ভব হয়নি। সে কয়েক বছর আগেই জেদ্দায় ইসলামী ডেভলাপমেন্ট ব্যাংকে দরখাস্ত দিয়ে রেখেছিলো। ৯৬ সালেই সেখানে তার ভালো চাকরি জুটে যায়। সে চাকরির ধরন ও বেতনের পরিমাণ এমন ছিলো যে, তাকে আর দেশে আটকিয়ে রাখা গেলো না।

কিন্তু জেদ্দা যাওয়ার আগে ঢাকা থাকাকালেই সে আর্কিটেক্ট দিয়ে আমার সাড়ে সাত কাঠা জমির উপরে বিল্ডিং তৈরি করার প্লান তৈরি করলো। আমাকে প্লান দেখাতে যখন চাইলো তা দেখতে কোন আগ্রহই প্রকাশ করলাম না। আমি বললাম, আমি যদ্দিন বেঁচে আছি বাড়ি এ অবস্থায়ই চলুক, তোমরা ভবিষ্যতে যখন বিল্ডিং করতে পারবে তখন করবে। আমি এখন প্লান দেখে আর কী করবো! সে যতদিন ঢাকায় ছিলো আমার বাড়ির পাশেই আমার বোন জাহানারা আজহারীর দোতলায় ভাড়াটে হিসেবে ছিলো।

যেহেতু সুদের কারণে হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশন থেকে টাকা নিয়ে বিল্ডিং করা সম্ভব নয়, আর ইসলামী ব্যাংক যে পদ্ধতিতে বাড়ি করার জন্য টাকা দেয় সে পদ্ধতিটাও খুব ভালো লাগছিলো না, তাই প্লান নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয়নি।

মামুন জেদ্দা যাওয়ার পর সে আমার উপর চাপ দিলো যে সে এবং তার স্ত্রী লন্ডনে চাকরিরত থাকাকালে যে টাকা সঞ্চয় করতে পেরেছে সে টাকা দিয়ে প্লান অনুযায়ী বিল্ডিং তৈরি শুরু করা হোক। তখন আমি প্লান দেখে জানতে পারলাম, দশতলা বিল্ডিং-এর প্লান করা হয়েছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে কারপার্ক থাকবে। এরপর ধীরে ধীরে যে কয়টা ফ্ল্যাট তৈরি করা যায় তৈরি হবে। আমি বললাম, 'তুমি যে টাকা খরচ করতে পারছো তা ফাউন্ডেশনেই খরচ হয়ে যাবে।' এরপরও সে জানালো 'একটা ফ্লোর তৈরি করার জন্য যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন তা আমার বর্তমান চাকরির সেভিংস থেকে না কুলালে আমি ধার করে হলেও যোগাড় করবো। তবু অন্তত একটি

ফ্ল্যাট তৈরি হোক।' সে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে তার এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলো যে, শেষ বয়সে আব্বা-আম্মা একটু আরামে থাকুন এটাই আমি চাই। তার এই আবেগের কারণে তার আম্মাও আমার উপরে চাপ সৃষ্টি করলেন। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিল্ডিং-এর কাজে হাত দিতে সিদ্ধান্ত নিলাম। মামুনের পরিবার জেদ্দা চলে যাওয়ায় তার ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটটিতে আমি স্থানান্তরিত হলাম।

বিল্ডিং-এর কাজ শুরু হলো

শুধু টাকা পেলেই আপনা-আপনি বিল্ডিং হয়ে যায় না। কন্ট্রাক্টর দিয়ে কাজ করালেও মালিকের পক্ষ থেকে সব সময় দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ ব্যাপারে আমার তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সংগঠনের যে বিরাট দায়িত্ব আমার উপরে ছিলো সে কারণে দেখাশোনার কোনো দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। ঠিক ঐ সময় আতাউর রহমান নামে এক রুকনকে দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করার জন্য পাওয়া গেলো। সে তরুণ বয়সেই জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসে কর্মরত ছিলো। ১৯৭৮ সালে আমার দেশে ফিরে আসার পর যখন আবারও সাংগঠনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তখন জামায়াতের পক্ষ থেকে আমার এটেন্ডেন্ট হিসেবে আতাউর রহমানকে দেওয়া হয়। সে একটানা এগারো বছর আমার এটেন্ডেন্ট থাকাকালেই জামায়াতের রুকন হয়। তার আচার-ব্যবহার, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের কারণে আমি তাকে ছাড়তে চাইনি। সেও আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হয়নি। আমি তাকে ছেলের মতো স্নেহ করতে বাধ্য হই। আমার সঙ্গে যারা সাক্ষাৎ করতে আসতেন তারাও তার হাসিখুশী সুন্দর চেহারা ও শিষ্ট আচরণে সন্তুষ্ট হতেন। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতেন, সে আমার ছেলে কিনা। জওয়াবে আমি বলতাম যে, সে আমার ছেলে না হলেও আমি তাকে ছেলের মতোই মনে করি এবং সেও আমাকে তার পিতার মতো মনে করেই খেদমত করে।

কিন্তু বিয়ে করার পর সে বাসা নিয়ে যখন থাকতে বাধ্য হলো এবং কিছুদিন পর যখন সন্তান হলো তখন সংগঠন থেকে দেওয়া বেতনে তার পক্ষে চলা অসম্ভব হয়ে পড়লো। সে আমার গাড়ির ড্রাইভারও ছিলো। তাই তাকে ড্রাইভার হিসেবে চাকরি নিয়ে সৌদি আরব যেতে দিতে বাধ্য হলাম। সে সৌদি আরবে প্রায় চার বছর থাকার পর দেশে ফিরে এসে ঔষধের দোকান দিয়ে চলার চেষ্টা করলো। কিন্তু তা দ্বারা তার প্রয়োজন পুরা হলো না। ইতোমধ্যে আমার ছেলেরা তাদের মায়ের জন্য একটা কার কিনে দিলো। পুরাতন ড্রাইভার হিসেবে আতাকে পেয়ে আমার স্ত্রী খুশি হলেন। এর কয়েক মাস পর বিল্ডিং তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয় এবং দেখাশুনার দায়িত্ব আতার উপরই অর্পণ করা হয়।

প্রথমে এক কন্ট্রাক্টর দিয়ে কাজ করানো হয় এবং ৬ মাসের মধ্যেই সাড়ে তিন কাঠা জমির উপরে দশতলা ফাউন্ডেশন করার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে প্রথম ছাদটি তৈরি হয়ে যায়।

মামুনের ধারণা ছিলো ১৫/১৬ লাখ টাকাতেই ফাউন্ডেশনের উপর একটা ফ্লাট তৈরি করা সম্ভব হবে। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেলো ফাউন্ডেশনের উপরে একটি ছাদ পর্যন্তই ১৫ লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ঠিক সে সময় আমার যে ছেলেটি সেনাবাহিনীর মেজর সে এক বছর বিদেশ থাকার কারণে মোটা অংকের বেতন পেয়েছে। সে তার সঞ্চয় ছয় লাখ টাকা দিলে কাজ চালু হলো। কিন্তু তাতেও একটি ফ্লাট সম্পূর্ণ তৈরি করা সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়ে ব্যাংকের নিকট ধরনা দিতে হলো।

হাউস বিল্ডিং-এর জন্য যে পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক টাকা দেয় বলে জানতাম তাতে আমার এবং মামুনের এতমিনান ছিলো না। তাই পূর্বে ব্যাংকের সহযোগিতা চাইনি। কিন্তু যখন ব্যাংকের সহযোগিতা ছাড়া নির্মাণ কাজ অচল হয়ে পড়লো তখন ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া কাউন্সিলের সেক্রেটারী মাওলানা সাইয়েদ কামালউদ্দীন জাফরী সাহেবের সাথে পরামর্শ করলাম।

যে নিয়মে সাধারণভাবে ব্যাংক নির্মাণ কাজে অর্থ সরবরাহ করে তা নিম্নরূপ।

নির্মাণ সামগ্রী ব্যাংক কিনে দেয় এবং ব্যাংক থেকে বাজার-দরের অতিরিক্ত দামে কিনতে হয়। সকল ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া কাউন্সিল এ পদ্ধতিকে বৈধ মনে করলেও এতে আমার এতমিনান হয়নি। মাওলানা জাফরী সাহেব জানালেন যে আরো একটি পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতিতে তিনিও ইসলামী ব্যাংক থেকে সহযোগিতা নিয়েছেন। সে পদ্ধতি হচ্ছে বিল্ডিং তৈরি হতে মোট যে খরচ এর এক-তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ জমির মালিককে জোগাড় করতে হয়। বাকি টাকা দিয়ে ব্যাংক নির্মাণ কাজে শরীক হবে। নির্মাণ কাজ সমাধা করার পর জমির মালিক বিল্ডিংটি ব্যাংক থেকে ভাড়া নেবে। জমির মালিক নির্মিত ফ্লাটগুলো ভাড়া দিয়ে যে আয় করবে তা থেকে ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত টাকা এবং এর ১৫% টাকা হারে ভাড়া হিসাবে ব্যাংককে ১৫ বছরের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। এভাবে আয় থেকে দায় শোধ করা হয়ে গেলে জমির মালিক ব্যাংক থেকে দায়মুক্ত হয়ে বাড়ির পূর্ণ মালিকানা ভোগ করতে পারবে।

এ পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো। প্রথমে যে সাড়ে তিন কাঠা জায়গায় ফাউন্ডেশন দেওয়া হয়েছিল সেটুকুতে তিন বেডরুম ও চার বাথরুমবিশিষ্ট সাতটি ফ্ল্যাট ব্যাংকের সহযোগিতায় তৈরি হলো। ফাউন্ডেশন দশতলা হলেও ৮ তলা পর্যন্ত করেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে কারপার্কই থাকলো। এ সাতটি ফ্ল্যাটের মধ্যে একটিতে আমি থাকি। বাকিগুলো ভাড়া দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে একেকটা ফ্ল্যাট তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই ভাড়াটে পাওয়া গেলো। এক বছর পরেই ব্যাংকের দেনা মাসিক কিস্তিতে শোধ করা শুরু হলো। আমার মোট সাড়ে সাত কাঠা জায়গার মধ্যে তখন পর্যন্ত চার কাঠা জায়গা খালি পড়েছিলো। সবাই পরামর্শ দিলো এ এলাকাটি অনেক কারণে ভাড়াটেদের জন্য পছন্দনীয়। তাই

বাকিটুকুতেও ব্যাংকের সহযোগিতায় বিল্ডিং করে ফেলুন। এ বিষয়ে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা হলে ব্যাংকও বিনিয়োগ করতে সম্মত হলো।

আল্লাহর মেহেরবানীতে ইসলামী ব্যাংকের সহযোগিতায় সাড়ে সাত কাঠা জায়গায় নির্মাণ কাজ ২০০০ সালের মার্চ মাসেই সম্পন্ন হয়ে গেলো। গ্রাউন্ড ফ্লোর ছাড়া মোট সাতটি ফ্লোরের প্রত্যেকটিতে তিনটি করে ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে। প্রথম কিস্তিতে তিন বেডরুম ও চার বাথরুমওয়ালা ফ্লাট সাতটি এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে প্রতি ফ্লোরে ২টি করে দুই বেডরুম ও তিন বাথরুমবিশিষ্ট দুটি করে ফ্ল্যাট-এভাবে সর্বমোট একুশটি ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে।

২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে দ্বিতীয় কিস্তিতে নির্মিত বিল্ডিং বাবদ ব্যাংকের দেনা শোধ করা শুরু হয়েছে। ব্যাংকের 'আয় থেকে দায় শোধ'-এর স্লোগানটি খুবই চমৎকার। যদি ফ্ল্যাটগুলোর কোনটা খালি না থাকে এবং ভাড়াটে পেতে দেরি না হয় তাহলে এ স্লোগানটি সার্থক বলে বুঝা যায়। কিন্তু যদি কোন ফ্ল্যাট এক মাস খালি থাকে তাহলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় সে ক্ষতি জমির মালিককেই বহন করতে হয়। এ ক্ষতিতে ব্যাংক শরীক হয় না।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেলো ছোট ফ্ল্যাটগুলো খালি থাকে না। মাঝে মাঝে বড় ফ্ল্যাট খালি হয়ে গেলে ছোট ফ্লাটের মতো সহজে ভাড়াটে পাওয়া যায় না। বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস মেন্টেনেন্স ছাড়া বর্তমানে বড় ফ্ল্যাটের ভাড়া প্রতি মাসে ১৫ হাজার, মধ্যের ছোট ফ্ল্যাট দশ হাজার এবং শেষ দিকের ছোট ফ্ল্যাটটিতে অতিরিক্ত বারান্দা থাকার কারণে এগারো হাজার টাকা।

যদি কোনো ফ্ল্যাট কোনো মাসে খালি না থাকে তাহলে যে ভাড়া উঠে তাতে ব্যাংকের মাসিক কিস্তি দিতে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু যদি কোনো ফ্ল্যাট খালি থাকে তবে কিস্তি শোধ করতে টাকায় কুলায় না। এ অবস্থায় ছেলেদের থেকে চাঁদা করে ভর্তুকি যোগাড় করতে হয়।

ব্যাংকের সহযোগিতায় বাড়ি করে ভাড়া দিয়ে ব্যাংকের দেনা শোধ করার ঝামেলায় না যেয়ে কোনো নির্মাতা কোম্পানিকে বাড়ি করার দায়িত্ব দিলে এ ঝামেলা পোহাতে হয় না। তাই আজকাল প্রায় সবাই নির্মাতা কোম্পানিকেই দিয়ে দেওয়া নিরাপদ মনে করে। আমার ছেলেরা এটাকে নিরাপদ মনে করে না। কারণ যে ক'টা ফ্ল্যাট নির্মাতারা নিবে সেগুলো তারা যে কারো কাছেই বিক্রি করতে পারে। ফলে এমন অবাঞ্ছিত লোকও ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে যেতে পারে যাদের সাথে একই বিল্ডিং-এ বসবাস করা সুখকর নাও হতে পারে।

ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বাড়ি করার সামান্য চিন্তাও আমার ছিলো না। আমি বাকি জীবন টিনের ঘরেই কাটিয়ে দিবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিভাবে এ চক্করে পড়ে গেলাম তা উপরে উল্লেখ করেছি। আমি দালান-

কোঠা করতে পারবো না এ ধারণা থেকে আব্বা তাঁর কেনা টিনের ঘরটি আমাকে দিয়ে গেলেন। যদি ইসলামী ব্যাংক না থাকতো তাহলে বিল্ডিং করা কখনো সম্ভব হতো না। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যেন ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সহী দীনী জযবা নিয়ে ব্যাংককে আরো উন্নত করতে সক্ষম হোন, যাতে আমার মতো যারা সুদ থেকে বেঁচে থাকতে চান তাঁরা বাড়িঘর নির্মাণ করতে সক্ষম হন। এ কথা ভাবতেও আমার ভালো লাগে যে, আমি প্রতিমাসে ব্যাংকের মূলধন পরিশোধ করার সাথে সাথে প্রতিমাসে একটা ভালো অংক লাভ হিসেবে দিতে পারছি। আমি সবার কাছে দোয়া চাই, যাতে ব্যাংকের কিস্তি শোধ করায় কোনো সমস্যায় না পড়ি এবং যথাসময়ে ব্যাংকের দেনা শোধ করতে সক্ষম হই। আমার দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর আমার উত্তরাধিকারীদেরকে যেনো কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়।

আমি এ বিল্ডিং সম্পর্কে অসিয়তনামা লিখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ঐ অসিয়ত অনুযায়ী ব্যাংকের দেনা শোধ হওয়ার পর একটি বড় ফ্ল্যাট ইসলামী আন্দোলনের জন্য বরাদ্দ থাকবে। এটা আমার আন্তরিক কামনা, যিনিই জামায়াতে ইসলামীর আমীর থাকুন তিনি যেন এ বাড়িতেই থাকেন। যদি কোনো কারণে এ বাড়িতে থাকা না হয় তাহলে এ ফ্ল্যাটের ভাড়া কেন্দ্রীয় বাইতুলমালে জমা হবে। আল্লাহ তাআলা যেন এটুকু সদকায়ে জারিয়া মেহেরবানী করে কবুল করেন, সবার কাছে এ দোয়াই চাই।

১৫.

আমার নানার বংশ

ঢাকা শহরের লক্ষ্মীবাজারে মিউনিসিপ্যাল রোডে 'মিয়া সাহেব ময়দান' নামে পরিচিত বাড়িতে আমার জন্ম হয়। মায়ের বাপের বাড়িতেই প্রথম সন্তান জন্ম হবার ঐতিহ্য এদেশে এখনও বহাল আছে। ঐ মিয়া সাহেব ময়দানই আমার নানার বাড়ি।

এ সুফী পরিবারের আদি পুরুষ 'মিয়া সাহেব' নামেই খ্যাত। তাঁর আসল নাম মাওলানা শাহ সুফী আবদুর রহীম শহীদ। ১০৭৪ হিজরীতে তিনি কাশ্মীরে পয়দা হন। শাহ আবদুল কাদির জিলানী (বড় পীর সাহেব) তাঁর ঊর্ধ্বতন দশম পুরুষ।

তাঁর পিতা শাহ সুফী আবদুল্লাহ ব্যবসা উপলক্ষে বাগদাদ থেকে কাশ্মীরে আসেন। শহীদ আব্দুর রহীম ১১১৪ হিজরীতে লাহোরে হাদীসের সনদ হাসিল করে লক্ষ্মৌতে শিক্ষকতা করেন। ২০ বছর অরণ্যবাসের পর মক্কা-মদীনায় অবস্থান করেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলে হিন্দুস্তানে ফিরে এসে তাবলীগে দীনের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ আসেন।

তাঁর ভাতিজা শাহ নাজমুদ্দীন ও ভাগ্নে শাহ বাহাউদ্দীন সাথে আসেন। ১১২০ হিজরীতে ৪৬ বছর বয়সে ঢাকা পৌঁছেন। লক্ষ্মীবাজারে একটি বিরাট ময়দান ছিলো, যেখানে বিভিন্ন ফলের গাছ ও অন্যান্য জংলী গাছ ছিলো। তিনি দু'সাথীসহ একটি গাছের নিচে বসবাস শুরু করেন এবং গাছের ফল খেয়ে জীবন যাপন করতে থাকেন।

বিদেশী ৩ জন লোকের আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বহু লোক তাঁদেরকে দেখতে আসেন। শাহ আবদুর রহীমের অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা দেখে সবাই মুগ্ধ হয় এবং তাঁর মুখ থেকে দীনের কথা শুনে ভক্তের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। ভক্তরা তাঁর জন্য ঐ গাছের নিচেই একটা ঘর তুলে দেয়। সবাই তাঁকে মিয়া সাহেব নামে শ্রদ্ধার সাথে ডাকে। ফলে ঐ বাগানটি মিয়া সাহেব ময়দান নামে খ্যাত হয়।

চট্টগ্রাম লালদীঘির নিকটবর্তী আস্তানার শাহ সুফী আমানতুল্লাহ তাঁরই খলীফা ছিলেন।

শাহ আব্দুর রহীম বিবাহ করেননি। যুবক বয়স থেকেই মাঝে মাঝে ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় থাকতেন। পরবর্তীকালে এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ঐ সময় তিনি একা থাকাই পছন্দ করতেন।

আল্লাহর অলি হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দীনের উদ্দেশ্য ছাড়াও রোগ আরোগ্য ও আপদ-বিপদ থেকে মুক্তির জন্য অনেকে দোয়া ও পানি পড়ার জন্য আসতো। এ উদ্দেশ্যে অনেক হিন্দুও আসতো।

৮৪ বছর বয়সে ১১৫৮ হিজরীর রমযানে তিনি শহীদ হন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যখন একা ছিলেন তখন অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি তরবারি দিয়ে ৭টি আঘাত করে পালিয়ে যায়।

এরপর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ সুফী নাজমুদ্দীন গদ্দীনশীন হন। তিনি ১২৩০ হিজরীতে শতাধিক বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। এরপর তাঁর পুত্র শাহ সুফী বদিউদ্দীন গদ্দীনশীন হন এবং ১২৬৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র শাহ সুফী নাসরুদ্দীন গদ্দীনশীন হয়ে নিঃসন্তান অবস্থায় ১২৭৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ছোট ভাই শাহ সুফী কামারুদ্দীন গদ্দীনশীন হন।

শাহ সুফী কামারুদ্দীনের কোন পুত্র সন্তান ছিলো না। কালিয়াকৈরের অন্তর্গত সৈয়দাবাদের মাওলানা সাইয়েদ শাহ সুফী আলী আবদুল্লাহ ওরফে এমদাদ আলী দু'ছেলের সাথে তাঁর দু'কন্যার বিয়ে হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র সাইয়েদ শাহ সুফী আবদুর রাজ্জাক ও কনিষ্ঠপুত্র সাইয়েদ শাহ সুফী আবদুল মুনয়িম যিনি আমার নানা।

শাহ সুফী আলী আবদুল্লাহর পূর্বপুরুষ মাওলানা শাহ সুফী হুসাইনী ১১৩৫ হিজরীতে এদেশে আগমন করেন। তিনি ইরান থেকে দিল্লী আসেন এবং সেখান থেকে এদেশে আসেন এবং বর্তমান কালিয়াকৈরের বরিয়াব গ্রামে বসবাস শুরু করেন। ঐ গ্রামেরই নাম সাইয়েদাবাদ। শাহ সুফী কামারুদ্দীন (আমার নানার শ্বশুর) ১৩০৫ হিজরী সনে

ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর প্রিয়তম নাতি (আমার বড় মামা) সৈয়দ শাহ্ সুফী আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ্ রিযভী মাত্র ১৩ বছর বয়সে গদ্দীনশীন হন। অবশ্য তিনি পিতার নিকটই বাইয়াত হন। তাঁর পিতা (আমার নানা শাহ্ সুফী আবদুল মুনয়িম) ১৩২৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

এ পরিবারের সাথে দাদার সম্পর্ক

বড় মামার বড় ছেলে সাইয়েদ আহ্মাদুল্লাহ্ তাঁর পিতার ইন্তিকালের পর গদ্দীনশীন হন। তিনি নিউ স্কীম পদ্ধতিতে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে এমএ পাস করেন। উর্দুতে তাঁরই লেখা বই 'আইনুন জারিয়া'-এর বাংলা অনুবাদ 'বহমান নির্ঝর' থেকে এ বংশের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছি। বইটি তিনি নিজেই আমাকে দিয়েছিলেন।

বর্তমান কাজী নজরুল সরকারি কলেজ কম্পাউন্ডে এককালে বিখ্যাত মুহসেনিয়া মাদ্‌রাসা ছিলো। এ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন আমার নানার শ্বশুর শাহ্ সুফী কামারুদ্দীন। আমার দাদা উচ্চ শিক্ষার জন্য এ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। হোস্টেলের খরচের অভাবে তিনি লজিং তালাশ করেন। মাদ্‌রাসার একজন শিক্ষক ক্লাসেই জানান যে, মিয়া সাহেব ময়দানের শাহ্ সাহেব তাঁর ছেলেকে শুদ্ধ কুরআন পাঠ শেখাবার জন্য এ মাদ্‌রাসার একজন ছাত্রকে লজিং রাখতে চান।

৩ জন ছাত্র ইন্টারভিউ দেয়। ইন্টারভিউ নেন আমার নানা। আমার দাদা নির্বাচিত হন। আমার বড় মামাকেই দাদা পড়াতেন। এ মামাই ১৩ বছর বয়সে গদ্দীনশীন হন।

আব্বা যখন ঐ মুহসেনিয়া মাদ্‌রাসায় উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হন তখন দাদা আব্বাকে আমার বড় মামার (দাদার ছাত্র) নিকট নিয়ে যান। তিনি তাঁর বড় ছেলে সাইয়েদ আহ্মদুল্লাহকে পড়াবার জন্য আব্বাকে লজিং রাখেন।

আব্বা তাঁর এ ছাত্রটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন যে, এত ছোট বয়সেও সে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তো।

আব্বার বিয়ে

এ প্রসঙ্গে আব্বা থেকে যা জেনেছি তা নিম্নরূপ ঃ

আমার দাদা আমার আব্বার জন্য আমার বড় মামার (দাদার ছাত্র) নিকট তাঁর সর্বকনিষ্ঠ বোনের বিয়ের প্রস্তাব দেন। আমার নানা যখন ইন্তিকাল করেন তখন আমার আম্মা ৪/৫ বছরের শিশু ছিলেন। আম্মার বড় ভাই-ই পিতৃস্নেহের অভাব পূরণ করেন। বড় মামীর (আমরা মামানী ডাকতাম) সাথে আম্মার সম্পর্ক দেখে মনে হতো যে তারা যেন মা ও মেয়ের মতো। আম্মা শৈশবেই তাঁর মাকেও হারান।

দাদার প্রস্তাবের কোন জওয়াবই বড় মামা দিলেন না। মনে হলো যেনো তিনি অত্যন্ত বিব্রত। নারিন্দাস্থ মুশুরীখলার আদি 'শাহ সাহেব' শাহ্ আহসানুল্লাহর সাথে দাদার

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় দাদা তাঁর কাছে যেয়ে অভিযোগের সুরেই জানালেন। নারিন্দার 'শাহ্ সাহেব লেন' গলি তাঁরই নামানুসারে পরিচিত।

বড় মামা মিয়া সাহেব ময়দানের গদ্দীনশীন হওয়া সত্ত্বেও শাহ্ আহসানুল্লাহকে দু'কারণে মুরুব্বী হিসেবে মানতেন। বয়সেও তিনি আমার নানার সমসাময়িক। তাছাড়া নারিন্দার শাহ্ সাহেবের বড় ছেলে মাওলানা কাজী আবদুল আযীয বড় মামার আপন ভগ্নীপতি হওয়ার সুবাদে শাহ্ সাহেব ছিলেন তার তালই।

শাহ্ সাহেব বড় মামাকে ডেকে এনে এ বিয়েতে আপত্তির কারণ জানতে চাইলেন। মামা বললেন, আমার বাড়িতে এত বছর এ ছেলে থেকে গেছে। খুবই পছন্দের ছেলে। কিন্তু আমার বোনটা গ্রামে গিয়ে কেমন করে থাকবে? সে মনে করবে যে বাপ-মা নেই বলে তাকে কোন রকমে পার করে দেওয়া হয়েছে।

শাহ্ সাহেব বললেন, লেখাপড়ায়, দেখাশুনায়, বংশ পরিচয়ে এমন ছেলে হাজারে একজন পাওয়া যাবে না। এ ছেলে কি চিরদিন গ্রামে পড়ে থাকবে? আর কোন আপত্তি না থাকলে রাজি হয়ে যাও। মামা খুশি মনে রাজি হলেন।

গ্রামে আম্মার দশা

আম্মার কাছে শুনেছি। তিনি বলতেন, বৌ হয়ে গ্রামে এসে প্রথমে যে বিরাট সমস্যায় পড়লেন তা হলো ভাষা সমস্যা। ঢাকার আদিবাসীদের ভাষা ছিলো এক ধরনের উর্দু। সকল মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারেই কথ্যভাষা উর্দু ছিলো। নওয়াব বাড়িতেও তাই। মিয়া সাহেব ময়দানে ঘরের ভেতরে এখনও কথ্যভাষা হিসেবে উর্দু বেঁচে আছে।

আম্মার ভাষা উর্দু যা গ্রামের কেউ বুঝে না। এমনকি আমার দাদীও না। আম্মা যেটুকু বাংলা মোটামুটি বুঝেন আমাদের গ্রামের লোক সে বাংলাও বলে না। আঞ্চলিক বিশেষ উচ্চারণে গ্রামের লোকদের কথ্যবাংলা না বুঝায় আম্মাকে বিব্রতকর দশায় পড়তে হলো।

সারা গ্রামে রটে গেলো যে, মৌলভী বাড়িতে এক বিদেশী বৌ এনেছে। বৌটা এত সুন্দর যে দেখলে চোখ ফিরানো যায় না। দেখতে গেলে খুব মিষ্টি হাসি দিয়ে খুশি করে ফেলে। কিন্তু তার সাথে কথা বললে চুপ করে থাকে। বোবাও নয়, কিন্তু কি যে বলে বুঝা যায় না।

বৌমার এ মুসিবতে আমার দাদীও অসহায়। দাদাই আম্মার একমাত্র অবলম্বন। আমি ক্লাস সিক্সে পড়ার বয়সে দাদা ইন্তিকাল করেন। দাদাকে সব সময় আম্মার সাথে উর্দুতেই কথা বলতে শুনেছি। প্রথম দিকে দাদা নাকি বার বার অন্দর মহলে যেয়ে তার বৌমার খোঁজখবর নিতেন। দাদাকে দেখলেই নতুন বৌ-এর লাজুকতা দূর হয়ে যেতো এবং আপনজনের মতো প্রাণখুলে কথা বলে মনের গোমড়াভাব দূর করতেন।

বাড়ির কাজের মেয়ে এবং প্রতিবেশী মেয়েদের মধ্যে যারা আম্মাকে ভাবী ডাকতো তাদের জন্য আম্মা রীতিমতো রসালো কৌতুকের পাত্রে পরিণত হলেন। ঠাট্টা করে

এগিয়ে কথা বললে না বুঝার কারণে আম্মা যখন ফেল ফেল করে চেয়ে থাকতেন তখন তারা হেসে কুটিকুটি হতো।

গ্রামীণ জীবনে হাঁপিয়ে উঠলে আম্মা তাঁর বড় ভাইকে চিঠি লিখতেন। চিঠি পেলেই বড় মামা বুঝে নিতেন যে, আদরের বোনটি ঢাকায় আসতে চায়। ছোট মামাই বোনকে নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করতেন।

বছরখানিকের মধ্যেই আম্মা নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যান। ১৫ বছর গ্রামীণ জীবন যাপনের পর ১৯৩৬ সালে আব্বা চান্দিনায় বদলি হওয়ায় নতুন করে শহুরে জীবন ফিরে পান।

আব্বার কাছে শুনেছি যে, আমাদের গ্রামে একবার কলেরার প্রকোপ হয়। আম্মার প্রবল ডাইরিয়া হওয়ায় দাদা পেরেশান হয়ে কাঁদতে লাগলেন। আব্বা দাদাকে সান্ত্বনা দিতে গেলে দাদা বললেন, 'বৌ মারা গেলে আবার বৌ পাব। কিন্তু এমন বৌ কোথায় পাব? তাই আল্লাহর কাছে কাঁদি।' দাদা ও দাদীর আন্তরিকতা ও গভীর দরদ আম্মার গ্রামীণ জীবনের সকল অসুবিধা ভুলে থাকতে সহায়ক ছিলো।

ঢাকায় আম্মার বেড়ানো

আম্মা প্রথমদিকে বছরে একাধিকবারও ঢাকায় বেড়াতে আসতেন বলে জেনেছি। তাঁর বেড়াবার প্রধান জায়গা ছিলো দুটো। মিয়া সাহেব ময়দান ও নারিন্দা শাহ সাহেব বাড়ি। আম্মার ৫ ভাইয়ের মধ্যে ৩ জনই মিয়া সাহেব ময়দানে থাকতেন। একজন কোলকাতায় ও একজন কালিয়াকৈর, যেখানে নানার পূর্ব পুরুষ ২০০ বছর আগে এসে বসবাস শুরু করেন।

নারিন্দা শাহ সাহেব বাড়ি ছিলো আম্মার সবচেয়ে বড় বোনের বাড়ি। আদি শাহ সাহেব সুফী আহসানুল্লাহর বড় ছেলে মাওলানা আ. আযীয ছিলেন আমার বড় খালু। আম্মা ঢাকায় এলে নারিন্দায় ৮/১০ দিন অবশ্যই বেড়াতেন। বড় খালা আমাদেরকে এত স্নেহ করতেন যে, আমরা এ বাড়িতে আসার জন্য দিন গুণতে থাকতাম।

আম্মার কাছে শুনেছি যে, আমার বয়স ৪০ দিন পার হবার পর আম্মা আমাকে নিয়ে শাহ সাহেব বাড়িতে বেড়াতে এলে খালার বড় মেয়ে আমাকে কোলে নিয়ে তার দাদা শাহ আহসানুল্লাহ সাহেবের কোলে তুলে দিয়ে দোয়া করতে বলেন। শাহ সাহেব তাঁর ঐ নাতনীকে সবচেয়ে বেশি আদর করতেন। ঐ নাতনীই খালার প্রথম সন্তান। বয়সে আমার আম্মার চেয়েও কিছু বড় ছিলেন।

শাহ সাহেব নাকি আমাকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দোয়া করতে থাকেন। সম্পর্কে তিনি আমার নানা। তিনি তাঁর নাতনীকে বললেন, এ বাচ্চাটা তোর নাতি। এ সুবাদে আম্মার নির্দেশে তাকে আপা না ডেকে নানী ডাকতাম। আমার আম্মাও তাকে মা ডাকতেন। আম্মা ছোট বয়সে মা হারিয়ে এক জোয়ান মা পেলেন, আমরাও নানী ডাকার মানুষ পেলাম।

খালুর এ বড় মেয়েটিকে তাঁর এক নিকটাত্মীয়ের নিকট বিয়ে দিলেন যাকে আমরা নানা ডাকতাম। খালুর বাকি ৩ মেয়ের স্বামী এদেশের নামকরা ৩ ব্যক্তি ছিলেন। তারা হলেন এক সময়ের পুলিশ প্রধান আবুল হাসানাত ইসমাইল, গেলো মুজীব আমলের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হুসাইন ও ডিপিআই ড. আবদুল হক।

১৬.

আমার জীবনে খেলাধুলা (প্রাইমারী ও জুনিয়ার পর্যায়ে)

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময় প্রচলিত কয়েকটি খেলার কথাই মনে পড়ে, হাডুডু, গোল্লা ছুট, দৌড় প্রতিযোগিতা, ঘুড়ি উড়ানো ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিলো হাডুডু। বড়দেরকে ফুটবল খেলতে দেখেছি। বাজারে বল কেনাবেচা হতে কখনো দেখিনি। আমরা কাঁচা জাম্বুরা দিয়ে বল খেলতাম। আমার চাচাদের মধ্যে যারা তখন স্কুলে পড়তেন তাদের সাথে আমি ও আমার ছোট ভাই বাড়ির উঠানে ফুটবল খেলেছি। আমার দাদা বাইশ মৌজার বাজারের মুচিকে দিয়ে চামড়ার ফুটবল বানিয়ে দিয়েছিলেন। সে ফুটবলে বাতাস ভরার ব্যবস্থা ছিলো না। শিমুলতুলা ভর্তি করে মুচি বল বানিয়ে দিয়েছিলো। দাদা এ ব্যবস্থা করেছিলেন এ জন্য, যেন পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সাথে না খেলে আলাদা খেলার সুযোগ হয়। ঘরের বারান্দায় বসে তিনি রেফারির দায়িত্ব পালন করতেন।

বড়াইল জুনিয়র মাদ্‌রাসায় পড়ার সময় সপ্তাহে ২ দিন ড্রিল মাস্টারের পরিচালনায় ব্যায়াম জাতীয় কয়েকটি চমৎকার খেলা আমার কাছে খুবই ভালো লাগতো। লজিং পাড়ায় আমার খেলার সাথীদেরকে নিয়ে ঐ সব খেলা করতাম এবং আমি নিজে ড্রিল মাস্টারের ভূমিকা পালন করতাম। সেখানেও হাডুডু, ফুটবল, দৌড় প্রতিযোগিতা ইত্যাদি চালু ছিলো। তবে আমি অনুভব করতাম যে, খেলাধুলায় অন্যদের তুলনায় আমি কম অগ্রসর ছিলাম।

ছাত্রজীবনে কুমিল্লায়

কুমিল্লায় হাই মাদ্‌রাসায় পড়ার সময় ড্রিল মাস্টারের পরিচালনায় যে সব ব্যায়াম ছিলো সেগুলোতে আমি নিয়মিত উপস্থিত থাকতাম। যেদিন ড্রিলের কাজ থাকত না সেদিন ফুটবল খেলা হতো। আমি ফুটবলে ভালো খেলোয়াড় হিসেবে গণ্য হইনি, তবে ব্যায়ামের প্রয়োজন পূরণের জন্যই খেলতাম। নিজে ভালো ফুটবল খেলোয়াড় না হলেও আমার নিকট ফুটবল অত্যন্ত প্রিয়।

১৯৩৮-৩৯ সালের কথা, যখন আমি ক্লাস সেভেনে বা এইটে পড়ি তখন কোলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান এ দু'দলের খেলার খবর রেডিওতে শোনার জন্য আমরা দল বেঁধে এক ইংরেজ জমিদার বাড়িতে যেতাম।

সে জমিদার খুবই শৌখিন লোক ছিলো। এক বিরাট বৈঠকখানায় সবাইকে রেডিও শোনার জন্য সুযোগ দিতো। মোহামেডান স্পোর্টিং ছিলো মুসলমানদের এবং মোহনবাগান ছিলো হিন্দুদের দল। সেকালে খেলার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ সুস্পষ্ট ছিলো। মোহামেডানের জয় মানে মুসলমানদের জয়। এ খেলাও মুসলিম জাতীয়তাবোধের বিরাট সহায়ক ছিলো। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় কোলকাতার প্রধান দু'দলের খবর এমনভাবে পরিবেশন করা হতো যে, আমরা দলবেঁধে পত্রিকার খবর শুনতাম। বড়দের কেউ পড়তেন আর আমরা সবাই শুনতাম। এখনও বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নাম মনে পড়ে। সবচেয়ে জাঁদরেল খেলোয়াড় ছিলো জুম্মা খান নামে এক দীর্ঘদেহী পাঞ্জাবী খেলোয়াড়। মোহামেডান এর খেলার খবর পরিবেশন করতে গিয়ে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'মোহামেডানের বিজয় ঠেকাবে কে? হাফেয রশীদ কোরআন বুকে নিয়ে খেলায় অবতীর্ণ হয়েছে।' মুসলিম সাংবাদিকতার পথিকৃৎ নামে খ্যাত মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর দৈনিক আজাদই মুসলমানদের একমাত্র মুখপত্র ছিলো। মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তার আন্দোলনের প্রধান পতাকাবাহী ছিলো দৈনিক আজাদ। আর মোহামেডান স্পোর্টিং এর খেলাও মুসলিম জাতীয়তার আন্দোলনের অগ্রগতিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

কুমিল্লায় ঐ ইংরেজ জমিদারের এক অদ্ভুত হবি ছিলো। কুমিল্লার আদালতপাড়ার বড় রাস্তার পাশেই ঐ জমিদারের বিরাট বাড়ি ছিলো এবং তার বাড়ি বরাবর রাস্তায় বিরাট বিরাট গাছ ছিলো। বিকাল বেলায় রাস্তায় ও আশেপাশে বিচরণরত দশ-পনের বছর বয়সের ছেলেদেরকে ডেকে কিছু টাকা দিয়ে গাছে চড়তে বলত। গাছে উঠার পর তাদেরকে তাদের যত রকম গালি জানা আছে চিৎকার করে সে সব গালি উচ্চারণ করার জন্য প্ররোচিত করতো। এতোগুলো ছেলে গালি দিতো আর নিচে সে হাততালি দিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানাতো। নিচে নামার পর তাদেরকে আবার টাকা দিতো। সে অদ্ভুত তামাশা দেখার জন্য বহু লোক জড়ো হয়ে যেতো। আমি জানি না এমন অদ্ভুত সখ দুনিয়ার আর কোন লোকের আছে কিনা।

আমি কুমিল্লায় থাকাকালে কয়েকটি নামকরা স্কুলে বার্ষিক স্পোর্টস ও ড্রিল দেখতে যেতাম। আমি নিজে স্পোর্টস ম্যান হওয়ার চেষ্টা করিনি। হয়ত এ যোগ্যতাই আমার ছিলো না। কিন্তু স্পোর্টস দেখে আনন্দই পেতাম। কুমিল্লার বিখ্যাত হিন্দু স্কুলের নাম ছিলো ঈশ্বর পাঠশালা। শুধু হিন্দুরাই সেখানে পড়তো। কোন মুসলমানকে ভর্তি করা হতো না। ঐ স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টসের খুব সুনাম ছিলো। আমি দেখতে গেলাম। রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলাম।

এক সময় আমার মনে হলো যে, কয়েকজন আমাকে কোলে করে ধরে আছে এবং মাথায় পানি দিচ্ছে। আমার হুঁশ আছে, অথচ চোখ মেলতে পারছি না, কথাও বলতে পারছি না। আরও কিছুক্ষণ পানি দেবার পর চোখ মেলে দেখি যারা আমাকে পাঁজা

কোলা করে আছে তাদেরকে আমি চিনি না। এত দুর্বল মনে হচ্ছিল যে, কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল। মৃদু উচ্চারণে জানতে চাইলাম, 'আমি কোথায় আছি?' বললো, আমি নাকি ঈশ্বর পাঠশালার মাঠে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাই। তখন তারা ধরাধরি করে এনে পানি দিচ্ছে।

ইশারায় পানি দেওয়া বন্ধ করতে বললাম। একটা রিকশা ডেকে আমাকে তাতে বসালো। ইতোমধ্যে অনেক লোক জমা হয়ে গেলো। লক্ষ্য করলাম যে, কান্দিরপাড় চৌরাস্তার পাশে মিউনিসিপ্যালিটির টেপের পানিই আমার মাথায় দেওয়া হয়েছিলো। রিকশাতে একজন যুবক আমার পাশে বসে আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলো। আমার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলো। বললাম, বিষ্ণুপুর যাবো। ওখান থেকে আধমাইল দূরেই আমার লজিং বাড়ি। ওখানে আমাকে পৌছায়ে যুবকটি চলে গেলো। তার পরিচয় নেওয়ার মতো মনের অবস্থা ছিলো না। গোটা পথে রিকশায় তার কাঁধে মাথা রেখেই বসেছিলাম।

বাড়িতে পৌছার পর লজিং-এর দাদী অস্থির হয়ে জানতে চাইলো আমার কী হয়েছে। ঐ যুবক জওয়াব দেবার পর আমাকে অবিলম্বে শোবার ব্যবস্থা করে দিলো এবং এক কাপ গরম দুধ খেতে দিলো। তখন প্রায় সন্ধ্যা। দুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম থেকে জাগলাম তখন সকাল হয়ে গেছে।

দাদী এসে আদর করে অবস্থা জানতে চাইল। তখন সব কথা বললাম। অচেনা লোকেরা আমার যে সেবা করলো তাদের কথা মনে করে কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। পরে জানতে পারলাম যে, আমার সান-স্ট্রোক হয়েছিলো। এর পর থেকে রোদের ব্যাপারে সাবধান ও সচেতন হলাম।

ছাত্র-জীবনে ঢাকায়

১৯৪০ সালে ঢাকায় কলতাবাজার হোস্টেলে থাকাকালে নিয়মিত কলেজ মাঠে ভলিবল খেলতাম। পরের বছর ইসলামপুরস্থ নওয়াব গেট হোস্টেলে থাকাকালেও বিকেলে কলেজ মাঠে নিয়মিত খেলতে যেতাম। মাগরিবের আযান হলে সেখানেই জামাতে নামায পড়ে হোস্টেলে ফিরতাম। আমাদের বাংলার শিক্ষক অধ্যাপক আমীন উদ্দীন প্রায়ই বসে বসে আমাদের খেলা দেখতেন। আমি ফুটবলে মোটেই ভালো ছিলাম না বটে; কিন্তু ভলিবল ভালোই খেলতাম। এই খেলা শার্ট-পায়জামা পরেই খেলা যেতো। আমীন উদ্দীন স্যার আমার প্রশংসা করে উৎসাহিত করতেন। ১৯৪১ সাল থেকে দু'বছর নওয়াব বাড়ির পূর্বদিকে প্যারাডাইস হোস্টেলে থাকাকালে খেলার জন্যে আর কলেজে যেতে হয়নি। হোস্টেলেই ভলিবল খেলার মতো জায়গা ছিলো। ভলিবল খেলার প্রয়োজনীয় ছাত্র সংখ্যা না থাকলে সে মাঠেই ব্যাডমিন্টন খেলতাম। এ খেলাটা আরো ভালো লাগতো। আমার এক সহপাঠী আমিন উদ্দীন আমার চেয়েও কিঞ্চিৎ লম্বা ছিলো। আমরা দু'জন মিলে একটি টিম বানালাম। কলেজে ব্যাডমিন্টন

প্রতিযোগিতা হলো। আমাদের ২ জনের এ জুটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলো। আমরা এ টিমের নাম রেখেছিলাম Hopeless. পুরস্কার বিতরণের সময় প্রিন্সিপ্যাল খুব রসিকতা করে বক্তব্য রাখলেন। বললেন যে, গোলাম আযম-আমিন উদ্দীন যুগল খেলোয়াড় তাদের বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো বলেই সবাইকে চমক দেবার জন্য নাম রেখেছে Hopeless.

প্যারাডাইস হোস্টেলে একটি বিরাট আমগাছ ছিলো। ৩×৩ একটি কাঠের তক্তা বানিয়ে এর চার কোণায় মোটা রশি লাগিয়ে ঐ আমগাছের মোটা এক ডালে ঝুলানো হলো। এ ঝুলা খেলায় আমরা কয়েকজন মাত্র অংশ নিতাম। ঝুলতে গিয়ে একবার একদিকে আরেকবার অন্যদিকে মোটা ডালটির উচ্চতা পর্যন্ত প্রায় পৌঁছে যেতাম। নিচে থেকে দর্শকরা ভয় পেয়ে যেতো। এ কারণে খুব কম ছাত্রই এ দুঃসাহসিক খেলায় অংশগ্রহণ করতো।

১৯৪৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হলাম তখন ঘটনাক্রমে আমি এবং আমার ব্যাডমিন্টনের সাথী আমিন উদ্দীন একই হলে (ফজলুল হক মুসলিম হল) আবাসিক ছাত্র হিসেবে থাকায় আমাদের Hopeless টিম আবার চালু হয়ে গেলো। আমরা পরপর দু'বছর হলের প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় Hopeless টিমের সুনাম রক্ষা করতে সক্ষম হই।

১৯৪৬ সালে বিএ পাস করে আমার সাথী আমিন উদ্দীন সাব-রেজিস্ট্রারের চাকরি নেয়। ফলে আমি এমএ পড়ার সময় সাথীর অভাবে এর পরবর্তী প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে অক্ষম হই। Hopeless টিমের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

এমএ পড়ার সময় হলের কম্পাউন্ডে শুকনা মওসুমে নিয়মিত ভলিবল খেলা হতো। তাতে আমি অংশগ্রহণ করতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময় চান্দিনার হাইস্কুল মাঠে ভলিবল এবং ব্যাডমিন্টন দু'টোই খেলার সুযোগ হতো। আমি এ দুটো খেলায়ই ভালো খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি পাই।

ছাত্রজীবনের পর

ছাত্রজীবনের পর রংপুর কারমাইকেল কলেজে শিক্ষকতাকালে ইংরেজির অধ্যাপক এম. আর. হেলালী ও আমি ব্যাডমিন্টন টিম গড়ে সেখানেও শীতকালে বিকেলে খেলতাম। কিন্তু কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিনি। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব খান সরকার জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সকল সদস্যকে গ্রেফতার করে। ঘটনাক্রমে ঐ সময় আমি এবং সেকালের পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং উপলক্ষে লাহোরেই ছিলাম এবং সেখানেই গ্রেফতার হয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে একই বিল্ডিং-এ লাহোরে ডিস্ট্রিক্ট জেলে ২ মাস আটক ছিলাম।

মজলিসে শূরার সদস্যদের মধ্যে সোয়াত রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব শের আলী খানও লাহোর জেলে ছিলেন। তিনি ব্যাডমিন্টন খেলার প্রস্তাব করেন। আমি উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন জানাই। আমাদের দু'জনের মধ্যে ব্যাডমিন্টনের প্রতিযোগিতা হতো। মাওলানা মওদূদী ও মাওলানা আব্দুর রহীম এবং আরো যে কয়জন ছিলেন তারাও ঐ খেলা দেখতেন এবং দু'জনকেই ভালো খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি দেন। জনাব শের আলীও ভালো খেলতেন। কোনো কোনো সময় তিনিও জিততেন। তবে বেশি সময় আমিই খেলায় বিজয়ী হতাম। তাই প্রশ্ন উঠলো, ছাত্রজীবনে আমি খেলতাম কিনা। তখন একথা প্রকাশ পেলো যে, আমি ছাত্রজীবনে যৌথভাবে চ্যাম্পিয়নও হতাম।

১৯৬৪ সালে দু'মাস পর লাহোর হাইকোর্ট জজ-এর সামনে নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে আমাকে যখন হাযির করা হলো তখন আমি অভিযোগ করলাম, যে আইনে আমাকে আটক করা হয়েছে সে আইন অনুযায়ী প্রতি ১৫ দিনে একবার আমার পরিবারের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা উচিত ছিলো। কিন্তু তা করা হয়নি। বিচারপতি সরকার পক্ষের বক্তব্য শোনার পর নির্দেশ দিলেন যে, অবিলম্বে যেন আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মার্চ মাসের ৭ তারিখে আমাকে জেল থেকে সরাসরি বিমানে উঠিয়ে দেওয়া হলো। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, ঢাকা বিমানবন্দরে নামলে সরকারি মেজবানরা আমাকে অতিথি হিসেবে সাদরে গ্রহণ করবে। ঘটনাক্রমে বিমানে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুয়াযযাম হোসেন চৌধুরী সিএসপি-কে পেয়ে গেলাম। ফজলুল হক মুসলিম হলে যে বছর আমি জিএস ছিলাম ঐ বছর ক্যাবিনেটে তিনি ভিপি ছিলেন। তাকে আমার বাড়ির ফোন নম্বর দিয়ে আমি যে ঢাকায় এসেছি এ খবরটা জানানোর অনুরোধ করলাম।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে

ঢাকার জেলখানায় ব্যাডমিন্টন খেলার মতো মাঠ পেলাম না। বিকালে ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে ছোট্ট বাগানের মাঝখানে যেটুকু জায়গা ছিলো সেখানে ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতাম, কোনো কোনো সময় রিং খেলতাম। রিং খেলার সাথী হিসেবে অধ্যাপক মাওলানা হেলাল উদ্দীন সাহেবকে পেয়েছিলাম। বন্দিদশা ৬ মাস পার হওয়ার পর হেলাল সাহেব ও আরো বেশ কজন মুক্তি পেলেন। আমি এবং মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব লাহোর থেকে ঢাকা জেলে এসে জনাব আব্দুল খালেক, জনাব খুররম মুরাদ, বগুড়ার মাওলানা আব্দুর রহমান ফকীর ও অধ্যাপক মাওলানা হেলাল উদ্দীন সাহেবকে পেয়েছিলাম। আরো যারা জেলে ছিলেন তারা ইতঃপূর্বে মুক্তি পেয়েছেন। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে মুরাদ সাহেব ও হেলাল উদ্দীন সাহেব মুক্তি পেলেন। আমরা বাকি ৪ জন দেওয়ানী সেল নামে একটি ঘরে স্থানান্তরিত হই। সেখানে রিং খেলায় জনাব আব্দুল খালেক সাহেবকে সাথী হিসেবে পেতাম।

খেলা দেখার নেশা

বর্তমানে এ দেশে ক্রিকেটই সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু আমার নিকট এখনও ক্রিকেটের চেয়ে ফুটবল বেশি প্রিয়। ফুটবল খেলা দেখতে গেলে ক্রিকেটের মতো ফলাফলের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। কোনো কোনো ক্রিকেট খেলা কয়েকদিন পর্যন্ত অবিরাম চলতে থাকে এবং দর্শকরা স্টেডিয়ামেই খেলা দেখার জন্য একটানা দীর্ঘ সময় বসে থাকে। যারা খেলোয়াড় তাদের উন্নত খেলা দেখে শিখবার উদ্দেশ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন খেলা দেখার যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু দর্শক হিসেবে এভাবে একটানা যারা খেলা দেখেন আমি তাদের ধৈর্যের প্রশংসা করতে বাধ্য। কারণ আমার নিজের মধ্যে এ অদ্ভুত ধৈর্য নেই।

শুধু স্টেডিয়ামে খেলা দেখার ব্যাপারই বিস্ময়কর নয়, পৃথিবীর যে কোনো দেশে নামকরা দলগুলোর খেলা হলেই আমাদের দেশে টিভিতে খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা খেলা দেখেন তাদের অনেকেই তাদের কর্ম-ব্যস্ততাকে খেলার জন্য মুলতবি করে রাখেন। বিশ্বের সেরা দলগুলোর মধ্যে খেলা হলে পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করার কারণে পত্রিকার পাঠক হিসেবে খেলার ফলাফল জানার জন্য আমিও দর্শকদের থেকে খোঁজ-খবর নেই। কিন্তু আমি তাদের মতো দর্শক হওয়ার গৌরব অর্জন করতে অক্ষম।

একটা কথা আমার বুঝে আসে না যে, বিশ্বের বড় বড় কয়েকটি দেশ যারা আন্তর্জাতিক খেলায় সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক লাভ করে তারা ক্রিকেটের ময়দানেই অনুপস্থিত কেন? যেমন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি তারা ক্রিকেটের মর্যাদা বুঝলো না কেন?

খেলা সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি

খেলা সম্পর্কে আরেকটি বিষয় আমার কাছে কেমন যেনো লাগে। আমার দৃষ্টিতে খেলা ব্যায়াম ও বিনোদন হিসেবে যথার্থ মর্যাদার অধিকারী। কিছু লোক এটাকে নেশা হিসেবেও গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এটাই একমাত্র পেশা হয়ে যাওয়া কতটুকু সঠিক? আজকাল বিশ্বে এ রকম বহু খেলোয়াড় আছে যারা খেলেই বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে, উপার্জনের জন্য তাদের আর কোন পেশার প্রয়োজনই হয় না। একথা আমি স্বীকার করি যারা খেলাকে নেশা ও পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তারা খেলার মানকে অনেক উন্নত করেছেন এবং বিস্ময়কর রেকর্ডও স্থাপন করেছেন। আখিরাতে বিশ্বাসী হিসেবে আমার মনে এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে যে, আদালতে আখিরাতে আল্লাহ্ তাআলা যখন জিজ্ঞেস করবেন দুনিয়াতে তুমি কী কাজ করে এসেছো। তারা এর কী জওয়াব দেবে? দুনিয়ার জীবনটা কি শুধুই খেলা? শুধু খেলাটাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া কি ঠিক? অবশ্য বর্তমান দুনিয়ায় খেলাকে দেশের সুনাম অর্জনের মাধ্যম হিসেবে বিরাট গুরুত্ব দেওয়া হয়, খেলার এ প্রতিযোগিতা যুব

সমাজকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি বয়স্ক দর্শকগণও খেলাকে বিনোদন হিসেবে উপভোগ করেন। এ সব দিক বিবেচনা করলে জাতীয় জীবনে খেলার অবদান ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

১৭.

বাংলাদেশে ক্রিকেটের বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা

আগেই বলেছি যে, আমি ক্রিকেটপ্রেমিক নই। সময় খরচ করে খেলা দেখতে থাকা আমার রুচিতে সয় না। ঘরে গিয়ে যখন দেখি যে আমার স্ত্রী, কাজের মেয়ে, কাজের ছোট ছেলে তন্ময় হয়ে টিভিতে খেলা দেখছে তখন বিরক্তি প্রকাশ করি। বিশ্বের নামকরা দলগুলোর খেলা যে দেশেই হোক তা টিভিতে দেখানো হয়। সেসব খেলা পরম তৃপ্তি নিয়ে যারা দেখে তাদের বিনোদনে কতো বাধা দেওয়া যায়?

একসাথে খেলা দেখার তৃপ্তিই হয় না যদি খেলার সময় হৈচৈ করে মনোভাব প্রকাশ করা না হয়। এরা স্টেডিয়ামে উপস্থিত না হয়েও ওখানকার দর্শকদের আধ্যাত্মিক সাথী। তাই তাদের হৈচৈ-এর সাথে তাল দিয়ে এরাও হৈচৈ করে মজা পায়। এই সেদিন জিম্বাবুয়েতে বাংলাদেশের খেলা দেখা হচ্ছিল। বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দলের কেউ আউট হলে সবাই যখন উল্লাসের সাথে চিৎকার করে 'আউট' বলে উঠে তখন আমার আদরের সোয়া চার বছরের নাতনী নাবাও আউট বলে লাফায়। আমি এ বিষয়ে নিজের বাড়িতেই একা ও অপাঙক্তেয়।

আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়াযযামও ক্রিকেটভক্ত। তার বড় ছেলে সোহায়েলের ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী ৩ ছেলে– এরা সবাই ক্রিকেটপাগল। এরা তিন পুরুষ একসাথে খেলা দেখে। এরা শুধু দর্শকই নয়, ক্রীড়া বিশ্লেষকও। নাতিরাও বড় সব দলের নামকরা খেলোয়াড়দের নাম বলতে পারে। আমার ভাইটি আমার মতো বেরসিক না হওয়ায় তার ছেলে ও নাতিরা ক্রিকেটের ব্যাপারে তার চেয়েও যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাদের নিকট ক্রিকেট নির্দোষ বিনোদনের মাধ্যম। তাদের এ বিনোদনে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে এ ক্ষেত্রে আমি তাদের সাথী হবার অযোগ্য। অবশ্য ঐ নাতিদের সাথে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ওরা এ পাড়ায় থাকার সময় ঘন ঘন দেখা হতো। আমার ভাই নিজের বাড়ি ভাড়া দিয়ে সোবহানবাগে চলে যাওয়ায় নাতিদের অভাব বোধ করি। আমার নিজের নাতিরা তো সবাই বিদেশে। আমার ভাইয়ের নাতিদের মাধ্যমেই দাদা-নাতির ভালোবাসার আদান-প্রদান হতো। ওরা দূরে চলে যাওয়ায় সে সুযোগও নেই। মাঝে মাঝে ওরা জুমআ ও ঈদে বা কোনো উপলক্ষে এলে বড়ই ভালো লাগে। ওরা আসলেই জড়িয়ে ধরে। আমিও আদর করে তৃপ্তি বোধ করি। আল্লাহ তাআলা এ মধুর মহব্বত দ্বারা মানুষের মনে শান্তি দান করেন।

আমার ছোট ছেলে সালমান আমার পাশের কামরায়ই থাকে। দু'কামরার মাঝে ৪ ফুট প্রস্থ প্যাসেজ। প্যাসেজে এদ্দিন সালমানের মেয়ে নাবাকে ওর ৩ চাকার সাইকেল চালাতে দেখেছি। ইদানীং সে প্লাস্টিকের ব্যাট দিয়ে ৭/৮বছর বয়সী কাজের ছেলে সাদের সাথে এ প্যাসেজেই ক্রিকেট খেলে। টিভি ক্রিকেটকে এতো জনপ্রিয় করতে সক্ষম হয়েছে যে, আশপাশে বাচ্চাদেরকে সব জায়গায়ই, এমনকি ঘরের বারান্দায়ও ক্রিকেট খেলতে দেখি। বিকেলে ছাদে উঠলে দেখা যায় বিল্ডিং-এর ছাদে ক্রিকেট খেলা চলছে। হরতালের দিনে আমাদের মহল্লার রাস্তায় ক্রিকেট খেলা চলে। হাত দেড়েক কাঠ হলেই ব্যাট হয়ে যায়, আর কয়েকটা ইট দিয়ে উইকেট এবং টেনিস বল হলেই খেলার সরঞ্জাম হয়ে যায়। ফুটবল খেলার মতো বড় ময়দানের দরকার হয় না। ১৫/২০ হাত লম্বা জায়গা পেলেই চলে। গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত ক্রিকেট বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা।

আমার বাড়ির পাশের মসজিদের সামনে ১১ ফুট চওড়া রাস্তা, যা লম্বায় ৬৬ ফুট। গাড়ি চলার রাস্তা থেকে নেমে এ রাস্তা ধরেই আমার বোন জাহান-আরা আযহারীর বাড়ি যেতে হয়। এটুকু রাস্তায় পাড়ার কয়েকটি ছোট ছেলে ক্রিকেট খেলে। মহল্লার প্রধান রাস্তাটি যুবকদের দখলে থাকে। তাই ছোটদেরকে মসজিদের সামনেই খেলতে হয়।

ক্রিকেটের ব্যাট কাঁধে নিয়ে এখানে ছোটদের যে টীম খেলে, এর কেপ্টেন হলো আমার অতি আদরের নাতি মুবীন। মুবীনের মা অধ্যাপিকা নাঈমা আমার আপন ভাগ্নি। এ ভাগ্নিটিকে ৪০ দিনের শিশু অবস্থায় রেখে ওর মা মারা যায়। ওর খালা জাহান-আরা ওকে লালন-পালন করে। আরবী ভাষার প্রখ্যাত পণ্ডিত মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারীর সাথে জাহান-আরার বিয়ের পর নাঈমা আযহারী সাহেবের কন্যার মর্যাদা পায়। আযহারী সাহেব তাঁর প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুফায্যল হুসাইন খানের সাথে নাঈমাকে বিয়ে দেন। নাতি মুবীন তাদেরই পুত্র। আকর্ষণীয় প্রতিভাদীপ্ত চেহারা, মিষ্টি হাসি ও বয়সানুপাতে কথাবার্তায় যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার অধিকারী বলে সে সবারই প্রিয়। আমাকে সে এত ভালোবাসে যে, আমি তো তাকে অতি আদরের বলে উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম।

দৈনিক সংগ্রামে এ লেখাটা যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাতে মুবীনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাই সে ওর মা ও নানীর নিকট অভিমান করে বলেছে, 'আমি কি বড় নানার কাজের ছেলে সা'দের সমান মর্যাদাও পেতে পারি না? ক্রিকেট খেলতে বড় নানা আমাকে রোজই দেখেন। কিন্তু আমার কথা লিখলেন না অথচ সা'দের নাম উল্লেখ করলেন।' ওর অভিমানের কথা জানতে পেরে আমিও অনুতপ্ত হলাম। আমার ঐ ভুলের জরিমানা আদায় করার জন্যই পুস্তিকাকারে প্রকাশকালে ওর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করলাম।

আমার ছোট ছেলে সালমান ছাত্রজীবনে ক্রিকেট খেলতো। এখন বোধ হয় সময় পায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা নিয়ে মহাব্যস্ত। কিন্তু সে ক্রিকেটপ্রেমিক। ১৯৯৩ সালে

আমি যখন কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলাম তখন সালমানের লেখা বই 'বিশ্বের সেরা ক্রিকেট ও ক্রিকেটার' আমাকে পৌছানো হলো। জেলাখানার ২৬ সেল নামক দালানে ডিভিশন প্রাপ্তরাই থাকে। আমি সেখানেই ছিলাম। ওখানের কয়েকজন আমার পড়ার আগেই কাড়াকাড়ি করে বইটি পড়ে খুব প্রশংসা করলো। সেখানেও অনেক ক্রিকেটপ্রেমিক দেখলাম। আমি সবার শেষে পড়ার সুযোগ পেলাম। ক্রিকেট আমার প্রিয় খেলা না হলেও বইটি সুখপাঠ্য বলে বেশি অংশই পড়লাম। বইটিতে সে দাবি করেছে যে, মানব জাতির মধ্যে ক্রিকেটের মাধ্যমেও বিরাট ঐক্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। বইটির ভূমিকায় সে লিখেছে–

'বিশ্ব জয় করেছে ক্রিকেট। সমস্ত বিশ্বকে একসূত্রে গেঁথেছে ক্রিকেট। অস্ত্রের ঝংকারে নয়, শৃঙ্খলার বাঁশি বাজিয়ে এ বিশ্বকে মহিমান্বিত করেছে ক্রিকেট।.......কী সুন্দরভাবে ভৌগোলিক সীমারেখাকে অস্বীকার করে এক নিবিড় বন্ধন এনে দিয়েছে ক্রিকেট। রং, ভাষা, সংস্কৃতি সবকিছু মুছে ফেলে দিয়ে হাতে হাত ধরে মৈত্রীর বন্ধনে বিশ্ববাসীকে আবদ্ধ করেছে।......ধর্মীয় গ্রন্থে পড়েছি 'আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন।' আল্লাহকে আমরা দেখি না, কিন্তু তার সৃষ্টি দেখে আমরা অনুধাবন করতে পারি কতো সুন্দর তিনি। ক্রিকেটও আল্লাহর সৃষ্টিগুলোর একটি। এমন একটি খেলা আমাদের উপহার দেবার জন্য তার প্রতি মাথানত করি।'

ক্রিকেটের ব্যাপারে সালমানের এ দর্শন ও প্রচণ্ড আবেগ আমাকে প্রভাবিত না করলেও ক্রিকেট খেলার বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা স্বীকার করি। বিশ্বকাপের খেলা যেখানেই হোক সর্বত্র কোটি কোটি মানুষ টিভিতে খেলা দেখে।

ক্রিকেট-রাজনীতি

১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে বিশ্বের অন্যতম সেরা পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল পরাজিত করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্তব্য করেছিলেন, '৭১-এর মতো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে খেলার ফলেই বিজয় সম্ভব হয়েছে।' কিন্তু ২০০০ সালে ঢাকায় বাংলাদেশ দল স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই পাকিস্তান দলের নিকট পরাজিত হয়। নিজে হাজির থেকেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাদের মধ্যে কেন সঞ্চারিত করতে পারলেন না তা বুঝা গেলো না।

খেলা খেলাই। এর সাথে মুক্তিযুদ্ধকে টেনে এনে তিনি অযথাই হাস্যাস্পদ হলেন। বিজয় যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ফলে হয়নি, পরাজয়ও ঐ চেতনার অভাবে হয়নি। খেলার মানের উত্থান-পতনেই জয়-পরাজয় হয়ে থাকে।

ভারত বনাম পাকিস্তান খেলা

ক্রিকেটে ভারত ও পাকিস্তান বিশ্বের সেরা দলের মধ্যে গণ্য এবং উভয় দল প্রায় সমমানেরই, তবে পাকিস্তান মাঝে মাঝে সাধারণ দলের নিকট পরাজিত হলেও

ভারতের নিকট খুব কমই পরাজিত হয়েছে। জানি না পাকিস্তানী দল '৪৭-এর চেতনা' নিয়েই ভারতের বিরুদ্ধে খেলে কিনা।

ঢাকা স্টেডিয়ামে যতবার ভারত ও পাকিস্তান দলের খেলা হয়েছে প্রতিবারই লাখো বাংলাদেশী দর্শকের শতকরা প্রায় ৯৯ জনই পাকিস্তান দলের প্রতিই আবেগপূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ব্যানার প্রদর্শন করলেও তা দর্শকদের মনে সামান্য প্রভাবও বিস্তার করতে পারেনি। দর্শকরা ঐ ব্যানার দেখে মন্তব্য করেছে 'রাখ মিয়া মুক্তিযুদ্ধের কথা, এখানে মুসলমানদের বিজয় চাই।'

আমার ধারণা, এ দ্বারা দর্শকদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি অনুরাগের বদলে ভারতের প্রতি তীব্র বিরাগেরই প্রকাশ ঘটে থাকে। এ দেশের জনগণ ভারতকে বন্ধু মনে করে না। স্টেডিয়ামে আলেম-ওলামারা কয়জন দর্শক হিসেবে যান আমার জানা নেই। খেলাপ্রেমিক তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তাদের মধ্যে পাকিস্তান দলের পক্ষে বিপুল সমর্থন দেখে দর্শকদেরকে কেউ রাজাকার বলে গালি দিয়েছে বলেও শুনিনি।

ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও ভারতপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের মন্তব্যের কথা শুনেছি। তারা নাকি বলেন, 'আমরা বছরের পর বছর চেষ্টা করে যুবসমাজের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সঞ্চারের জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করি তা স্টেডিয়ামে পাক-ভারত খেলায়ই নস্যাৎ হয়ে যায়।'

তাদের এ মন্তব্য সঠিক নয়। ভারত সব সময় বাংলাদেশের প্রতি যে মনিবসুলভ আচরণ করে তাতে ঐ বুদ্ধিজীবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ছাড়া সর্বশ্রেণীর বাংলাদেশীই ভারত বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে বাধ্য হয়। স্টেডিয়ামে ঐ মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটে মাত্র।

এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ছাড়া কোন দলই ভারতকে বন্ধু মনে করে না সঙ্গত কারণেই। আদর্শের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ডান-বাম ও ইসলামী সকল রাজনৈতিক দলই দেশপ্রেমের স্বাভাবিক তাগিদেই ভারতকে এ দেশের বন্ধু মনে করে না। আর কেউ তা মনে করলেও জনগণের মনোভাবের কারণে প্রকাশ্যে বলার সাহস পায় না।

২০০০ সালে ঢাকায় ক্রিকেট ফাইনাল খেলা হয় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। সরকার বিরোধী রোডমার্চ উপলক্ষে ঢাকা থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবপুর পর্যন্ত দীর্ঘ সড়ক পথে বহু জায়গায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পতাকা পাশাপাশি উড়ছে দেখে বিস্মিত হলাম। জিজ্ঞেস করে জানা গেলো যে, ঢাকায় ক্রিকেট খেলার উৎসাহীদের যারা পাকিস্তানের সমর্থক তারাই পতাকা তুলেছে। কোন কোন স্থানে পাকিস্তান বিজয়ী হলে গরু যবেহ করে উৎসব করবে বলেও জানা গেলো।

ফাইনাল খেলার দিন আমি ঢাকায় ছিলাম। আমার শোবার ঘরে পত্রিকা পড়ছি। আমার স্ত্রী, পাক ঘরে কাজের মেয়ে, কাজের ছোট ছেলে সালমানের ঘরে টিভিতে খেলা দেখছে। আমার উপস্থিতির কারণে আমার ঘরে খেলা না দেখে পাশের ঘরে দেখছে। আমার খেলা দেখার অভ্যাস বা শখ না থাকলেও খেলার অবস্থা জানার জন্য মাঝে মাঝে খবর নিচ্ছিলাম। যে দল জিতলে দেশের জনগণ ও স্টেডিয়ামের দর্শকরা খুশি হবে আমাকেও সে দলের সমর্থকই মনে হলো। আমি তো আর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নই।

বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, পাশের ঘরের দর্শকরা উভয় দলের খেলোয়াড়দের নাম ধরে মন্তব্য করছে। ভারতের অমুক আউট হয়েছে বলে উল্লাস প্রদর্শন করছে এবং পাকিস্তানের অমুক চমৎকার বোলিং করেছে বলে গৌরব প্রকাশ করছে। আমি না জানলেও খেলোয়াড়দের নাম ওরা সবাই জানে।

পাড়ার আশেপাশের সব বাড়ি থেকেই টিভি দর্শকদের হৈচৈ শুনতে পাচ্ছিলাম। ৮ তলায় জানালার পাশে বসে তাদের অবস্থানও লক্ষ্য করছিলাম।

এ খেলায় যখন ভারত জিতে গেলো তখন পাশের ঘরে ও পাড়ায় কবরের নীরবতা লক্ষ্য করলাম। খেলার ফলাফলে আমিও খুশি হতে পারলাম না। কিন্তু বাড়ির সবার চেহারায় শোকের স্পষ্ট ছাপ দেখে আমাকে সান্ত্বনা দিতে হলো। বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলা সত্যিই ভয়ানক জনপ্রিয়। আমার মতো বেরসিকদের কথা অবশ্য আলাদা।

ক্রিকেটপ্রেমিক সালমান থেকে জানতে পারলাম যে, পাকিস্তান ভারতে এসে কয়েকবারই খেলেছে; কিন্তু কাশ্মীরের প্রতি পাকিস্তানের জনগণের আবেগের ভয়ে ভারত পাকিস্তানে গিয়ে খেলতে রাজি হচ্ছে না। ক্রিকেট খেলা ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ঐক্যের ভূমিকা পালনের পরিবর্তে দূরত্বই বৃদ্ধি করেছে। এ ক্ষেত্রে অন্তত সালমানের ক্রিকেট-দর্শনের সমর্থন পাওয়া গেলো না। এখানে খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনীতির প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে রাজনৈতিক বৈরিতা এতো প্রবল এবং ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত তীব্র যে ক্রিকেটের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মানুষের মধ্যে যতটুকু ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে এর সামান্য প্রভাবও পাক-বাংলা-ভারতের জনগণের মধ্যে ফেলত সক্ষম হয়নি।

আমার ছাত্রজীবনে কোলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগানের মধ্যে ফুটবল খেলার যেমন রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল, বর্তমানে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতাও অনুরূপ রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করছে। আমি আরও লক্ষ্য করেছি যে, ঢাকা স্টেডিয়ামে ভারত যে দলের সাথেই খেলুক দর্শকরা সবাই ভারতের প্রতিপক্ষকে সমর্থন করে। ভারতের পরাজয় যেন সবার কাম্য। এদেশের জনগণ ভারতের এমন চরম বিরোধী জেনেও আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রীরা ভারতকে বন্ধু মনে করে। জনগণ কি তাহলে সবাই রাজাকার? তাহলে দেশপ্রেমিক কারা?

১৮.

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা

তখন পূর্ববঙ্গে ঢাকায়ই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো। আর প্রধান কলেজ ছিলো কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, বরিশাল বিএম কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ ও মোমেনশাহীর এমএম কলেজ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে পাঁচটি কলেজকে প্রিমিয়ার কলেজ হিসেবে গণ্য করা হতো; যার মধ্যে চারটি পূর্ববঙ্গে আর পঞ্চমটি প্রেসিডেন্সী কলেজ কোলকাতায়।

১৯৪৪ সালে ঢাকা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ পাস করলাম। সম্ভবত মে মাসে পরীক্ষার ফল প্রকাশ পায়। সেকালের অবিভক্ত বঙ্গদেশে সকল কলেজই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিলো। কিন্তু ঢাকা শহরের সকল জেনারেল কলেজ এবং সারা বঙ্গদেশে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলো ঢাকা বোর্ডের অধীনে ছিলো। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বোর্ডে ফার্স্ট গ্রেডের দশ জনের মধ্যে সাত জনই ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে বৃত্তি পায়, যার মধ্যে আমিও একজন। এ কলেজ থেকে যারা পাস করেছে তারা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হয়।

কোন্ বিষয়ে অনার্স নেওয়া হবে

আজকাল অনেকেই সন্তানদেরকে কোন্ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হবে তা অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা করেন। আমাদের সময়ে তেমন কোন পরিকল্পনা অন্তত আমার বেলায় হয়নি। আমার আব্বা একটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতেন। তা হচ্ছে আরবী, ইংরেজি ও বাংলা তিনটি ভাষাই ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। তাহলে জীবনে যে কোনো দিকেই উন্নতি সম্ভব। আমি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে কী হবো সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ছিলো না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ বিষয়ে অনার্স পড়ব সে সব বাছাই করার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। স্কলারশিপ যারা পায় তাদের অনার্স পড়তেই হতো। স্কলারশিপ তিন বছরের জন্য ছিলো। অনার্স না পড়লে স্কলারশিপ পাওয়ার অধিকারী হতো না।

অনার্সের বিষয় নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পরামর্শ নেবার জন্য আমরা কয়েকজন আমাদের ইংরেজির প্রিয় অধ্যাপক সৈয়দ মইনুল আহসানের নিকট নাজিমুদ্দীন রোডস্থ হাসিনা মঞ্জিলে গেলাম। তিনি শিক্ষক হিসেবে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। আমার ঐচ্ছিক বিষয় ইংরেজি থাকায় তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিলো। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনার্স পড়ার জন্য ইংরেজি অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আমাদের ইংরেজির অধ্যাপক আমাদেরকে প্রায় দশ মিনিট বক্তৃতা করে

আরবীতে অনার্স নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। বক্তৃতায় তিনি আরবীর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বললেন যে, চাকরির ময়দানে উচ্চ শিক্ষার পর দুটো ক্ষেত্রই প্রধান। একটি হলো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, আর একটি হলো সরকারি চাকরি।

শিক্ষার দিক দিয়ে হিন্দুরা আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর। তাই প্রতিযোগিতায় উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সাথে কুলিয়ে ওঠা কঠিন। শিক্ষাঙ্গনেই বেশি কঠিন। সরকারি চাকরিতেই বরং সম্ভাবনা বেশি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসেবে আমাদের সরকার মুসলিম প্রধান ছিলো। মুসলিমদেরকে বেশি সংখ্যায় চাকরি দেবার জন্য সরকার আগ্রহী ছিলো। কিন্তু প্রতিযোগিতায় যদি হিন্দুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারা যায় তাহলে সমস্যা। তোমরা যেহেতু ভালো ছাত্র তোমাদের জন্য বিসিএস-কেই টার্গেট বানানো উচিত। বিসিএস-এর কম্পিটিশনে বেশি নম্বর পেতে হলে একটি বিষয় অবশ্যই আরবী থাকা প্রয়োজন। আরবীতে শতকরা আশি-নব্বই নম্বরেরও বেশি পাওয়া সম্ভব। তাই আরবীতে অনার্স নিলে প্রতিযোগিতায় বেশি নম্বর অর্জন করা সহজ হবে। এ কারণে আরবীতে অনার্স নেয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। তবে সাবসিডিয়ারি ইংলিশ, পলিটিক্যাল সাইন্স, ইকনমিক্স ইত্যাদি থাকলে অন্যান্য দিক দিয়ে কোনো অসুবিধে হবে না।

পাকিস্তান আন্দোলন তখন এতটা দানা বাঁধেনি। নিকট ভবিষ্যতে পাকিস্তান কায়েম হয়ে যাবে তখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট এরকম কোন লক্ষণও দেখা যায়নি। ব্রিটিশ ভারতে ঐ পরিবেশে তিনি যে পরামর্শ দিলেন তা আমাদের নিকট যুক্তিপূর্ণ মনে হলো। ফলে আমরা বেশ কয়েকজন আরবীতে অনার্স নিলাম। আমি ইংরেজি ও পলিটিক্যাল সাইন্সকে সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে বাছাই করলাম।

কোন্ হলে ভর্তি হব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকেই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেশিরভাগই হলে থাকে। যারা হলে থাকে না তারা মেসে অথবা লজিং-এ যেখানেই থাকুক হলের মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। হলে যারা থাকে তারা রেসিডেন্ট স্টুডেন্ট; বাইরে যারা থাকে তারা এটাচ্‌ড স্টুডেন্ট। এটাই আবাসিক হলের বৈশিষ্ট্য। এই উভয় ধরনের ছাত্ররাই হল ইউনিয়ন নির্বাচনে ভোটার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন ৪টি মাত্র হল ছিলো। দুটো হিন্দু হল ও দুটো মুসলিম হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনার সময় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও জগন্নাথ (হিন্দু) হল নামে দুটো হলই ছিলো। পরবর্তীকালে ফজলুল হক মুসলিম হল ও ঢাকা হিন্দু হল। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন বিশ্বযুদ্ধ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকায়ও জাপান বিমান বাহিনী বোমা ফেলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভবনের চারভাগের তিন ভাগ হাসপাতালে পরিণত হয়

এবং একভাগ মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলে থাকে। গোটা সলিমুল্লাহ মুসলিম হল (এসএম হল) সেনাবাহিনী দখল করে নিলো। বর্তমানে ফজলুল হক মুসলিম হল যে জায়গায় অবস্থিত পূর্বে সেটা ঢাকা কলেজের হোস্টেল ছিলো। তখন পুরাতন হাইকোর্ট ভবন ছিলো ঢাকা কলেজ। ফজলুল হক মুসলিম হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভবনের একাংশে অবস্থিত ছিলো। যুদ্ধের প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের জন্য ছেড়ে দিতে হলো তখন ফজলুল হক মুসলিম হল ঢাকা কলেজ হোস্টেলে স্থানান্তরিত হয়। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল তখন ৩টি পৃথক পৃথক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। যার একাংশ ঢাকা কলেজ হোস্টেলের ইস্টার্ন বিল্ডিং-এ স্থান লাভ করে, অপর দুই অংশ বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবন ও সিদ্দিক বাজারের একটি বিল্ডিং-এ স্থানান্তরিত হয়।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সুনাম ও অত্যন্ত সুরম্য বিল্ডিং-এ অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ হল কয়েক জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে স্থানান্তরিত হওয়ায় এ হলে ভর্তি হওয়া আমি সঠিক মনে করিনি। যে সব বিল্ডিং-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস অনুষ্ঠিত হতো সেগুলো ঢাকা কলেজ হোস্টেলের নিকটে। আর সে হোস্টেলেই ফজলুল হক মুসলিম হল স্থানান্তরিত হওয়ায় এ হলেই ভর্তি হওয়া আমি সমীচীন মনে করলাম।

তখন ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভোস্ট ছিলেন ড. মাহমুদ হোসাইন। তিনি ইতিহাস বিভাগের রীডার ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও হয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভিসি ছিলেন। ১৯৫৭ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সাথে তাঁর শেষ দেখা। ইনি ছাত্রদেরকে খুবই ভালোবাসতেন। খোলামেলা আলাপ করতেন। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। তার বড় ভাই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জাকির হোসাইন দিল্লীতে জামিয়া মিল্লিয়া কায়েম করেন। পণ্ডিত নেহেরুর সময়ে তিনি ভারতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

ফজলুল হক মুসলিম হলের ২ জন হাউস টিউটর ছিলেন। এর একজন হলেন অর্থনীতি বিভাগের লেকচারার জনাব মাজহারুল হক (পরবর্তীকালে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. মাজহারুল হক); আর একজন ড. এএইচ তালুকদার। একদিন মাজহারুল হক সাহেব অফিসে আমাকে ডেকে বললেন, আপনার মতো একজন মেধাবী ছাত্র আরবীতে অনার্স নিয়ে জীবনটাকে কেন নষ্ট করলেন? তার বাড়ি ছিলো দাউদকান্দি। কুমিল্লা জেলার লোক হিসেবে দরদের সঙ্গে এ কথা বললেন। তিনি আরো বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে যারা ভর্তি হয় তারা মাদ্রাসা পাস করেই আসে এবং ভার্সিটি ডিগ্রি নেয়ার প্রয়োজনে কিছু সহজ বিষয় সাবসিডিয়ারি হিসেবে নেয়। যারা আধুনিক বিষয়ে অনার্স পড়ে তারাও সাবসিডিয়ারির জন্য সহজ

বিষয় নেয়। আপনি ঠিক উল্টো কাজ করলেন। ইংলিশ ও পলিটিক্যাল সাইন্স সাবসিডিয়ারি হিসেবে নিলেন এটা আমার নিকট বিস্ময়কর। আমি তখন তাকে আরবী অনার্স নেয়ার পটভূমি ব্যাখ্যা করলাম। তিনি মন্তব্য করলেন– 'It was a wrong advice from your English teacher.'

হাসিনা মঞ্জিল

আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখনই পয়লা হাসিনা মঞ্জিলে যাওয়ার সুযোগ হয়। প্রিন্সিপালের নিকট ছাত্রদের পক্ষ থেকে কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে আমরা একটা আন্দোলন শুরু করি। এটা টের পেয়ে প্রিন্সিপাল সাহেব জানালেন যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্য লিখিতভাবে পেশ কর। সেকালে সবকিছু ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই করতে হতো। একটা ড্রাফট তৈরি করা হলো। আমাদের মধ্য থেকেই একজন প্রস্তাব করলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন নামে তার পরিচিত একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ছাত্র, তিনি ইংরেজি ভাষায় দক্ষ তাই এটা তাকেই দেখানো দরকার। সে উপলক্ষে ৫/৬ জন ছাত্র তার সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি হাসিনা মঞ্জিলেই থাকতেন। তিনি আমাদের ড্রাফট নিয়ে অনেক কাটাকাটি করে সংশোধন করে দিলেন। তার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠার সুযোগ হয়নি। পরবর্তীকালে '৭১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তার সাথে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়।

পরের বছর যখন আইএ ক্লাসে পড়ি তখন আমাদের ইংরেজির অধ্যাপক সৈয়দ মইনুল আহসানের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হয়। মাঝে মাঝে হাসিনা মঞ্জিলে যেতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ ক্লাসে পড়ার সময় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের মাধ্যমেই সৈয়দ আলী আহসান ও সৈয়দ আলী আশরাফ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে পরিচয় ঘটে। তখন এক সময় জানতে পারলাম সৈয়দ মইনুল আহসান সৈয়দ আলী আহসানের আপন ফুফাত ভাই এবং সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন তার আপন খালাত ভাই।

সৈয়দ মইনুল আহসান সাহেবের ছোট ভাই সৈয়দ জিয়াউল আহসান ফজলুল হক মুসলিম হলের এটাচ্ড স্টুডেন্ট ছিলেন। তিনি হল ইউনিয়ন এক্টিভিটিস-এ ইন্টারেস্ট নিতেন। যার ফলে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়। '৪৬-৪৭ সেশনে আমি যখন ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়নের জিএস ছিলাম তখন সৈয়দ জিয়াউল আহসান একই ক্যাবিনেটে ডেপুটি স্পীকার ছিলেন। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, ফজলুল হক মুসলিম হলের সংবিধান কাঠামোগতভাবে অন্যান্য হলের থেকে ভিন্ন ছিলো। অন্যান্য হলের সংবিধান অনুযায়ী প্রভোস্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এবং ছাত্রদের নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) হতো। সম্ভবত ইউনিভার্সিটি ও হল ইউনিয়নে এ নিয়মই চালু আছে। হল ইউনিয়নে প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রভোস্ট সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন

করেন। কিন্তু এফএইচ হলে পার্লামেন্টারি সিস্টেম অব গভর্নমেন্ট-এর বাস্তব ট্রেনিং দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইউনিয়নের অধিকাংশ সভায় স্পীকার সভাপতিত্ব করতেন। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার ছাত্রদের দ্বারাই নির্বাচিত হতো। এখন আর ফজলুল হক মুসলিম হলে এ নিয়ম চালু নেই। সৈয়দ জিয়াউল আহসান ডেপুটি স্পীকার থাকাকালে হাসিনা মঞ্জিলে যেতে হতো। আরো পরবর্তীকালে সৈয়দ জিয়াউল আহসান-এর ছোট ভাই এডভোকেট সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসান নেজামে ইসলাম পার্টির অন্যতম নেতা থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টির যৌথ কার্যক্রম উপলক্ষে হাসিনা মঞ্জিলে গিয়েছি। এভাবেই ছাত্রজীবন থেকে পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক জীবনেও হাসিনা মঞ্জিলে আমার যাতায়াত ছিলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে স্কুল জীবন থেকেই যে উচ্চ ধারণা ছিলো তার ফলে অত্যন্ত আবেগ নিয়ে এবং শেখার প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে ক্লাসে হাজির হওয়া শুরু করলাম। আমার বিষয়ের মধ্যে আরবী অনার্সের আটশত নম্বর, সাবসিডিয়ারি ইংরেজিতে ৩০০ নম্বর, পলিটিক্যাল সাইন্সে ৩০০ নম্বর এবং সকল ছাত্রদের জন্য বাংলায় বাধ্যতামূলক ১০০ নম্বর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংরেজি ও বাংলা– এ তিন বিষয়ে আমার শিক্ষকদের সবাই হিন্দু ছিলেন। ক্লাসে তাদের লেকচার শুনে বেশ উৎসাহ বোধ করতাম। লেকচারগুলোর সারমর্ম আমি খুব যত্ন সহকারে নোট করতাম। পরীক্ষার সময়ে এই নোট সবচেয়ে সহায়ক বলে আমার মনে হতো। যারা পড়াতেন তারাই প্রশ্ন করতেন। তাই আমার নোট করার অভ্যাস খুবই কার্যকর বলে অনুভব করতাম। পরীক্ষার কাছাকাছি সব প্রস্তুতির জন্য মূল বই পড়ার সময় পাওয়া সম্ভব নয়। এ সব নোটই আমার প্রধান সম্বল ছিলো। যে বিষয়টা পড়ানো হবে আগের রাত বা দিনে পড়ে নিতাম তাই ক্লাসে টিচারের Lecture শুনবার সময় মনে হতো বিষয়টা আমার নিকট খুবই পরিষ্কার এবং এ জন্যই নোট করা আমার জন্য সহজ হতো।

সেক্সপিয়ারের যে বইটি আমাদের পাঠ্য ছিলো সে বই সরাসরি পড়াবার পূর্বে একাধারে ৫ দিন পর্যন্ত সেক্সপিয়ার সম্পর্কে লেকচার দেওয়া হয়। সেক্সপিয়ারের চিন্তধারা, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গেলাম। তেমনিভাবে যিনি আমাদেরকে ইংরেজি কবিতা পড়াতেন তিনিও ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, বাইরন এদের সম্বন্ধে লেকচার দেওয়ার পর তাদের কবিতার উপর আলোচনা করতেন।

পলিটিক্যাল সাইন্সের Teacher-দের লেকচার খুবই আকর্ষণীয় মনে হতো। কিছু জ্ঞান অর্জন করছি বলে অনুভব করতাম। এমনিভাবে বাংলা ক্লাসেও টিচারদের থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় পাওয়া যেতো।

এ তিনটি বিষয়ের শিক্ষকদের লেকচার যাতে মিস না হয় সে ব্যাপারে আমি খুব সচেতন ছিলাম। বিভিন্ন কারণে অন্য যে কোনো ব্যস্ততাই থাকুক ক্লাসে নিয়মিত

হাজির হওয়া, নোট করা আমার নেশায় পরিণত হলো। এমনকি পরবর্তীকালে হল ইউনিয়ন এক্টিভিটিতে দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতাম না। কোনো অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে ক্লাস মিস হলে সহপাঠীদের যাদেরকে ভালো ছাত্র মনে করতাম তাদের কাছ থেকে শুনে নোট করতাম।

কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তি বোধ করতাম আরবী শিক্ষকদের ক্লাসে। ৮ পেপারের মধ্যে ১ পেপার ছিলো ইসলামিক ফিলসফি। এর শিক্ষক প্রফেসর সৈয়দ জিলানী মধ্য ভারতের লোক ছিলেন। একমাত্র তার ক্লাসটাই উপভোগ করতাম। আর যারা আরবী পদ্য ও আরবী গদ্য পড়াতেন তারা লেকচার দিতেন না, তারা পাঠ্যবইয়ের ইংরেজি অনুবাদ খাতা থেকে পড়ে শুনাতেন। শ্রুতলিপি লেখাতেন। আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য এটুকু মোটেই সহায়ক ম ন হয়নি। আরবী ভাষার কোনো শিক্ষকও আরবীতে কখনো লেকচার দেননি। আমার তো আশা ছিলো যে, ইংরেজি শিক্ষকরা যেভাবে ইংরেজিতে লেকচার দেন আরবী ভাষার শিক্ষকরাও সেভাবে আরবীতে লেকচার দেবেন। কিন্তু আরবীতে লেকচার তো দূরের কথা পাঠ্য বইতে লেখা আরবীটুকুও বই দেখে দেখে পড়াতেন।

আরবী গদ্য ও পাঠ্যবইগুলোর ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রিত ছিলো না। এতো অল্পসংখ্যক ছাত্রের জন্য কোনো প্রকাশকের পক্ষে এ কাজ লাভজনক ছিলো না। শিক্ষকগণ মাকামাতে হারিরী (গদ্য) ও সাবায়ে মুয়াল্লাকার মতো পদ্যের ইংরেজি অনুবাদ শিক্ষকদের নোটবই থেকে পড়ে শুনাতেন আর আমরা তা লিখতাম। আমার মনে হতো Dictionary-র সাহায্যে অনুবাদ করার কাজটুকু আমি নিজেই করতে পারি। আরবী ব্যাকরণ যিনি পড়াতেন তিনি খুব ভালোই পড়াতেন কিন্তু আরবী ভাষা শিক্ষা না হলে উচ্চমানের ব্যাকরণ অর্থহীন। ব্যাকরণ ভাষা শিক্ষা দেয় না, ভাষা বিশুদ্ধকরণে সাহায্য করে মাত্র। ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় ঐ ব্যাকরণ আমার নিকট এক বোঝা মনে হতো। আব্দুর রহমান কাওকাবী নামক বিখ্যাত লেখকের কুরআনের অনুকরণে লিখিত একটি বই আমাদের পাঠ্য ছিলো। যে শিক্ষক এ বইটি পড়াতেন তিনি কুরআন তেলাওয়াতের মতোই সুমধুর কেরাত করে শুনাতেন। কিন্তু বইটির উপর কোন বক্তব্য না রেখে শুধু আরবীর ইংরেজি অনুবাদ নোট করিয়ে দিতেন। তিনি যখন ক্বেরাত করে পড়ে শুনাতেন তখন দুষ্ট ছেলেদের মধ্যে কেউ মারহাবা, কেউ সুবহানাল্লাহ বলে ঠাট্টা করতো। এতে তিনি বিব্রতবোধ করতেন না। ৬ মাস পর্যন্ত এভাবেই চললো। অন্যসব বিষয়ে ক্লাস করা, বই পড়ায় খুব উৎসাহ বোধ করছি। কিন্তু আরবী অনার্স ক্লাসগুলোতে বিতৃষ্ণা বেড়েই চললো।

মহাচিন্তায় পড়লাম

আমি তীব্রভাবে অনুভব করলাম যে, আরবী অনার্স পড়া অর্থহীন। আইএ পাস করা পর্যন্ত আরবী ভাষা যেটুকু আয়ত্ত করেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ মাসে ভাষা শিক্ষার

ব্যাপারে সামান্যও অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে হলো না। আরবী অনার্স বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ে অনার্স নেওয়া সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিলাম। আরবীর বদলে অনার্স নিতে হলে আমার হয় ইংরেজি অথবা Political science. নিতে হয়। গত ৬ মাসে এ দু'বিষয়ে আমার আগ্রহ সমান হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক একুট বেশি মনে হলো। এ বিষয়ে অনার্স নেওয়া যায় কিনা জানার জন্য বিভাগীয় প্রধান প্রফেসার ডিএন ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করলাম। আমি তার বিষয়ে অনার্স নিতে চাই শুনে খুশি হলেন এবং দরখাস্ত করতে বললেন। কিছুদিন পর উনি জানালেন এ বছর এ সেশনে তোমাকে ভর্তি করা সম্ভব নয়। যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে আগামী বছর জুলাই মাসে ভর্তি হতে পার। যে পরিমাণ ক্লাস নেওয়া প্রয়োজন সে পরিমাণ ক্লাস তোমার পক্ষে এ সেশনে পূরণ করা সম্ভব নয়। খুবই পেরেশান হয়ে গেলাম। ছাত্রজীবন থেকে একটি বছর নষ্ট হয়ে যাক তা হঠাৎ মেনে নিতে পারলাম না। অপরদিকে আরবী অনার্স পড়া অব্যাহত রাখার জন্য মনকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না। আরো খবর নিয়ে জানলাম, অনার্স না পড়ে পাস কোর্সে বিএ পড়লে একদিকে স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে যাবে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতনও দিতে হবে। এদ্দিন স্কলারশিপও পাচ্ছিলাম, ইউনিভার্সিটির বেতনও মাফ ছিলো। শীতের ছুটিতে চান্দিনায় গেলাম। আমার এ সমস্যা সম্পর্কে আব্বার কাছে কিভাবে বলবো সেটা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

আরবী অনার্স নেওয়ায় আব্বা খুব খুশি হয়েছিলেন। আব্বা আরবী অনার্স ত্যাগ করতে দেবেন কিনা সেটা আমার বড় সমস্যা ছিলো। তদুপরি বৃত্তির টাকা যা পেতাম সে টাকা আব্বার থেকে চাইতে হবে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনের টাকাও চাইতে হবে, সেটাও আর একটি সমস্যা।

অনেক ভেবে-চিন্তে আব্বাকে রাজি করানোর জন্য কয়েকদিন পর্যন্ত আমার বক্তব্য বুঝাবার চেষ্টা করছিলাম। এতোটা চিন্তান্বিত ছিলাম যে, খাওয়া-ঘুম নিয়মিত হচ্ছিল না। আমার এ অস্বাভাবিক অবস্থা আব্বার চোখ এড়ায়নি। তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে? আব্বার প্রশ্ন শুনে আমার চোখে পানি এলো। এতে আব্বা আরো উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। আমি অকপটে আমার গোটা সমস্যার কথা বিস্তারিত পেশ করলাম।

আমার ব্যাপারে আব্বার এতো আস্থা দেখে অভিভূত হলাম। তিনি বললেন, তুমি লেখাপড়ায় ভালো করো এটাই আমার কামনা। টাকার দিক দিয়ে ক্ষতি হবে এটাও আমার নিকট বড় কথা নয়। মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লেখাপড়া করা সম্ভব হয় না। তুমি যা ভালো মনে করো সিদ্ধান্ত নিতে পারো, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। মনের বিরাট বোঝা হালকা হয়ে গেলো। আব্বার সামনে তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম অনার্সের বিষয় বদলাতে গিয়ে এক বছর নষ্ট করবো না। পাস কোর্সেই বিএ ডিগ্রি নিয়ে এরপর এমএ পড়বো।

১৯.

ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা

১৯৪০-এর জানুয়ারিতে ঢাকা সরকারি ইসলামী ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ক্লাস নাইনে ভর্তি হয়ে কলতাবাজার হোস্টেলে থাকাকালে এক বছরেই তিনবার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা দেখেছি। আগেও উল্লেখ করেছি যে, রাতে হিন্দুদের আক্রমণের আশঙ্কায় আমরা পালাক্রমে পাহারা দিয়েছি।

এ দাঙ্গার ফলে সেকালের ঢাকা শহর হিন্দুপ্রধান ও মুসলিম প্রধান এলাকায় বিভক্ত হয়ে পড়লো। দাঙ্গা শুরু হলে হিন্দুপ্রধান এলাকার মুসলমানরা এবং মুসলিমপ্রধান এলাকার হিন্দুরা সাবধানে চলাচল করতো। নেতৃস্থানীয়রা এলাকা থেকে সরে থাকতো।

দাঙ্গার ধরন এমন ছিলো না যে, দল বেঁধে একদিকে হিন্দু আর অপরদিকে মুসলমান সামনাসামনি লড়াই করছে। এমন চিত্র আমি কখনো দেখিনি। দাঙ্গার সূচনা এভাবে হতো যে, খবর পাওয়া গেলো অমুক জায়গায় একজন মুসলমানকে ছুরি মেরে খুন করে ফেলেছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সবাই সতর্ক হয়ে চলাফেরা করা কর্তব্য মনে করতো। এরপর মুসলিমপ্রধান এলাকায় হিন্দুকে এবং হিন্দুপ্রধান এলাকায় মুসলমানকে খুন করার খবর মুখে মুখে প্রচার হতো।

ঢাকার আদিবাসী মুসলমানদের মধ্যে যারা একটু সন্ত্রাসী প্রকৃতির তাদের মধ্যে তখন মুসলিম জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হতো হয়তো। নামায রোযার ধারও ধারতো না, কিন্তু একটা মুসলমানকে মারলে ১০ টা হিন্দু মারার জযবা নিয়ে ছুরি হাতে বের হয়ে পড়তো।

একবার কলতাবাজার হোস্টেলে খবর পৌঁছল যে, রায়সাহেব বাজার ও নওয়াবপুর রোডের সংযোগস্থলের পুলের উত্তর পাশের মসজিদে হিন্দুরা শূকরের মাংস ফেলেছে এবং মসজিদের উপর হামলা করেছে। আমরা কয়েকজন দৌড়ে গেলাম। আমাদের গলির মাথায় জনসন রোড। মাথায় রুমাল ও কোমরে গামছা বাঁধা দু'জন যুবক আমাদেরকে এগুতে বাধা দিলো। আমরা জানতে চাইলাম কী হয়েছে। বলল, 'মালাউনরা আইছিল মজিদে হামলা করবার লাইগা। হালারা আমাগো দেইখা পালাইছে।' আমরা লক্ষ্য করলাম গলির মুখ থেকে পুলের উপর পর্যন্ত ৮/১০ জন ছুরি হাতে টহল দিচ্ছে। মুসুল্লী ও ভদ্র পোশাক পরা কাউকে আশেপাশে দেখা গেলো না। গেঞ্জি বা ফতুয়া গায়ে, লুঙ্গিপরা, কোমরে গামছা বাঁধা ও মাথায় রুমাল বাঁধা যুবকরাই হিন্দু গুণ্ডাদেরকে তাড়াবার দায়িত্ব পালন করছে। মসজিদের ইয্যত রক্ষার জন্য ওরা জান দিতে প্রস্তুত। অশিক্ষিত হলেও এদের মধ্যে যে ঈমানী জযবা রয়েছে এর ভিত্তিতে সাধারণ মুসলমানদেরকে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

এদের জযবার কারণেই পাকিস্তান কায়েম হয়েছিলো। পাকিস্তানের নেতারা ইসলামের দোহাই দিয়েই মুসলিম জনগণের সমর্থন পেয়েছিলেন। তারা যদি ক্ষমতাসীন হবার পর জনগণের এ জযবাকে ভিত্তি করে তাদেরকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করতেন তাহলে দেশ ও জাতি বর্তমান দুরবস্থায় পতিত হতো না।

কোথাও কোন হিন্দু বা মুসলমান নিহত হবার খবর ছড়াবার সাথে সাথেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় হত্যার ঘটনা ঘটতে থাকতো। নিরীহ ও নির্দোষ মানুষ বিনা কারণেই হত্যার শিকার হতো। তখন ভারতে ব্রিটিশ সরকার থাকলেও প্রাদেশিক সরকার এদেশীয়রাই পরিচালনা করতো। দাঙ্গা শুরু হলেই সম্ভাব্য সব জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করা হতো। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতো।

দাঙ্গার আতঙ্ক এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে, কোথাও লোকজনকে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখলে দাঙ্গা হচ্ছে মনে করে সবাই নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে দৌড়াতো। একবারের কথা মনে পড়ে। সদরঘাট ও বাংলাবাজারের সংযোগ পথে হঠাৎ মানুষকে দৌড়াতে দেখে আমরাও কয়েকজন দৌড়ে ভিক্টোরিয়া পার্কে এসে থামলাম। কী ঘটেছে জানার জন্য ধীরে ধীরে সদরঘাটের দিকে এগুলাম। সবাইকে স্বাভাবিক অবস্থায় চলাচল করতে দেখে এগুতে থাকলাম। যেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিলাম সেখানে পৌঁছে জানা গেলো যে, একটা বাছুর এক কলার ঝুড়ি থেকে কলা নিলে কলাওয়ালার তাড়া খেয়ে বাছুরটি যখন ভাগছিলো তখন কিছু লোক বাছুর থেকে সরে যাবার জন্য দৌড়াল। এ দৌড়াদৌড়ি দেখে অনেকেই দাঙ্গা লেগেছে মনে করে দৌড়াতে লাগলো। আমরা তাদের মধ্যেই গণ্য ছিলাম।

শহরে দাঙ্গা হলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে ১৯৪২ সালের পূর্বে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪২ সালে পয়লা সংঘর্ষ হয় এবং ফজলুল হক মুসলিম হলের নাযির আহমদ নামে নেতৃস্থানীয় এক ছাত্র ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। চট্টগ্রামের জনৈক বড়ুয়া ঘাতক ছিলো। আমি তখন আইএ ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমি ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম। প্রতি বছর হল ইউনিয়নের উদ্যোগে শহীদ নাযির আহমদ দিবস পালন করা হতো।

১৯৪৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আমরা খবর পেয়ে দৌড়ে যাই। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই দেখা গেলো আহত খোন্দকার মুশতাককে। তাকে দেখে ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভোস্ট ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন ও গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছিলেন।

১৯৪৬ সালে কোলকাতায় হিন্দুদের হাতে মুসলমানদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকার চকবাজার ও অন্যান্য মুসলিম প্রধান এলাকায় হিন্দুদের দোকান-পাট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হিন্দু প্রধান এলাকায় হিন্দুরাও মুসলমানদের দোকান-পাট জ্বালায়।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর বছর দেড়েক ঢাকায় কোন দাঙ্গা হয়নি। কিন্তু হিন্দুস্তানে বারবার মুসলিম হত্যার খবরে ঢাকায় '৪৯ সালে কয়েকবার দাঙ্গা সৃষ্টি হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বছর কোন ফাইনাল পরীক্ষাই হতে পারেনি।

আমার এমএ ফাইনাল পরীক্ষা ১৯৪৮ সালের শেষ দিকেই দেবার কথা ছিলো। ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন ও অন্যান্য কতক ব্যস্ততার দরুন পরীক্ষার প্রস্তুতি সন্তোষজনক না হওয়ায় ঐ বছর পরীক্ষা দিলাম না। '৪৯ সালে পরীক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে বছর দাঙ্গা পরিস্থিতির দরুন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো না। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে '৪৯ সালের ফাইনাল পরীক্ষা হয় এবং '৫০-এর ডিসেম্বরে সে বছরের এমএ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আমি ১৯৫০-এর মার্চে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নেই। '৪৮ সালে পরীক্ষা না দেবার ফলে আমার ছাত্র জীবন দু'বছর দীর্ঘায়িত হয়ে গেলো। যার মধ্যে এক বছরের জন্য দাঙ্গাই দায়ী।

ভারতে আরও বহুবার মুসলিম নিধন দাঙ্গা হলেও ঢাকায় এরপর কেবল '৬৪ সাল ছাড়া কোন বছরই দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। কোথাও কোন মহল দাঙ্গার সূচনা করতে চাইলেও প্রবল জনমতের ফলে তা ব্যর্থ হয়েছে।

২০.

১৯৪০ থেকে ৪৬ ঃ ঢাকার রাজনীতি

১৯৩৯ সালে আমি যখন ক্লাস এইটের ছাত্র তখনই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শরীক হই। কুমিল্লায় মুসলিম লীগের তৎপরতার কারণেই এ সুযোগ হয়। কিছুদিন পরপরই মিছিল-জনসভা অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু ৪০ সালে ঢাকায় এসে মুসলিম লীগের কোন তৎপরতা না দেখে বিস্মিত হই। মুসলিম লীগ নেতা কারা তাদের নামও শুনতে পাইনি। কোলকাতায় ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব আবুল হাশেমকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়। তিনি ঢাকায় এসে মুসলিম লীগকে গণসংগঠনে পরিণত করার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গে যুবক নেতৃত্ব গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন, টাঙ্গাইলের জনাব শামসুল হক নামে একজন কর্মতৎপর যুবককে তিনি বাছাই করেন।

মুসলিম লীগকে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলাকালেই জানা গেলো যে, মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ঢাকার নওয়াব বাড়ির ভেতরেই সীমাবদ্ধ। তাদের মূল নেতারা রাজনীতি করেন কোলকাতায়। ঢাকায় তাদের কোন কর্মতৎপরতা নেই। তাই ঢাকায় রাজনৈতিক কোন কার্যকলাপ দেখা যায়নি। জনাব আবুল হাশেম পূর্ববঙ্গের জেলাগুলোতে মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেন তা হলো

নওয়াব বাড়ির বাইরে মুসলিম লীগের অফিস স্থাপন। ইসলামপুর ও চকবাজারের মাঝামাঝি ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে দোতলায় এ অফিস স্থাপিত হয়। সেখানে মুসলিম লীগের কর্মী শিবির কায়েম করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এমএ পাস করা জনাব শামসুল হক এই শিবিরের প্রধান নেতা মনোনীত হন। তার সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন কুমিল্লার খোন্দকার মুশতাক আহমদ, মুন্সীগঞ্জের শামসুদ্দীন আহমদ, ঢাকা জেলার তাজ উদ্দীন আহমদ এবং টাঙ্গাইলের শওকত আলী এবং আরো কয়েকজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে আমার হলের এটাচ্ড (যারা হলে আবাসিক নয়) দু'জন ছাত্র তাজউদ্দীন ও নাইমুদ্দীনকেই বেশি সক্রিয় দেখেছি। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে হ্যান্ডবিল বিলি করা, সাপ্তাহিক মিল্লাত পত্রিকা বিক্রয় করা ইত্যাদি তৎপরতার মাধ্যমে ছাত্রদেরকে মুসলিম লীগের কর্মতৎপরতায় সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করতেন। আগেই বলেছি, তাজউদ্দীনের সঙ্গে স্কুল জীবনেই আমার পরিচয়। আর নাইমুদ্দীন ইন্টারমিডিয়েটে আমার ক্লাসফ্রেন্ড। তাই হলে আসলেই তারা আমার খোঁজ করতো। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে হল এলাকায় একাজে শরীক ছিলাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তারা যেভাবে সক্রিয় ছিলেন, আমি তেমন ছিলাম না। আমি হল ইউনিয়ন এক্টিভিটিতে শরীক থাকার সাথে সাথে নিয়মিত ক্লাসে হাজির থাকতাম। তাই রাজনৈতিক তৎপরতায় তাদের মতো এতটা অগ্রসর হইনি।

জনাব শামসুল হক

পূর্ববঙ্গের অর্গানাইজার হিসেবে শামসুল হক সাহেব খুবই কর্মতৎপর ছিলেন। মাঝে মাঝে হলে এসে আমাদেরকে পাকিস্তান আন্দোলনে অধিকতর সক্রিয় হওয়ার জন্যে তাগিদ দিতেন। যদিও আমি তাঁর ডাকে পুরোপুরি সাড়া দিতে পারিনি, তবুও তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিলো। দেখতে তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। দীর্ঘদেহী, আকর্ষণীয় চেহারা, সদা হাসিমুখ, ফর্সা রং-এর এ লোকটির আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা না করে পারা যায় না। দেখা হলেই হাসিমুখে দু'হাত বাড়িয়ে কোলাকুলি করে বলতেন এ আন্দোলনে শরীক না হলে মুসলমানদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। শহরে সাইকেলে আমার চলাফেরা করার সময়েও পথে দেখা হয়ে গেলে না থেমে উপায় ছিলো না। কারণ তাঁকে অন্তর দিয়েই ভালোবাসতাম। তাঁর হাসিমুখ, মিষ্টি কথা এড়িয়ে চলার সাধ্য আমার ছিলো না। আমি নিজেকে তাঁরই একজন নগণ্য কর্মী মনে করতাম। তাঁর দাবি অনুযায়ী কাজ করতে পারতাম না বলে দেখা হলে লজ্জিত হতাম। একবার আমি সাইকেলে চলছি। প্রচণ্ড রোদ ছিলো। তাই একহাতে সাইকেল আরেক হাতে ছাতা নিয়ে চলছিলাম। ফুলবাড়ীয়া রেল স্টেশনের কাছেই তাঁকে দেখে থামলাম। এগিয়ে এসে বললেন, আমার তো ছাতাও নেই সাইকেলও নেই আমি তো পায়ে হেঁটেই চলছি। আমাকে হয় ছাতাটা দিন না হয় সাইকেলটা দিন। আমি বললাম, আপনি পছন্দ করলে দুটোই নিয়ে যান। তিনি জোরে হ্যান্ডসেক করে সালাম দিয়ে চলে গেলেন।

আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসনামলে তাঁকে অনেকবার এমন অবস্থায় দেখেছি যে দুঃখে চোখ ভিজে উঠতো। তাঁকে ভালোবাসতাম বলেই এ অবস্থায় দেখে বেদনায় মন ভরে যেতো। তাঁর হাতে একটা রসিদ বই ছিলো। যতটুকু মনে পড়ে তাতে লেখা ছিলো ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। দেখা হলেই রসিদ বইটি এগিয়ে দিতেন এবং কিছু দিলেই রসিদ ছিঁড়ে টাকাটা নিয়ে নিতেন। মানসিক দিক দিয়ে তিনি কবে কিভাবে অপ্রকৃতিস্থ হলেন সে বিষয়ে যা শুনেছি তা কতটুকু সত্য জানি না, তবে এমন একটি যোগ্য নিষ্ঠাবান মানুষের ঐ অবস্থার কথা মনে হলে এখনো আমি বেদনা বোধ করি। তিনি কোথায় কিভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন তা জানতে পারিনি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও তার সম্বন্ধে অনেক কথা না বলে পারলাম না। কারণ তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম ও অন্তর দিয়ে ভালোবাসতাম।

মুসলিম লীগকে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলোতে সংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁর বিরাট অবদান সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। তাঁরই ডাকে একদিন ১৫০ মোগলটুলীতে যাই। সেদিন সর্বপ্রথম আমি খাজা স্যার নাজিমুদ্দীনকে মুসলিম লীগ অফিসে বক্তৃতা করতে দেখলাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় তিনি কথা বলছিলেন। তিনি তখন মন্ত্রীও ছিলেন। সেখানে শামসুল হক সাহেব পূর্ববঙ্গের কাজের যে রিপোর্ট দিলেন তাতে খাজা সাহেব খুবই খুশি হয়ে তাঁকে মোবারকবাদ দিলেন।

শেরে বাংলার বিদ্রোহ

১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে (টু নেশন থিওরি) ভারত বিভাগের প্রস্তাব যিনি পেশ করেন তিনি শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। সে সময় তিনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের চিফ মিনিস্টার, গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের নিকট তখন থেকেই শেরে বাংলা নামে খ্যাত। ১৯৪৩ সালে যখন ২য় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা উপমহাদেশকে আঘাত করে তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল সকল প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীকে এ কাউন্সিলের সদস্য করে নেন। মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ কাউন্সিলে যোগদান থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলিম মুখ্যমন্ত্রীদেরকে নির্দেশ দেন। শেরে বাংলা এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন।

বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মধ্যে এ ঘটনাটি বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। শেরে বাংলা মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মুসলিম লীগ হাই কমান্ডের নির্দেশ অমান্য করায় তাকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে হিন্দু মহাসভা নেতা উগ্রপন্থী শ্যামা প্রসাদের সঙ্গে আঁতাত করে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা কায়েম করেন। শেরে বাংলার এ বিদ্রোহ ৪৫ ও ৪৬ সালের নির্বাচনে বিরাট ক্ষতি করতে না পারলেও দেশ বিভাগের সময় মুসলিম লীগ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেকেরই ধারণা রয়েছে যে, শেরে বাংলা বিদ্রোহ না

করলে হিন্দুরা বঙ্গদেশকে বিভক্ত করতে সক্ষম হতো না এবং বঙ্গদেশের রাজধানী কোলকাতাকেও হারাতে হতো না। বঙ্গ বিভাগ রোধ করতে না পারলেও অন্তত মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যেতো।

১৯৩৮-৩৯ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে শেরে বাংলা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় আইন পরিষদে যতবারই অনাস্থা প্রস্তাব পেশ হয়েছে ততবারই সারা বাংলায় মুসলমানগণ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে শেরে বাংলা মন্ত্রিসভার পক্ষে বিপুল সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। এ জাতীয় মিছিলেই আমি কুমিল্লায় শেরে বাংলা জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত মিছিলে অংশগ্রহণ করে একাধিকবার গলার স্বরভঙ্গের শিকার হয়েছি। সেই প্রিয় নেতা শেরে বাংলার বিরুদ্ধে ঢাকায় যখন মিছিল হয় তখন শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এবং শেরে বাংলার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে বাধ্য হই।

ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে কোলকাতা থেকে যখন ঢাকায় আসেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ফুলবাড়ীয়া রেল স্টেশনে কালো পতাকা মিছিল নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখনো মুসলিম লীগ নওয়াব বাড়িতেই বন্দি থাকায় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো রকম তৎপরতা দেখা যায়নি। বরং নওয়াব পরিবারের উদ্যোগে ঢাকার আদিবাসী সর্দারদের নেতৃত্বে নওয়াব বাহাদুরকে বিপুল সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করা হয়। ঐ পরিস্থিতিতে ঢাকায় বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আমি তখন আইএ পড়ি। আমাদের কলেজের একদল ছাত্র নিয়ে রেল স্টেশনের কাছে যেয়ে দেখলাম, নওয়াবের সমর্থকরা লাঠিসোটা নিয়ে ছাত্রদেরকে পিটিয়ে স্টেশন থেকে তাড়িয়ে দেয়। আমরা যদি আর সামান্য আগে পৌছতাম তাহলে আমাদেরকেও তাদের আক্রমণের শিকার হতে হতো। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেলো যে, মুসলিম লীগ নওয়াবদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলো। এর পরেই মুসলিম লীগকে পূর্ববঙ্গে সংগঠিত করার জন্য নওয়াব বাড়ির বাইরে অফিস স্থাপন করা হয়।

মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশেম

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ৩ বছরে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারি হিসেবে জনাব আবুল হাশেম ঢাকায় যে ক'বারই সফরে এসেছেন প্রত্যেকবারই তিনি সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করে শিক্ষিত সমাজকে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। ৪৩ সালে আমি আইএ পড়ি। আমাদের কলেজের কাছেই ঢাকা মিউনিসিপ্যাল হলে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে সর্বপ্রথম তাঁর বক্তৃতা শুনবার সুযোগ পাই।

জনসভার রাজনৈতিক বক্তৃতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বক্তৃতা শুনলাম। মুসলিম জাতির বিপ্লবী পরিচয় তুলে ধরে পাকিস্তান আন্দোলনের আদর্শিক পটভূমি ব্যাখ্যা

করতে গিয়ে তিনি যা বললেন তাতে আমি রীতিমতো উদ্বুদ্ধ বোধ করলাম। নওয়াব বাড়ির পূর্বপাশে আহসানুল্লাহ রোডে প্যারাডাইস হোস্টেলে তখন থাকতাম। হোস্টেলে ফিরে গিয়ে সহপাঠীদের নিকট ঐ বক্তৃতার কথা তুলে ধরলে বেশ কয়েকজন উৎসাহ প্রকাশ করলো।

ঐ সুধী সমাবেশের চিত্র এখনো আমার চোখে ভাসে। হলে প্রধান বক্তা জনাব আবুল হাশেমের আগমনের পূর্বে অন্য বক্তাদের কথা শুনছিলাম। হঠাৎ 'আবুল হাশেম জিন্দাবাদ' শ্লোগান থেকে বুঝা গেলো যে তিনি এসেছেন। দু'জন লোক দুদিক থেকে তার দু'হাত ধরে ধীরে ধীরে মঞ্চে তুলে দিলেন। মনে হলো যে, তিনি চোখে দেখতে পান না। হ্যাংলা-পাতলা লম্বা মানুষটির মাথায় সাদা টুপি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী ও পরনে সাদা লুঙ্গি দেখে কোনো উৎসাহবোধ করলাম না। মঞ্চে তিনি বসলেন। এক বক্তা তাঁর পরিচয়মূলক প্রশংসা বাক্য উচ্চারণের পর আবার দু'জন তাঁর দু'হাত ধরে চেয়ার থেকে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন এবং মাইকের সামনে নিয়ে গেলেন। তিনি বাম হাতে মাইকের স্ট্যান্ডটি ধরে বক্তৃতা শুরু করলেন। মনে হলো যে, চোখে দেখেন না বলে তিনি যাতে মাইকের সামনে থেকে সরে না যান সে কারণেই স্ট্যান্ডটি হাতে ধরে রেখেই বক্তৃতা করতে থাকলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর বক্তৃতায় আকর্ষণবোধ করলাম। বলিষ্ঠ কণ্ঠ, চমৎকার ভাষা ও মজবুত যুক্তিতে আমি রীতিমতো তাঁর ভক্ত হয়ে গেলাম। তাই হোস্টেলে গিয়ে সহপাঠীদেরকে বক্তব্যের সারকথা পরিবেশন করলাম।

কিছুদিন পর খবর পেলাম যে, তিনি নারায়ণগঞ্জে এক সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। আমার সহপাঠী আট দশজনকে নিয়ে ফুলবাড়ীয়া রেল স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম যে, এইমাত্র গাড়ি ছেড়ে গেলো। আমরা রেল লাইন ধরে সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়ে গেণ্ডারিয়া স্টেশনে ঐ গাড়িতেই চড়লাম। এখনো মনে হলে প্রেরণা বোধ করি যে, তারুণ্য ও ইচ্ছাশক্তি থাকলে কোনো কিছুই অসাধ্য থাকে না।

জনাব আবুল হাশেমকে চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হিসেবেই শ্রদ্ধা করতাম। তার লেখা Creed of Islam বইটিও তাঁর এ পরিচয়ই বহন করে। পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগকে সংগঠিত ও জনপ্রিয় করার জন্য তিনি উদীয়মান যুবনেতা শামসুল হককে বাছাই করেছিলেন। এ যুবনেতাও 'ইসলামী বিপ্লব' নামে একটি বই লিখে জনাব আবুল হাশেমের ভাব-শিষ্যের প্রমাণ দেন। তাঁর বেশ কয়টি বক্তৃতা শুনেই পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় হওয়া কর্তব্য মনে করি।

পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি

ইংরেজ শাসন এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশ থেকেই শুরু হয়। ১৭৫৭ সালে সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় স্বাধীন বাংলা-বিহারের নওয়াব

সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে এ দেশে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। ১৯০ বছর পর ১৯৪৭ সালে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটে। পশ্চিম ও উত্তর ভারত মাত্র ১০০ বছর ইংরেজ শাসনের অধীনে ছিলো।

উপমহাদেশে গোলামি যুগ বঙ্গদেশেই দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমানদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয় বলে গোটা মুসলিম জাতি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকে। এদেশে ইংরেজ শাসনকে স্থায়ী ও মজবুত করার জন্য তারা হিন্দুদের সহযোগিতা পায়। ফলে চাকরি, ব্যবসা, পেশা, জমিদারি, শিক্ষা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায় সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

ব্রিটিশ শাসন শুরু হবার ৫০ বছর পর উইলিয়াম হান্টার নামক ইংরেজ প্রশাসক 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' নামে তার লিখিত বইতে মন্তব্য করেন, '৫০ বছর পূর্বে এদেশে কোনো মুসলমান পরিবার গরীব ও অশিক্ষিত ছিলো না। বর্তমানে সচ্ছল ও শিক্ষিত মুসলিম নেই বললেই চলে।' এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইংরেজ শাসনামলে মুসলিম জাতি ডবল গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ ছিলো। একদিকে ইংরেজদের রাজনৈতিক গোলামি অপরদিকে হিন্দুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গোলামি।

উকীল-মোক্তার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সরকারি কর্মচারী ও জমিদার হিসেবে হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে প্রজার মতো আচরণ করতো। বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। আমাদের বীরগাঁও ইউনিয়নের পাশে কৃষ্ণনগর ইউনিয়নে হিন্দু জমিদার বাড়ির দেয়ালের পাশ দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে ঐ রাস্তায় মুসলমানদের ছাতা মাথায় ও জুতা পায়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিলো। কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানা কেন্দ্রের হাই স্কুলে হেড মাস্টার ছিলেন এক ব্রাহ্মণ। স্কুল কমিটিতে ছাত্রদের অভিভাবক হিসেবে নির্বাচিত আবদুল আজিজ ভূঞা ও রজব আলী সরকারকে কমিটির বৈঠকে চেয়ারে বসতে দেওয়া হতো না। দারোয়ান ও পিয়নদের ব্যবহৃত দুটো গোল টুলে তাদেরকে বসতে হতো।

পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হবার পর আমার আব্বা ঐ দু'জন মুসলিম সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করার ফলে তাদেরকে চেয়ারে বসার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়। এতদিন কেন চেয়ারে বসতে না দিয়ে তাদেরকে অপমানিত করা হয় এর প্রতিকারের দাবিতে আন্দোলন করার ফলে হেড মাস্টার আমার আব্বার বাসায় এসে সমঝোতার প্রস্তাব দেন। আমি তখন ঢাকায় ক্লাস টেনে পড়ি। মনে পড়ে হেড মাস্টার আব্বার হাত ধরে কেঁদে কেঁদে অনুরোধ করেন যেন সম্মানজনকভাবে মীমাংসা করে দেন। স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় হেড মাস্টার ক্ষমা চান। জনগণ সন্তুষ্ট হয়ে হেড মাস্টারকে ধন্যবাদ জানালে সমঝোতা হয়।

পাকিস্তান আন্দোলন সফল না হলে অর্থাৎ ১৯৪৭-এ ভারত বিভাগ না হলে আজ যারা জাতীয় অধ্যাপক ও ভাইস চ্যান্সেলর তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হওয়াও কঠিন

হতো। যারা এখন জেনারেল তারা কর্নেলও হতে পারতেন না। যারা বিচারপতি তারা সবাই জিলা জজও হতে পারতেন না। বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণকারী বেশ কয়েকজন আইনজীবী বিরাট মর্যাদার আসনে আছেন। তারা যদি পূর্ব পাকিস্তানে চলে না আসতেন তাহলে কোলকাতা হাইকোর্টে তারা কি উল্লেখযোগ্য বলেও গণ্য হতেন? যারা মন্ত্রী তারা সংসদ সদস্য হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হতেন। অথচ এদেরই কিছু অর্বাচীন মুসলমান ৪৭-এর দেশ বিভাগকে ভুল বলতে লজ্জাবোধ করে না। এ কথা হিন্দুদের মুখেই শোভা পায়।

৪৫-৪৬ সালের নির্বাচন অভিযান

১৯৪৫ ও ৪৬ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এর ফলাফলের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ সরকার ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমে সম্মত হতে বাধ্য হয়। ১৯৪৫ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও ৪৬ সালে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই মুসলিম লীগের তৎপরতা ব্যাপক হয়। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে নির্বাচনী অভিযানে শরীক হয়ে বিভিন্ন এলাকায় যায়। আমরা কয়েকজন সেকালের মানিকগঞ্জ মহকুমায় যাই। মানিকগঞ্জ মহকুমার মুসলিম লীগ নেতা এডভোকেট খান সাহেব আওলাদ হোসেনের নেতৃত্বে আমরা সব কয়টি থানায় গিয়েছি। জুন মাসব্যাপী ঐ সফরে ছোট বড় বহু জনসভায় আমরা নেতাদের মুখে শোনা বক্তৃতা করতাম। আওলাদ হোসেন সাহেব আমার বক্তৃতা খুব পছন্দ করতেন বলে সব সভায়ই আমাকে বলতে দিতেন। বড় একটি নৌকায় মাইক নিয়ে বিভিন্ন থানায় সফর করার ব্যবস্থা ছিলো। জনসভায় রাজনৈতিক বক্তৃতা দেবার অভ্যাস করার এটাই আমার প্রথম সুযোগ ছিলো। ঐ ট্রেনিং সারা জীবনে কাজে লেগেছে।

পাকিস্তান কায়েম হবার পর মানিকগঞ্জের নেতা আওলাদ হোসেন প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্য হিসেবে সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি (বর্তমান পরিভাষায় উপমন্ত্রী) হলেন। তেজগাঁয়ে আওলাদ হোসেন মার্কেটটি তার নামেই রাখা এবং তিনিই এর মালিক ছিলেন।

৪৬ সালে আমাকে বিএ পরীক্ষা দিতে হলো বলে পাকিস্তান আন্দোলনের ছাত্র কর্মী হিসেবে আগের বছরের মতো ভূমিকা পালন করতে পারিনি। তবে পরীক্ষার পর যখন নির্বাচন হয় তখন বক্তৃতার অভ্যাসটা কাজে লেগেছে।

৪৫ ও ৪৬-এর নির্বাচন

প্রায় দু'শ বছর ইংরেজ ও হিন্দুদের ডবল গোলামি ভোগ করার পর ৪৫ ও ৪৬ সালে যখন পাকিস্তান ইস্যুর ভিত্তিতে ভোট দেবার সুযোগ পাওয়া গেলো তখন মুসলিম জনগণ একচেটিয়া মুসলিম লীগ প্রার্থীদেরকে অতি উৎসাহের সাথে ভোট দিলো।

বঙ্গদেশে শতকরা ৯৭ জন ভোটার পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিলো। ভারতের যে সব প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে না বলে জানা ছিলো সেখানকার মুসলমানরাও কংগ্রেসের কোনো মুসলিম প্রার্থীকে বিজয়ী হতে দেয়নি।

শেরে বাংলা ফজলুল হকের বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় নির্বাচনে মাত্র ৫টি আসনে কোনো রকমে জয়ী হন। তার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার কারণে মানুষ তার সম্মান রক্ষা করেছে। কিন্তু তার পাকিস্তান বিরোধিতা মোটেই সমর্থন করেনি। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন হয়। গোটা ভারতে ৩০টি আসন মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। এ সব কয়টিই মুসলিম লীগ দখল করে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। বঙ্গীয় পরিষদের ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টিতেই মুসলিম লীগ প্রার্থীরা বিজয়ী হন। এর মধ্যে একটি আসনেও কংগ্রেস প্রার্থী কোনো মুসলমান জয়ী হতে পারেনি। বাকি ৬টি আসনের ২টিতে শেরে বাংলা এবং ৩টিতে তার সমর্থিত তিনজন এবং ১টিতে মুসলিম লীগের সমর্থক একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

২১.

সেকালে হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন শুরু হলো। দু'তলা বিল্ডিং (বর্তমানে তিন তলা)-এর তিন দিকে ছাত্রাবাস। আর দক্ষিণ দিকে মাঝখানে বিরাট গেইট। এর দু'পাশে দু'জন হাউজ টিউটরের অফিস ও বাসা ছিলো।

হলের পশ্চিমে বিরাট পুকুর। পুকুরের পশ্চিমে ঢাকা হল (হিন্দু হল), বর্তমানে এর নাম শহীদুল্লাহ্ হল। পুকুরের পূর্ব ও পশ্চিম পারে বিরাট দু'টো পাকা ঘাটলায় দু'হলের ছাত্ররা গোসল করতো। হলের ভেতরে গোসলের ব্যবস্থা ছিলো না।

হলের পরিবেশ আমার খুবই ভালো মনে হলো। ছাত্রদের মধ্যে সিনিয়রদের প্রতি জুনিয়রদের সম্মান প্রদর্শনের রীতি অত্যন্ত চমৎকার ছিলো। ডাইনিং হলে খাবার টেবিলে বসার সময় উপরের-ক্লাসের ছাত্রকে আগে বসার সুযোগ দেওয়া, হলের ভেতরে হাঁটাচলার সময় সিনিয়র ছাত্রকে আগে যাবার জন্য রাস্তার কিনারে চলে যাওয়া, পুকুরে গোসলের সময় ঘাটলায় একটু ভিড় হলে সিনিয়রদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পায়খানার লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় সিনিয়রকে আগে সুযোগ দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে এমন সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করতো যা এখন কল্পনাও করা যায় না।

এমন সুন্দর ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল যে, সিনিয়র ছাত্ররা অগ্রাধিকার পেয়েও তা গ্রহণ না করে জুনিয়রদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করতো। সময়ের কোন তাড়া থাকলে সে কৈফিয়ত দিয়ে জুনিয়রকে ধন্যবাদ জানিয়ে অগ্রাধিকারের সুযোগ গ্রহণ করতো।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও ছাত্রদের নিকট ঐ পরিমাণ সম্মান ভোগ করেন কিনা তা তাঁরাই ভালো জানেন। ১৯৭৯ সালে ফজলুল হক মুসলিম হলের ৪০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এ হলের প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মেলনে গিয়েছিলাম। হলের প্রভোস্ট ড. মহব্বত আলীর সাথে সম্মেলন শেষে একান্তে জিজ্ঞেস করলাম যে, সেকালে প্রভোস্ট ছাত্রদের নিকট যে সম্মান পেতেন তা আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। আপনি কি তা পান? বিষণ্ন মুখে জওয়াব দিলেন, 'কোন রকমে সম্মান বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করি।'

ডাকসু ও হল ইউনিয়ন তখন জাসদ ছাত্র লীগের দখলে। কতক ছাত্র আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় বলে পরে শুনেছি। সম্মেলনের পর পরই দৈনিক সংগ্রামে 'আমার হল ফজলুল হক মুসলিম হল' শিরোনামে আমার লেখাটি পড়ে হল ইউনিয়নের সেক্রেটারি আমাকে চিঠি লিখে সম্মেলনে আমাকে যথাযথ মর্যাদা না দেবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। আমি তাদের নিকট এটুকু সৌজন্যও আশা করিনি।

হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চলাফেরার পথে, কমন রুমে, হল মিলনায়তনে লক্ষ্য করা যেতো যে, স্কলার ছাত্রদেরকে অন্য সবাই সম্মান প্রদর্শন করতো। তাদেরকে এমনভাবে সালাম দিতো যেন তারা সম্মানের পাত্র।

শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি প্রধান ভবন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হাসপাতালে রূপান্তরিত হবার ফলে ঐ ভবনের দক্ষিণ প্রান্তিক একাংশে বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকদের অফিস ও কমন রুম অবস্থিত ছিলো। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস আশেপাশের কয়েকটি বিল্ডিং-এ হতো। ফলে ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যাবার জন্য বেশ কিছু পথ হাঁটতে হতো। শিক্ষকগণকে প্রধান ভবনে অবস্থিত বিভাগীয় অফিস থেকে বের হয়ে রাজপথ পার হয়ে ঢাকা হলের পশ্চিম গেটে ঢুকে ঢাকা হল ও ফজলুল হক মুসলিম হলের মাঝের পুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে পূর্ব দিকে বেশ খানিকটা পথ পার হয়ে ফুলবাড়ীয়া রোডের নিকট পি. ডব্লিউ. ডি বিল্ডিং-এ ক্লাসে পৌঁছতে হতো। একই পথে ছাত্র-ছাত্রীরাও যাতায়াত করতো।

ছাত্ররা শিক্ষকগণকে সারা পথেই সালাম দিয়ে তাঁদের জন্য পথ প্রশস্ত করে সম্মান প্রদর্শন করতো। শিক্ষকগণও স্মিতহাস্যে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছাত্রদের অভিবাদন গ্রহণ করতেন। ছাত্রদের নিকট শিক্ষকগণও সব অবস্থায়ই শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে গণ্য হতেন। শিক্ষকগণও ছাত্রদের প্রতি বাৎসল্যসুলভ আচরণ করতেন। এ ব্যাপারে শিক্ষক ও ছাত্র উভয় পক্ষেরই আন্তরিকতা প্রয়োজন। বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ঐ উন্নত মান বহাল না থাকার জন্য উভয় পক্ষই দায়ী কিনা তা বিবেচনার বিষয়।

সহশিক্ষা সত্ত্বেও

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের একই ক্লাসে বসার ব্যবস্থা এমন ছিলো যে, তাদের মধ্যে অবাধে মেলামেশা দূরে থাকুক বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আলাপরতও দেখা যায়নি। ছাত্রীরা দল বেঁধে একসাথে এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিং-এ যেতো।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংলিশ ও বাংলা ক্লাসের ছাত্রীরা পাশের কামরায় বসতো। শিক্ষক দু'কামরার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে লেকচার দিতেন। তিনি এমন জায়গায় দাঁড়াতেন যেখান থেকে তিনি ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে দেখতে পেতেন। এ সব ক্লাসে অনেক ছাত্র-ছাত্রী হতো। তবে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা অনেক কম ছিলো।

ছাত্রীরা একসাথে দলবদ্ধ হয়ে চলার সময় ছাত্ররা তাদেরকে পথ ছেড়ে দিতো। একই পথে চলাচল করা সত্ত্বেও ছাত্রীরা কখনো বিব্রতকর অবস্থায় পড়তো না।

আমরা লক্ষ্য করতাম যে, ছাত্রীদের মধ্যে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা নগণ্য। ছাত্রীদের মধ্যে সবাই শাড়ি পড়তো। সালওয়ার কামিসের প্রচলন তখনও শুরু হয়নি। তাদের কে হিন্দু ও কে মুসলিম তা চিহ্নিত করা সহজ ছিলো। যারা মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে দিতো না তাদেরকে হিন্দু মনে করা হতো। কোনো মুসলমান ছাত্রী মাথা উদোম রাখতো না। হিন্দু ছাত্রীদের মধ্যে যারা বিবাহিতা তাদের মাথায়ও আঁচল থাকতো। তবে তারা তাদের কপালে সিঁদুর লাগাতো।

সাংস্কৃতিক অঙ্গন

হল ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বিতর্ক ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা খুবই জনপ্রিয় বিষয় ছিলো। অত্যন্ত প্রাণবন্ত প্রতিযোগিতা হতো। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব এতটা ছিলো যে, বিজ্ঞানের ছাত্ররাও শেক্সপিয়ার, টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন, বার্নার্ড শ, কীটস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তৃতাকে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করতো। বলাবাহুল্য যে, এ সব প্রতিযোগিতা ইংরেজি ভাষায়ই অনুষ্ঠিত হতো।

আজকাল যেমন শুধু নাচ, গান, নাটককেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মনে করা হয় তখন তেমন ধারণা ছিলো না। সেকালে নাটকে ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করতো। পুরুষ ও মহিলা মিলে অভিনয় করার মতো উন্নতি তখনও হয়নি।

কোন মহিলাকে হলের কোন অনুষ্ঠানে গান গাইতে আমি দেখিনি । গানের অনুষ্ঠানে কাওয়ালী সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলো।

হল ইউনিয়নের নব-নির্বাচিত কেবিনেটের অভিষেক অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক কার্যাবলির মধ্যে গানই প্রধান বিষয় হতো। নাচও হতো, তবে দশবছর বয়সের বেশি কোন মেয়েকে অনুমতি দেওয়া হতো না।

হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে অশ্লীল ও অশালীন কোন কিছু দেখা যায়নি। শিক্ষার গুরুত্বই সেখানে প্রাধান্য পেতো।

ছাত্র রাজনীতি

হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইরের রাজনৈতিক প্রভাব তেমন লক্ষণীয় ছিলো না। ৪৭-এর পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশের রাজনীতি কোলকাতাকেন্দ্রিকই ছিলো। ৪৫ ও ৪৬ সালে পাকিস্তান আন্দোলনের ফলে যে রাজনৈতিক তৎপরতা ছিলো তা ঐ দু'বছরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের কারণে। এ উত্তাপ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশকে আঘাত করেনি।

কোলকাতায় যেমন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক বিরোধ খেলার ময়দান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ঢাকায় তেমন দেখিনি। বঙ্গদেশের রাজধানী কোলকাতায় রাজনৈতিক যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো ঢাকায় তা মোটেই লক্ষণীয় ছিলো না। ঢাকায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের তৎপরতা মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিলো না। বিখ্যাত কংগ্রেস নেতাদের কেউ ঢাকার অধিবাসী ছিলো না। কংগ্রেসের বড় নেতারা প্রধানত কুমিল্লায় উকিল ছিলেন।

তাই ছাত্রদের রাজনীতি হল ও বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। বর্তমানে হল ও ইউনিভার্সিটি অঙ্গন রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সেকালে বাইরের রাজনীতির সামান্য উত্তাপও হল বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছতো না। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ঢাকায় জাতীয় রাজনীতির ময়দানেও তীব্র প্রতিযোগিতা ছিলো না।

হল ইউনিয়ন নির্বাচন

১৯৪৪ থেকে ৪৮ সাল পর্যন্ত হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই থেকে জুন এক সেশন ধরা হতো। হল ইউনিয়নও সে হিসেবেই পরিচালিত হতো। বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের নির্বাচন প্রতিবছর না হলেও হল ইউনিয়ন নির্বাচন নিয়মিতই অনুষ্ঠিত হতো।

ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। তাদের নির্বাচনী নীতিমালা কী ছিলো তা জানার প্রয়োজনও কোন সময় বোধ করিনি। হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা মুসলিমদের তুলনায় অনেক কম ছিলো। তাদের সাথে আমার ব্যক্তিগত তেমন পরিচয় ছিলো না। ৪৭-৪৮ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন নির্বাচন উপলক্ষে হিন্দু হলের ছাত্রদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম হল। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হবার সময়ই এ হলের যাত্রা শুরু হয়। এর আগে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হলে কোলকাতা যেতে হতো। পূর্ববঙ্গের খুব কম মুসলিম ছেলের পক্ষেই তা সম্ভব ছিলো। তারা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ডিগ্রি কলেজে পড়ার পর এমএ পড়ার জন্য বাধ্য হয়ে কোলকাতায় যেতো।

এ কারণেই পূর্ববঙ্গের মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই বেশি ছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলিম প্রধান মনে করে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ছাত্রও বেশ সংখ্যায় ঢাকায় পড়তে আসতো।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল 'মুসলিম হল' নামেই পরিচিত ছিলো। ফজলুল হক মুসলিম হল ১৯৪০ সালে শুরু হবার পরও মুসলিম হল বললে সবাই সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বুঝতো। শেখ মুজিবের শাসনামলে মুসলিম শব্দ তুলে দেওয়ায় এখন সলিমুল্লাহ হল নামেই পরিচিত।

এ হলের ইউনিয়ন নির্বাচনে এক অদ্ভুত প্রথা চালু ছিলো। বৃহত্তর কুমিল্লা ও বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা পূর্ববঙ্গে শিক্ষায় অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিলো। মুসলিম হলে এ দু'জেলার ছাত্রদের সংখ্যা মোট ছাত্র সংখ্যার অর্ধেকের বেশি থাকায় ইউনিয়ন নির্বাচনে এরা জোট বেঁধে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে যেতো। জেলাভিত্তিক জাতীয়তার এ প্রথা যাতে ফজলুল হক মুসলিম হলেও চালু না হয় সে জন্য নাজমুল করীম নামে এমএ ক্লাসের এক ছাত্র উদ্যোগী ভূমিকা নেয়। আমি বিএ প্রথম বর্ষে ভর্তি হবার পর হলে তার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হই। তিনি নেতামার্কা ছাত্রদেরকে টারগেট করে জেলাবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। আমাকেও তিনি বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা তার সমর্থকে পরিণত করেন। আমি কুমিল্লা জেলার অধিবাসী হবার কারণে বেশি গুরুত্ব দিয়ে টারগেট করেছিলেন।

সাধারণত ছাত্ররা পারস্পরিক পরিচয় বিনিময়ের সময় কোন্ জেলার অধিবাসী সে কথাও জানতে চায়। এতে কারো কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু নাজমুল করীম সাহেবের সাথে অতি ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তার বাড়ি কোন্ জেলায় তা তার মুখ থেকে বের করতে পারিনি। জেলাবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি এ কথা প্রকাশ করতেন না। অন্যের কাছ থেকে পরে জানতে পারলাম যে, তার বাড়ি ছিলো ফেনীতে।

নাজমুল করীম সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত জেলাবাদ বিরোধী আন্দোলন সফল হয়। হল ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দু'টো প্যানেল তৈরি হয়। নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার প্রয়োজনে প্যানেল দু'টোর নামকরণও হয়। নির্বাচনের পর ঐ নাম আর কেউ উচ্চারণ করেনি। পরের বছর আবার নতুন দু'নামে প্যানেল গঠিত হয়। অর্থাৎ ঐ নামের কোন স্থায়ী উদ্দেশ্য নেই। নির্বাচনের সময় পরিচিতির জন্য একটা সুন্দর নাম– যেমন প্রগ্রেসিভ ফ্রন্ট, ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স ইত্যাদি নাম সাময়িকভাবে ব্যবহার করা হতো।

ছাত্রদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশভিত্তিক কোন ছাত্র সংগঠন ছিলো না। মুসলিম লীগের ছাত্র-ফ্রন্টের নাম ছিলো মুসলিম ছাত্র লীগ। ১৯৪৩ সালে আমি যখন আইএ পড়ি তখন প্যারাডাইস হোস্টেলে মুসলিম ছাত্র লীগের দু'প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা খোন্দকার

মুশতাক আহমদ ও শাহ আযীযুর রহমান পৃথক পৃথকভাবে গিয়েছেন। কিন্তু ৪৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর মুসলিম ছাত্র লীগের কোন তৎপরতা দেখিনি। মুসলিম লীগের মতোই ছাত্র লীগের তৎপরতাও কোলকাতাকেন্দ্রিক ছিলো।

৪৪-৪৫ সেশনের হল ইউনিয়ন নির্বাচনে আমি নাজমুল করীম প্যানেলের পক্ষেই সক্রিয় ছিলাম। তিনি স্পীকার নির্বাচিত হন। ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র অন্যান্য হল থেকে ভিন্ন ছিলো। পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ছাত্রদেরকে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে ঐ গঠনতন্ত্র রচিত হয়। প্রভোস্ট হল ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। তিনি নবনির্বাচিত কেবিনেটের অভিষেক অনুষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন না। বাজেট অধিবেশন এবং অন্যান্য অধিবেশনে যেখানে বিতর্কের সুযোগ রয়েছে সেখানে স্পীকার সভাপতিত্ব করতেন। ভিপি লীডার অব দ্য হাউজের ভূমিকা পালন করতো।

স্পীকার হিসেবে নাজমুল করীম পার্লামেন্টারি ঐতিহ্য গড়ায় বেশ অবদান রেখেছেন। এক অধিবেশনে বিরোধী পক্ষের ছাত্ররা ভীষণ হৈচৈ শুরু করলে স্পীকার 'অর্ডার, অর্ডার' উচ্চারণের পরও যখন তারা থামলো না তখন স্পীকার দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, 'এ চেয়ারে কে বসেছে তা বড় কথা নয়, আপনারা যদি এ চেয়ারের মর্যাদা না রাখেন তাহলে এ এসেম্বলি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন।' এ কথা বলার সাথে সাথে সবাই থামলো। এরপর স্পীকারকে অমান্য করার ঘটনা আর কোনো সময় ঘটেনি।

এ নাজমুল করীম সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশালজী বিভাগের প্রধান থাকাকালেই ইন্তিকাল করেন।

'৪৫-৪৬ সালের হল ইউনিয়ন নির্বাচনে আমি এক প্যানেলের প্রধান নির্বাচন পরিচালক ছিলাম। এ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী ছিলেন সরদার ফজলুল করীম। ঐ সময় বিশ্বের সর্বত্র পুঁজিবাদ বিরোধী মতবাদ হিসেবে কমিউনিজমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা প্রগতিশীল মতবাদ হিসেবে এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। আমিও তাদের খপ্পরে পড়েছিলাম। তাদের প্রচার পুস্তিকার বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হই। সরদার ফজলুল করীমের নির্বাচনী অভিযানে তাই আমি অগ্রণী ভূমিকা পালন করি। পাকিস্তান আন্দোলনের জনপ্রিয়তা তখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কমিউনিস্টরা মুসলিম জাতীয়তাভিত্তিক আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলো। নির্বাচনে সরদার ফজলুল করীমকে কমিউনিস্ট আখ্যা দেবার ফলে মুতিউর রহমান প্যানেল যোগ্যতার দিক দিয়ে নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও জিতে গেলো।

এরপর আমি কমিউনিজমের আদর্শিক ভিত্তি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। তাদের পুস্তিকাসমূহ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে 'জনযুদ্ধ' নামে তাদের সাপ্তাহিক পত্রিকা দ্বারা আমি প্রভাবিত ছিলাম। কিন্তু তাদের বস্তুবাদী আকীদা, ধর্মবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং নাস্তিকতা সম্পর্কে অবগত হবার কারণে আমি তাদের সংসর্গ ত্যাগ করি। ছোট

সময় থেকে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে দাদা ও আব্বা মনে যে বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছিলেন, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-এর ওয়াজ ও রচনা এবং শামছুল হক ফরিদপুরী (র)-এর সাহচর্য ঐ বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে দেবার ফলে কমিউনিজমের আকীদা গ্রহণ করা থেকে সহজেই রক্ষা পেয়ে গেলাম।

হল ইউনিয়নের নির্বাচনী পরিবেশ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ছিলো। আমার বিরোধী প্যানেলের নির্বাচনী অভিযানের বড় নেতা ছিলো ইসমাইল (যে জিয়াউর রহমান মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী ছিল)। তার সাথেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিলো। দেখা হলেই যোশের সাথে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'কিরে কেমন চলছে কাজ?' তার সাথে আমার 'তুই' সম্পর্কই ছিলো। নির্বাচনের জয়-পরাজয়কে স্পোর্টসম্যান স্পিরিটেই গ্রহণ করা হতো। মুতিউর রহমান ভিপি হবার পর আমাকে দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য পোস্টার লিখিয়ে নিতেন। বিরোধী প্যানেলের ভিপি হওয়া সত্ত্বেও আমি বিদ্বেষ পোষণ করতাম না এবং হাসিমুখে তার কাজে সহযোগিতা করতাম।

২২.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমার আকর্ষণ

আগেই উল্লেখ করেছি যে, আমার দাদা এ কথার উপর খুব তাগিদ দিতেন যে, আমাকে বাংলা, ইংরেজি ও আরবী ভাষা আয়ত্ত করতে হবে। তাই আমাকে প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার পথে যেতে না দিয়ে জুনিয়র মাদ্‌রাসায় ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করে দিলেন।

ঐ মাদ্‌রাসার পণ্ডিত শামসুদ্দীন মাদ্‌রাসার লাইব্রেরী থেকে ছোটদের উপযোগী বই বাছাই করে আমাকে পড়তে দিতেন। বই তাঁর হাতে ফেরত দিলে কেমন পড়েছি তা জানার জন্য বই সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। আমার জওয়াবে সন্তুষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বই দিতেন।

এভাবে পণ্ডিত স্যার আমাকে বই পড়ায় অভ্যস্ত করে তোলেন। আমাকে বড়ই আদর করতেন। ক্লাস ফোরে উঠার পর তাঁর চাচাত ভাই আশরাফ আলীর বাড়িতে আমার লজিং-এর ব্যবস্থা করে দেন। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ঐ মাদ্‌রাসায় ৪ বছর ছিলাম। পণ্ডিত স্যার আমার মধ্যে পড়ার নেশা জাগিয়ে দিলেন। অন্তর থেকে তাঁর জন্য দোয়া করি। তাঁর এ স্নেহের অবদান আমার জীবনে বড় সম্বল হয়ে আছে।

কুমিল্লায় হুস্যামিয়া হাই মাদ্‌রাসায় দু'বছর থাকাকালেও মাদ্‌রাসার লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়েছি। কোনো শিক্ষকের ব্যক্তিগত গাইডেন্স না থাকায় বই বাছাই সব সময় সন্তোষজনক মনে হতো না। ঢাকায় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ক্লাস নাইনে ভর্তি হবার পর পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়ছিলাম।

হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় বাংলায় ভালো নম্বর পাওয়ায় বাংলার শিক্ষক আমীনুদ্দীন স্যার আমাকে উপদেশ দিলেন যে, ভাষা শেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বই পড়া প্রয়োজন। তিন খণ্ডে বিস্তৃত অনেকগুলো ছোট গল্প। ভাবের চমৎকার প্রকাশভঙ্গি, ভাষার লালিত্য এবং মানবিক গুণাবলির পরিচয় মিলে গল্পগুলো খুবই আকর্ষণীয় মনে হলো। বাংলা ভাষার স্বাদও অনুভব করলাম। আমার বড় দু'ছেলে মামুন ও আমীন ৭১ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলো। দেশের অরাজক পরস্থিতির কারণে লেখাপড়ার সুবিধার জন্য ৭২ সালেই ওরা এবং আমার ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামের বড় ছেলে সুহায়েল ইংল্যান্ড গেলো। ৭৩ সালে আমি ওদের সাথে মিলিত হই। দু'বছর পর আমি অনুভব করলাম যে, ওরা সেদেশে বাংলা ভাষা শেখার সুযোগ পাচ্ছে না। আমীনুদ্দীন স্যারের প্রেসক্রিপশনটার কথা মনে আসলো। ঢাকা থেকে গল্পগুচ্ছের সবকয়টা খণ্ড ওদের জন্য নেবার ব্যবস্থা করলাম।

আইএ ক্লাসে পড়ার সময় বাংলা উপন্যাস পড়ার ঝোঁক চাপল। আমীনুদ্দীন স্যারের পরামর্শ চাইলাম। তিনি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়তে বললেন। উপন্যাস পড়তে গিয়ে একটা সমস্যা অনুভব করলাম। পাঠ্য বই-এর বাইরের বই রাতে ঘুমাবার আগে শুয়ে শুয়ে পড়ায়ই অভ্যস্ত ছিলাম। উপন্যাসের ঘটনা পরম্পরা এমনভাবে টেনে নিয়ে যায় যে, শেষ না করে থামা যায় না। বই পড়তে পড়তে ঘুম আসলে বই পড়া বন্ধ করে ঘুমাই। এটা আমার আজীবন অভ্যাস। কিন্তু ঐ সময় উপন্যাস পড়লে ঘুম আসতো না। রাতে ঘুম পুরা না হলে সকালে লেখাপড়া করা যায় না বলে এ সমস্যার সমাধান আমীনুদ্দীন স্যারের কাছেই চাইলাম।

তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, সিদ্ধান্ত নাও শোবার পর এক ঘণ্টার বেশি পড়বে না। ঘুমের সময় আসলে বই বন্ধ করে ঘুমাবে। তোমার নিজের মনের উপর কর্তৃত্ব না থাকলে চলবে কেন? এ উপদেশ আমাকে সাহায্য করেছে।

আইএ ক্লাসের বাংলা সিলেবাসে রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' শিরোনামের ছোট গল্পটি পাঠ্য ছিলো। এ সিলেবাসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটিও পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এ বইটি পড়ে বঙ্কিমের ভাষায়ও আকর্ষণ বোধ করায় তাঁর লেখা অন্যান্য উপন্যাসও পড়লাম। 'আনন্দ মঠ' জাতীয় বইতে মুসলিম বিদ্বেষের কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হলেও তাঁর লেখা থেকে ভাষা জ্ঞান ও সাহিত্য রস উপভোগ করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সিলেবাসে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্য গ্রন্থটি পাঠ্য ছিলো। পড়াতেন অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন ভাদুরী। চমৎকার পড়াতেন। তাঁকে বললাম, রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে অনেক কথা আপনার লেকচার থেকে জানলাম। আমি আরও জানতে চাই। তিনি আমাকে 'রবিরশ্মি' নামে কাব্য সমালোচনাগ্রন্থ পড়ার

পরামর্শ দিলেন। লেখকের নাম ভুলে গেছি। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী থেকে রবিরশ্মির কয়েকটি খণ্ড পড়ে রবীন্দ্র কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হলাম।

মাধ্যমিক স্তরের বাংলা সিলেবাসে গদ্য ও পদ্যের যে সংকলন পাঠ্য ছিলো তাতে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে। আমার সহপাঠী আঃ কুদ্দুস ভাই (আত্মীয়) নজরুলের গান গাইতেন। তারই উদ্যোগে নজরুলের কাব্য সংকলন যোগাড় হয়। হোস্টেলে জোট বেঁধে কুদ্দুস ভাইয়ের মুখে আবৃত্তি শুনতাম। ঐ স্বাদ ছিলো তারুণ্যের উপযোগী, বিপ্লবের প্রেরণাদায়ক, রক্ত গরম করার মতো উদ্দীপক।

রবীন্দ্র কাব্যের স্বাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় পেলাম। নজরুলের কবিতার সাথে এর কোন মিল নেই। ভাব ও ভাষায় একেবারেই ভিন্ন। দু'ফুলের গন্ধ দু'রকম, যদিও দুটোই সুগন্ধি। এ কারণেই নজরুল ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের আবেদন ভিন্ন। নজরুল বাংলাদেশের জাতীয় কবি, রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি সম্রাট।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলায় সপ্তাহে মাত্র দুটো ক্লাসে মোটেই তৃপ্তিবোধ করছিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের জন্য বাংলায় ১০০ নম্বরের এক পেপার বাধ্যতামূলক ছিলো। এর জন্য সপ্তাহে একটা ক্লাস গদ্যের জন্য, অপরটা পদ্যের জন্য ছিলো।

'স্পেশাল বেঙ্গলী' নামে ৩০০ নম্বরের একটি বিষয় যারা নিতো তাদেরকে সপ্তাহে ৬টি ক্লাসে হাজির হতে হতো। আমি তো সে বিষয় নেইনি। তবু আমি অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম যে, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটা গদ্যের ক্লাসের সময় আমার কোনো ক্লাস নেই। অনুমতি পেলে ঐ ক্লাসে আমি উপস্থিত হতে পারি। অধ্যাপক ভট্টাচার্য আমার আগ্রহ দেখে অনুমতি দিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিশ্লেষণমূলক এবং উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো সম্পর্কে লেকচার দিতেন। এ দু'জনের উপন্যাস আগেই পড়েছিলাম বলে তাঁর বক্তৃতা আমি তৃপ্তির সাথে উপভোগ করতাম। মাঝে মাঝে তিনি লেকচারের বিষয়ে ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করতেন। সবার আগে আমি উত্তর দিতাম। কোন একটি চরিত্রের বিশ্লেষণ করে জানতে চাইতেন, বলতো এ চরিত্রটির নাম কি এবং কোন্ উপন্যাসের চরিত্র। আমি চট্ করে জওয়াব দিতে পারায় আমি তাঁর প্রিয় ছাত্রে পরিণত হলাম।

১৯৪৬ সালে মার্চ মাসে বিএ ফাইনাল পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের বাংলা পেপারে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় আমার প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন ভাদুরী বাংলা এমএ-তে ভর্তি হবার জন্য চাপ দিলেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা আসবে।

সাহিত্য সংগঠন

আমি পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে সক্রিয় ছিলাম। সরদার ফজলুল করীম যখন এ সংসদের সেক্রেটারি তখন আমি সহকারীর দায়িত্ব পালন করি। সংসদের সভাপতি কাজী মুতাহার হোসেন আমাদের হলের হাউজ টিউটর ছিলেন বলে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ

হবার সুযোগ হয়। সংসদের পক্ষ থেকে সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজনে আমি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করতাম। সরদার ফজলুল করীমের পর শামসুল আলম সংসদের সেক্রেটারি হন। এরপর এক বছর ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ শেষ বর্ষে থাকাকালে সংসদের সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন করেছি। এ সংসদের মাধ্যমেই সৈয়দ আলী আহসান ও সৈয়দ আলী আশরাফ ভাতৃদ্বয়ের সাথে সম্পর্ক শুরু হয়। সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে অতিথি হিসেবে কবি কায়কোবাদ, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ ও অধ্যাপক মনসূরুদ্দীনকে আনা-নেওয়ার দায়িত্ব পালনের সুবাদে তাঁদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পাই। এ জাতীয় জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীগণের সংস্পর্শ বড়ই তৃপ্তিদায়ক। তাঁদের সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও জ্ঞানের মূল্যবান কথা থাকে। এক সাহিত্য সম্মেলনে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ ও কাজী মুতাহার হোসেনকে আনার দায়িত্ব পড়লো আমার উপর। সেকালে ঘোড়ার গাড়িই একমাত্র যানবাহন ছিলো। দু'জনকে একই গাড়িতে করে সম্মেলনে নিয়ে আসার পথে তাদের যে রসাত্মক বক্তব্য শুনলাম তা এখনও মনে আছে। কাজী সাহেব অধ্যক্ষ সাহেবের লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, 'আপনি একটা কথাকে বুঝাতে গিয়ে যেভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেন তা অত্যন্ত উপাদেয়। কিন্তু আমি অতি সংক্ষেপে লিখায় অভ্যস্ত। তাই আমার পাঠক তৃপ্ত হয় কিনা জানি না।' অধ্যক্ষ সাহেব বললেন, 'আপনারা বিজ্ঞানের মানুষ। ভিটামিন টেবলেট দিয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের পেট ভরে ডালভাত না খেলে তৃপ্তি হয় না।'

একবার পত্রিকায় খবর বের হলো যে, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। দেখতে গেলাম। তাঁর প্রশস্ত মুখে সব সময়ই সুন্দর হাসি দেখে আমি অভ্যস্ত। সালাম দিলাম। ঐ সুন্দর হাসি দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী অসুখ? কেমন আছেন?' জওয়াবে বললেন, 'এক পীরী সাদ বীমারী।' কথাটি ফারসি ভাষায়। এটুকু সামান্য ফারসি আমি বুঝলাম। এর অর্থ হলো 'এক বার্ধক্য শত রোগ' অর্থাৎ বুড়ো হয়েছি, কত রোগই এখন হবে। তিনি ফারসি ভালো জানতেন। ব্রিটিশ আমলে স্কুলে আরবী, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার যে কোন একটা বিষয় বাধ্যতামূলক ছিলো। তিনি আরবীর বদলে ফারসি পড়েছিলেন। ফারসি কাব্যের অনুবাদও করেছেন।

গায়ক আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠে নজরুলের হামদ ও নাত শুনে বাল্যকালেই মুগ্ধ ছিলাম। আমি গায়ক হবার চেষ্টা করিনি। কাউকে শুনাবার জন্য না গাইলেও একা একা গুন্‌গুনিয়ে গেয়ে মজা পেতাম। বিএ পরীক্ষার পর কয়েক মাস বেকার অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি সিরিয়াসলী পড়লাম। এ বই-এর কারণে তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন বলেই আমি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। কয়েকটি কবিতা এতই ভালো লাগলো যে মুখস্থ হয়ে গেলো। নির্জনে ঐ সব কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে নিজস্ব সুরে গেয়ে তৃপ্তি বোধ করতাম।

কিছুদিন এভাবে গাইতে গাইতে মনে হলো যে, আমার কণ্ঠ তো গানের অযোগ্য নয়। তখন নজরুলের হামদ ও নাত গাইতে লাগলাম। কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানায় আব্বা-আম্মার সাথেই তখন ছিলাম। মোকামবাড়ি নামক জায়গাটি আমার খুবই ভালো লাগতো। এখানে বিরাট এক ঈদগাহ্। এর পূর্বদিকে কবরস্থান। উত্তর দিকে মোগল আমলের একটি মসজিদ ও কতক পাকা কবর। ঈদগাহ ও মসজিদের পশ্চিমে বেশ বড় পুকুর। পুকুরের পুরানা ঘাটলাটি ভেঙ্গে গেলেও ব্যবহারযোগ্য ছিলো। প্রতিদিন বিকেলে ঐ ঘাটলায় বসে গীতাঞ্জলি ও নজরুলের গান গাইতাম। আশে পাশে তখন কোন বসতি না থাকায় নির্জন ছিলো। মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের লোক পাওয়া যেতো না। মুশুরীখলার শাহ সাহেবের এক ষাটোর্ধ মুরীদ ঐ মসজিদে থাকতেন। পাশের গ্রামের এক বাড়িতে যেয়ে খেয়ে আসতেন। ঐ মসজিদে মাগরিবের নামায পড়ে চলে আসতাম। ঐ লোকটিই আযান দিতেন এবং নামাজে ইমামতী করতেন। কোন সময় মুসল্লীর অভাবে একাও তাকে নামাজ পড়তে হতো।

মাওলানা রূমীর মসনবীর অনুবাদ পড়ে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, গীতাঞ্জলির অনেক কবিতার ভাবের সাথে বেশ মিল রয়েছে। পরে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পড়ে এর কারণ আঁচ করলাম। বিবেকানন্দ বলেন, 'আমি অতি প্রত্যুষে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যেয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রাতর্ভ্রমণ করতাম। কোনদিন তাকে গিয়ে জাগাতে হয়নি। প্রায় দিনই যেয়ে দেখতাম তিনি দোতলার বারান্দায় পায়চারী করছেন, আর মসনবীর ফারসি কবিতা আবৃত্তি করছেন।' ফারসি রাষ্ট্র ভাষা ছিলো বলে মুসলিম শাসনামলে হিন্দুরাও ফারসি শিখতো।

রবীন্দ্রনাথ তার পিতা দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি জমিদারি দেখাশুনা করতে সফরে গেলেও আদরের ছোট ছেলেকে সাথে নিতেন। বাড়িতেও নিজের কাছে কাছে রেখে গড়ে তোলেন। হয়তো তাঁর এ পুত্রের মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখে তাকে বিশেষ যত্নের সাথে শিক্ষা দিতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর একেশ্বরবাদী (তাওহীদবাদী) ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ছিলেন। তাঁর ঈশ্বর-প্রেমের সাধনার কারণেই মহর্ষি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ধার্মিকতার মূলই হলো স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা। তাকে যে নামেই স্মরণ করা হোক, যে ঐ প্রেমের স্বাদ পেয়েছে তার নিকট এটাই বড় সম্পদ। রংপুর কারমাইকেল কলেজে ফিলসফীর অধ্যাপক গৌর গোবিন্দ গুপ্তের সাথে আমার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্ত ছিলেন। আমি যখন কলেজে যোগদান করি তখন তাঁর অধ্যাপনার ৩০ বছর পার হয়ে গেছে। তাঁরই উদ্যোগে বয়সের বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও আমার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস আমার কাছে শুনবার সময় তাঁর চোখে পানি দেখেছি। 'অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী' নামক আমার লেখা বইটিতে 'ধর্মের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব' শিরোনামে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছি।

অবশ্য পরকালে এ সব লোকের সাথে আল্লাহ্ পাক কেমন আচরণ করবেন তা আলাদা ব্যাপার।

গীতাঞ্জলির কবিতাগুলো স্রষ্টার প্রতিই নিবেদিত। তাঁর প্রতিই আত্মসমর্পণ, তাঁর দরবারেই ধরনা, তাঁর নিকটই মনের আকুতি নিবেদন এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসারই প্রকাশ পেয়েছে গীতাঞ্জলিতে। ১৯৬৪ সালে ঢাকা জেলে থাকাকালে গীতাঞ্জলি থেকে কয়েকটি আবেগময় কবিতা বাছাই করে একটি খাতায় লিখে রেখেছি যা আমার হাতের কাছেই শেলফে আছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে যে মুসলিম বিদ্বেষ রয়েছে তা হিন্দু হিসেবে তাঁর ভারতীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি তাঁর পিতার ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি পৌত্তলিক হিন্দু ছিলেন। তাই যারা বাঙালি জাতীয়তায় বিশ্বাসী তারা তাকে জাতীয় কবি মানতে পারে; বাংলাদেশী জাতীয়তায় বিশ্বাসীরা তা করে না।

বহু ইংরেজ কবির কাব্যরস আমরা উপভোগ করি। রবীন্দ্র কাব্যের রস উপভোগ করতে কেউ আপত্তি করে না। এদেশে যারা তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে পূজা করে এবং জাতীয় কবি নজরুলের চেয়ে বেশি মহব্বত করে তারা রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড ভারতমাতার সেবক।

গীতাঞ্জলির মতো আধ্যাত্মিক ভাবসর্বস্ব কাব্যকে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার বাহকরা নোবেল পুরস্কার দেবার যোগ্য মনে করায় আমি এ ধারণায় উপনীত হয়েছি যে, মানুষ যতই জড়বাদী হওয়ার অভিনয় করুক স্রষ্টা তার মধ্যে যে বিবেক বা নৈতিক চেতনা দান করেছেন তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ অবশ্যই রয়েছে। বস্তুজগতের রূপ-রস-গন্ধ যতই তাকে আচ্ছন্ন করে রাখুক, একসময় ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যায় কারো কারো মধ্যে।

চান্দিনার মোকামবাড়ি মসজিদে অবস্থানকারী মুশুরীখলা শাহ সাহেবের যে ভক্তের কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি তাঁর সাথে আমার আলোচনা হতো। সে বিষয়টাও এখানে পেশ করা প্রয়োজন বোধ করি।

তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিবি-বাচ্চা ও ঘর-সংসার ফেলে এখানে পড়ে আছেন কেন?' তিনি সূরা আন নাযিআতের ৪০ নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এর অর্থ হলো, 'আর যে (আখিরাতে) তার রবের সামনে দাঁড়াবার ভয় করেছিল ও নফসকে অসৎ কামনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।'

জান্নাতের ঠিকানা হাসিলের মহান উদ্দেশ্যে তিনি ঐ বৈরাগ্য জীবন বেছে নিলেন। ঢাকার নারিন্দায় অবস্থিত মুশুরীখলার শাহ সাহেবের নির্দেশেই নাকি তিনি এ নির্জন বাসে এসেছেন। ঐ সময়কার শাহ সাহেব আমার আপন খালু ছিলেন। এ কথা তিনি জানতেন বলে আমার সাথেও তিনি ভক্তিসুলভ আচরণ করতেন।

ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা এখন পোষণ করি তা তখন জানা ছিলো না। রাসূল (স) বলেছেন, 'আমার উম্মতের বৈরাগ্য হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।' ইসলামকে মানব সমাজে বিজয়ী হিসেবে কায়েম করার চেষ্টা করাই যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আসল পথ সে কথা ভুলে গিয়ে যিকর-আযকার ও বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করে ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জনের পথ যারা দেখান তারা আর যাই হোক রাসূল (স)-এর জীবনকে আদর্শ হিসেবে উপলব্ধি করেননি।

রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করার মাধ্যমে যে চরিত্র সৃষ্টি হয় তা-ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এ মহান শিক্ষা ভুলে যাওয়াই মুসলিম জাতির অধঃপতনের আসল কারণ।

২৩.

আমি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবী নই

আমি জাতে সাহিত্যিক নই, অবশ্যই সাহিত্যরসিক। আমি সংস্কৃতিসেবীও নই, অবশ্য সংস্কৃতিপ্রেমী।

যারা জাতে সাহিত্যিক তারা তরুণ বয়স থেকে মনের তাগিদে লিখতে থাকে। গাইতে গাইতে যেমন গায়ক, লিখতে লিখতেই লেখকে পরিণত হয়। আমি জাতে লেখক হলে ছাত্র জীবনেই সাহিত্যরোগ দেখা দিতো। পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সংগঠক ও কবি-সাহিত্যিকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা সত্ত্বেও লেখার অভ্যাস আমার গড়ে ওঠেনি।

১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগাজিনে আমার একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। আমি তার প্রিয় ছাত্র ছিলাম। আমার লেখাটা রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-সাহিত্য পর্যায়ে বিবেচনা করে গ্রহণ করা হয়। শিরোনাম ছিলো 'পরকালে ভারতীয় রাজনীতি'। গান্ধী, নেহরু, জিন্নাহ, প্যাটেল, মাওলানা আযাদ, সুভাষ বসুর মতো ভারতের জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরকালে এক বৈঠকে তাদের কল্পিত সংলাপ নিয়ে লেখা।

আমি নিজকে সাহিত্যামোদী মনে করি। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের দাবি পূরণ করতে গিয়ে সাহিত্য অধ্যয়ন করে আমোদ উপভোগ করার সময় ও সুযোগ বহু বছর থেকে পাচ্ছি না বলে মাঝে মাঝে তৃষ্ণা বোধ করি। ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে সক্রিয় হবার পর উর্দু, ইংরেজি ও বাংলায় যে বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার নিয়ে চর্চা করে আসছি তাতেও যথেষ্ট সাহিত্য রস সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু সে সাহিত্য অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ভিন্ন বলে সাহিত্য রস আস্বাদনের উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। শুধু সাহিত্য রস উপভোগ করার উদ্দেশ্যে যে সব বই পড়া প্রয়োজন এর জন্য সময়

পাওয়ার উপায় নেই। মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা পড়তে গিয়ে সাহিত্য মানের লেখা মাঝে মাঝে পড়ে তৃপ্তি পাই।

আমি সাহিত্যামোদী ও সাহিত্যরসিক বলে দাবি করা সত্ত্বেও নিজেকে সাহিত্যিক মনে করি না। এটা বিনয়ের কথা নয়। কারণ আমি এ পর্যন্ত যা লিখেছি এর কোনটাই সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে নয়। দীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছাড়া আমি কিছু লিখেছি বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক বিষয়েও যা লিখেছি তাও ইসলামী আন্দোলনেরই স্বার্থে।

কবি আল মাহমুদের সাথে আদর্শিক কারণে মহব্বতের সম্পর্ক অনুভব করি। প্রসঙ্গক্রমে 'জীবনে যা দেখলাম' সম্পর্কে তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন। 'আমি সাহিত্যিক নই' বলায় তিনি জোরে প্রতিবাদ করলেন। এরপরও এ কথার উপর আমি মজবুত আছি।

একটি উদাহরণ

মাওলানা মওদূদীর (র) রচিত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম। তাঁর ভাষাকে আমি সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ মনে করি। কিন্তু তাঁর ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে যারা উচ্চ শিক্ষিত নয় তাদের পক্ষে বুঝা মুশকিল। এ বিষয়ে আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বললেন, আমি ইচ্ছে করেই কঠিন ভাষা ব্যবহার করি। আমি প্রমাণ করতে চাই, আলেমরাও বাংলা ভাষায় পণ্ডিত হতে পারে। এ উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তিনি অবশ্যই সফল।

আমার দৃষ্টিভঙ্গি এ বিষয়ে ভিন্ন। কুরআনের আলো সাধারণ পাঠক-পাঠিকার অন্তরে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে অতি সহজ ভাষায় তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ হওয়া আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। '৮০ বা '৮১ সালে মওদূদী একাডেমীর চেয়ারম্যান জনাব আব্বাস আলী খানের নিকট প্রস্তাব দিলাম। প্রস্তাব বাস্তবায়নের পরামর্শ হিসেবে বললাম, 'সহজ অনুবাদে সক্ষম লোক যোগাড় করার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদকদের ডেকে টেস্ট নিন।' প্রায় ২০ জন অনুবাদক টেস্ট দিলেন। খান সাহেব নিজেই সাহিত্যিক। সাহিত্যের মানেই তিনি বিবেচনা করেছেন। তাই আমার এ আশা পূরণ হলো না। টেস্টে কেউ টিকলো না।

১৯৮০ ও ৮১ সালের রমযান মাসে দুটো এতেকাফে ১৮ দিন খরচ করে পরীক্ষামূলকভাবে তাফহীমুল কুরআনের আমপারাটুকুর তাফসীরের সার-সংক্ষেপ তৈরি করলাম। যারা বাংলা ভাষা কোনো রকমে পড়তে পারে তারাও যাতে বুঝতে পারে তেমন সহজ ভাষায় লিখার চেষ্টা করলাম। '৮২ সালে পয়লা ছাপা হলো।

কুরআনের অনুবাদে অভিজ্ঞ ও ইসলামী আন্দোলনে আমার অন্যতম মুরব্বী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের নিকট এক কপি পাঠালাম। আবেদন রাখলাম যে, কোথাও ভুল থাকলে মেহেরবানী করে যেন চিহ্নিত করে দেন।

জওয়াবে তিনি লিখলেন, 'আমপারার ভাষাই কুরআনের সবচেয়ে কঠিন ভাষা ও উন্নত সাহিত্যিক মানের ভাষা। এর অনুবাদ ঐ মানেই হওয়া উচিত। একেবারে সাধারণ লোকের ভাষায় অনুবাদ করে আপনি কুরআনের অপমান করেছেন।' মাওলানাকে আমি লিখলাম, 'আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে যা লিখেছেন আমি এতে আপত্তি করবো না। তবে আপনার লেখা থেকে এ সার্টিফিকেট পেয়েই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি যে আমার অনুবাদ সাধারণ লোকও বুঝতে পারবে।' আরো লিখলাম, 'আমি সাহিত্যিক নই। সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে আমি লিখি না। দীনের দাওয়াত ব্যাপকভাবে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যেই আমি লিখি। এতে সাহিত্য মানের ধার আমি ধারতে চাই না।'

এ ঘটনাটি এ কথা প্রমাণ করার জন্যই লিখলাম যে, আমি জাতে সাহিত্যিক নই এবং সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমি লিখি না। দাওয়াতে দীনের দায়িত্ববোধ নিয়েই আমি লিখি। এ লেখায় সাহিত্যিক মান রক্ষিত হলো কিনা সেটা আমার বিবেচ্য বিষয়ই নয়।

আমপারার এ সার-সংক্ষেপের এক কপি ড. সৈয়দ আলী আহসানকে উপহার দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে জানালেন, 'এ পর্যন্ত আমপারার যে কয়টি অনুবাদ পড়েছি, আপনার অনুবাদ আমার নিকট সবচেয়ে ভালো লেগেছে।' আমি বললাম, 'আমি আমপারার অনুবাদক নই। মাওলানা মওদূদীর উর্দু অনুবাদের বাংলায় অনুবাদ করেছি। আমি অনুবাদের অনুবাদক।' তিনি বললেন, 'আমিও অনুবাদ করে থাকি। তাই আপনার অনুবাদের মান বিচার করেই বলেছি।' তার মতো পণ্ডিতের সার্টিফিকেট পেয়ে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং অনুবাদের ব্যাপারে আমার নিজের উপর আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের (বিআইসি) ডাইরেকটর অধ্যাপক একেএম নাজির আহমদের অবিরাম চাপে পয়লা ২৯ পারা, এরপর ২৮, ২৭ ও ২৬ পারার সার-সংক্ষেপ রচনা করেছি। এক একটি পারা করতে আমপারার মতোই দু'দু'টি এতেকাফের সময় লেগেছে।

আল্লাহর মহান বাণীর আলো সর্বসাধারণের দুয়ারে পৌঁছাবার আবেগময় বাসনা নিয়ে তাফহীমুল কুরআনের শেষ ৫ পারার সার-সংক্ষেপ রচনা করা হলো। এতে ৬৯টি সূরা রয়েছে। আমপারার ৩৭টি সূরার সাথে সূরা ফাতেহা শামিল হওয়ায় মোট ৭০টি সূরা হয়ে গেলো। এর মধ্যে মাক্কী সূরার সংখ্যা ৫১। ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান সংগ্রামী যুগে মাক্কী সূরার প্রয়োজনীয়তাই বেশি। আমি আশা করি এর সাহায্যে ইসলামী আন্দোলনের অল্প শিক্ষিত কর্মীরা কুরআনের আলো সংগ্রহ করতে সহজেই সক্ষম হবেন।

আমার পক্ষে গোটা তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ রচনা করা সম্ভব হলো না। কিন্তু যে সহজ ভাষায় ৭০টি সূরার অনুবাদ করা হয়েছে সে ভাষায় বাকি সূরাগুলোর অনুবাদ করার বাসনা ত্যাগ করতে পারিনি।

তাফহীমুল কুরআনের বিরাট তাফসীর পড়ার সাধ্য যাদের নেই, তারা যাতে কুরআনকে মোটামুটি বুঝতে পারে সে ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে মাওলানা মওদূদী নিজেই 'তরজমায়ে কুরআন মজীদ' নামে আলাদা একটি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। সে গ্রন্থে সূরার কোনো ভূমিকা লিখেননি বটে, কিন্তু ছোট ছোট টীকা লিখে তাফসীর পড়ার উদ্দেশ্য কিছুটা পূরণ করার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে পাঠক অনুবাদ ও টীকার সাহায্যে সূরাটির অর্থ বুঝে নিতে পারে।

তাফহীমুল কুরআনের শেষ ৫ পারার মতো গোটা তাফসীরের সার-সংক্ষেপ রচনা করা সম্ভব না হলেও অন্তত তরজমায়ে কুরআন মজীদের অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ১৯৯২-৯৩ সালে জেলে থাকার সুযোগে প্রথম দশ পারা অনুবাদ করলাম। 'আল কুরআনের সহজ অনুবাদ' নামে আধুনিক প্রকাশনী তা ময়দানে ছেড়েছে।

তরজমায়ে কুরআন মজীদের বাংলা অনুবাদ এক গ্রন্থে যেটা বাজারে আছে তা তাফহীমুল কুরআনের যে অনুবাদ মাওলানা আবদুর রহীম করেছেন সেটাই।

মাওলানা মওদূদী প্রত্যেক সূরার যে ভূমিকা লিখেছেন তা সূরার মর্মকথা বুঝার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এ ভূমিকা ছাড়া শুধু অনুবাদ ও টীকা যথেষ্ট নয়। মাওলানা তাফহীমুল কুরআনে সূরার যে সব ভূমিকা লিখেছেন তা অল্প শিক্ষিতদের জন্য বুঝা সহজ নয়। তাই আমি মাওলানার ভূমিকার ভিত্তিতেই সহজভাবে বুঝবার উপযোগী ভূমিকা রচনা করেছি।

১১ পারা থেকে ২৫ পারা পর্যন্ত ১৫ পারার অনুবাদ এখনো করতে পারিনি। যে কয়টি কাজ করার জন্য আমি জামায়াতের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছি এর মধ্যে এ অনুবাদের কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সবার কাছে দোয়া চাই, যাতে এ মহান কাজটি সমাধা করার তাওফীক আল্লাহ্ তাআলা দান করেন। আমার লেখা এ পর্যন্ত যে ৬৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে এর মধ্যে চটি বই বা পুস্তিকার সংখ্যাই বেশি। এ সবই ইসলামী চিন্তামূলক, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন এবং বাংলাদেশ ও এর রাজনীতি বিষয়ক। নিছক সাহিত্য হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য কোন বই লিখেছি বলে মনে করি না। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি সাহিত্যিক মানে উন্নীত কিনা তা বিবেচনা করা আমি প্রয়োজন মনে করিনি।

সাংস্কৃতিক অঙ্গন

আমি সংস্কৃতিমনা তো বটেই, সংস্কৃতিপ্রেমী বলেও নিজেকে মনে করি। কিন্তু সাংস্কৃতিক ময়দানে আমার পদচারণা নেই। সংস্কৃতি শব্দটি অবশ্যই ব্যাপক অর্থবোধক। কৃষ্টি, কালচার, তমদ্দুন, শুদ্ধিকরণ, অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান-বুদ্ধির উৎকর্ষ, পরিচর্যা, পরিশীলন ইত্যাদি অর্থ এ শব্দটি বহন করে।

যে অর্থে আমি সংস্কৃতিসেবী নই বলে উল্লেখ করছি তা প্রচলিত সীমিত অর্থে। যেমন সাহিত্য, কাব্য, নাটক, সংগীত, চিত্র শিল্প ও অংকন শিল্প।

যারা ভাবুক ও চিন্তাশীল তাদের মধ্যে কিশোর বয়সে কাব্য রোগ হয়তো দেখা দেয়। কিন্তু জাতে কবি না হলে ডিগ্রি ও পেশার চাপে তা উপশম হয়ে যায়। এ রোগ সাময়িক এবং নিরাময়যোগ্য।

আমার ছোট ভাই গোলাম মুয়ায্যামের নাইন-টেনে পড়ার সময় এ রোগ হয়েছিলো। পাঠ্যবইতে যত রকম কবিতা আছে সব সাইজের কবিতা লিখে খাতা ভর্তি করে ফেলেছিলো। আইএসসি ও ডাক্তারি পড়ার বেলায় তার কাব্যচর্চা আপনিতেই বন্ধ হয়ে গেলো।

নাইন-টেনে পড়ার সময় হোস্টেলে হস্তলিখিত ম্যাগাজিনে আমার লেখা কবিতাও স্থান পেয়েছিলো। ১৯৬৪ সালে ঢাকা জেলে ৫ মাস থাকাকালে জেল লাইব্রেরী থেকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্য চর্চার ফাঁকে আল্লাহকে সম্বোধন করে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলাম যা সংরক্ষিত আছে। একই কামরায় মাওলানা আবদুর রহীম, জনাব আব্দুল খালেক ও মাওলানা আবদুর রহমান ফকীরের সাথে বসবাস করা সত্ত্বেও তারা আমার এ গোপন কারবার সম্পর্কে জানতে পারেননি। জাতে কবি হলে তো তাদেরকে না শুনিয়ে থাকতেই পারতাম না।

নাটক ও অভিনয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে হল ইউনিয়নের উদ্যোগে নাটক মঞ্চস্থ করা হতো। এতে অভিনয় করার সামান্য আগ্রহও বোধ করিনি। হল ইউনিয়নের দায়িত্বে থাকাকালে নাটক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায়ও অংশ নিয়েছি। নাটকের দর্শকও ছিলাম। কিন্তু আমাকে অভিনয়ের দায়িত্ব নিতে হয়নি।

আমার জীবনে দু'বার মাত্র অভিনয় করেছি। একবার যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, আর একবার যখন ক্লাস নাইনে পড়ি।

জুনিয়র মাদ্রাসার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে ছোট্ট একটা নাটক মঞ্চস্থ হয়। এতে তিনজন মাত্র অভিনেতা, দরবেশ, নাস্তিক ও বিচারক। পণ্ডিত স্যার আমাকে নাস্তিকের ভূমিকায় অভিনয় করার দায়িত্ব দেন। অভিনেতাদের সংলাপ সবটুকুই কবিতার আকারে ছিলো।

দরবেশ তার উপযোগী পোশাকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মঞ্চে বসা। নাস্তিক হিসেবে দরবেশের দরবারে হাজির হয়ে তাকে আমি ৪টি প্রশ্ন করলাম। প্রশ্নগুলো চমৎকার ছন্দময় কবিতায় আবৃত্তি করা হলো। দরবেশ মাটির এক ঢেলা আমার মাথা লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলো। বলা বাহুল্য, ঢেলাটি মেটে রং-এর কাপড়ে তৈরি ছিলো।

দরবেশের ঢেলায় ভীষণ আহত হয়ে বেদনার্ত চিৎকার দিয়ে মঞ্চ থেকে দৌড়িয়ে চলে গেলাম। এরপর বিচারকের আদালতে দরবেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলাম। আঘাতপ্রাপ্ত মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় কাতরভাবে দরবেশের জুলুমের বিরুদ্ধে

বিচার চাইলাম। বিচারক আসামীকে আদালতে হাজির করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিলেন। আসামী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ালে বিচারক আমাকে অভিযোগ পেশ করার নির্দেশ দিলেন। ছন্দময় কবিতায় আমি বললাম যে, দরবেশকে আমি ৪টি প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি প্রশ্নের জওয়াব না দিয়ে আমাকে ঢিল মেরে আহত করে দিলেন। আমি প্রচণ্ড ব্যথায় অস্থির। হুজুরের নিকট আমি এর বিচার চাই। বিচারক আমাকে প্রশ্নগুলো শুনাবার নির্দেশ দিলে আমি ঐ ৪টি প্রশ্ন আবৃত্তি করলাম।

বিচারক আসামীর নিকট কৈফিয়ত তলব করলেন। প্রশ্নের জওয়াব না দিয়ে ঢিল মারা হলো কেনো জানতে চাইলেন। দরবেশ ছন্দময় কবিতায় বিচারককে সম্বোধন করে বললেন, 'হুজুর আমি তো মারার নিয়তে তাকে ঢিল মারিনি। সে যে ৪টি প্রশ্ন করেছে এর সঠিক জওয়াবই আমি ঐ ঢিলের মাধ্যমে দিয়েছি।' বিচারক বিনীত হয়ে জানতে চাইলেন, ঢিল মেরে প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার মানে কী?

দরবেশ চমৎকার যুক্তি প্রদর্শন করে প্রমাণ করলেন যে, নাস্তিকের ৪টি প্রশ্নের জওয়াব হিসেবেই ঢিল ছোঁড়া হয়েছে। বিচারক দরবেশের জওয়াব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে আসামীকে বেকসুর খালাস দিলেন এবং নাস্তিক সঠিক জওয়াবই পেয়েছে বলে রায় দিলেন। আমার এখনও মনে আছে যে, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই ঐ ছোট্ট নাটকটি উপভোগ করেছেন।

ঐ চারটি প্রশ্ন কি ছিলো এবং দরবেশ কিভাবে প্রমাণ করলেন যে এক ঢিল মেরেই সব প্রশ্নের সঠিক জওয়াব দেওয়া হয়েছে তা সত্যিই উপভোগ্য ছিলো। ছন্দময় চমৎকার কবিতা তো আমার মুখস্থ থাকার কথা নয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, স্মৃতি সাগর মন্থন করে মাত্র প্রথম দুটো প্রশ্ন এবং এর জওয়াব আবিষ্কার করা সম্ভব হলেও বাকি দুটো কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না।

প্রথম প্রশ্ন : হে দরবেশ তুমি যে আল্লাহর কথা বল তাকে দেখাতে পার? শুধু তোমার কথায় আমি স্বীকার করব কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : জিন আগুন দিয়ে তৈরি। দোযখের আগুনে জিন শাস্তি পাবে কেমন করে?

দরবেশ আদালতে জওয়াব দিলেন, বাদীর ব্যান্ডেজ করা মাথায় ভীষণ ব্যথা করছে বলে যে দাবি করছে তা না দেখালে আমরা শুধু তার কথায় বিশ্বাস করব কেনো?

আর মানুষ মাটির তৈরি। আমি মাটির ঢিলা মেরেছি। আগুনে তৈরি জিন যদি দোযখের আগুনে কষ্ট না পায় তাহলে মাটির মানুষ কেমন করে মাটির ঢেলায় কষ্ট পাবে?

প্রশ্ন দুটো ও এর উত্তর অল্প কথায় এখানে প্রকাশ করা হলো। সংলাপ অবশ্য বেশ লম্বাই ছিলো।

ঢাকা ক্লাস নাইনের ছাত্র থাকাকালে কলতাবাজার হোস্টেলে 'আলেকজান্ডার' ও 'রাজা পুরো' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার ভারত বিজয়কালে রাজা পুরোকে বন্দি করেন। বন্দি রাজার সাথে বিজয়ী আলেকজান্ডারের সংলাপই এ নাটকের প্রধান বিষয়। আমাকে আলেকজান্ডারের দেহরক্ষীর ভূমিকায় অভিনয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

গান

আমি গায়ক না হলেও গান পছন্দ করতাম। আকর্ষণীয় সুরে গাওয়া গান পছন্দ করে না এমন মানুষ বিরল। তবে হলের কমন রুমে রেডিওতে গানের আসরে যারা গানের নেশায় জমায়েত হতো আমি তাদের মধ্যে গণ্য ছিলাম না।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিএ পরীক্ষার পর গীতাঞ্জলির গান এবং নজরুলের রচিত হামদ ও নাত নির্জনে গেয়ে তৃপ্তি পেতাম। কাউকে শুনাবার জন্য গাইবার চেষ্টা করিনি। ঐ সময়ই কোলকাতায় বেড়াতে গেলাম। আমার ছোট চাচা জনাব শফিকুল ইসলাম প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তেন এবং আমার ছোট ভাই গোলাম মুয়ায্যাম তখন কোলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। দু'জনেই বিখ্যাত বেকার হোস্টেলে থাকতেন।

আব্বা আমাকে কোলকাতার ঐ হোস্টেলে চাচা ও ভাইয়ের সাথে থেকে এমএ পড়ার পরামর্শ দিলেন। বিএ পরীক্ষার ফল তখনো বের হয়নি। কোলকাতায় বেড়াতে গিয়ে প্রথমে বেকার হোস্টেলে রইলাম। লেক এলাকায় আমার এক মামার বাড়ি ছিলো। মামা তখন বেঁচে ছিলেন না, মামী ছিলেন। ঐ বাড়িতে বেড়াতে গেলে মামী কয়েকদিন থাকতে বাধ্য করলেন। একটি পৃথক কামরায় থাকার ব্যবস্থা করলেন। একদিন দরজা বন্ধ করে মনের আনন্দে গান গাইতে লাগলাম। হোস্টেলে এমন নির্জন পরিবেশ ছিলো না। এখানে একা থাকার সুযোগে গান গাইলাম।

রাতে খাবার পর মামী আমাকে নিয়ে ছাদে উঠলেন। দোতলার উপর ছাদে উঠে চারপাশে অনেক ছাদ দেখা গেলো। ফুটফুটে চাঁদনী রাত ছিলো। '৪৬ সালের জুন মাস। চমৎকার বাতাস বইছিলো। মামীর স্কুল পড়ুয়া মেয়ে বেবী মাদুর ও বালিশ নিয়ে হাজির হলো। খুব আদর করে মামী বললেন, 'বাবা তোমার এমন মিষ্টি গলা। আমাকে নাত শুনাতে হবে।' বিস্ময় ও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে বললাম 'আমি তো গায়ক নই।' বললেন, 'বাবা আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। দিনে তোমার গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। ঐ গানগুলোই এখন শুনতে চাই।'

এভাবে ধরা পড়ে গিয়ে খুবই লজ্জিত হলাম। মামীর চাপে পড়ে 'মুহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে' নাতটি গাইতে থাকলাম। মামী যোশের চোটে শোয়া থেকে উঠে বসলেন। আরও একটা গাইবার দাবি জানালেন। গাইলাম 'সাহারাতে ফুটলরে ফুল'। ইতঃপূর্বে এমন গলা ছেড়ে গাইনি এবং শোনাবার জন্যও গাইনি। মামীর পিপাসা আরও বেড়ে গেলো। আমারও নিজের কণ্ঠের উপর আস্থা সৃষ্টি হলো।

এবার গাইলাম 'ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ'। ইতোমধ্যে আশপাশের ছাদে বেশ কিছু মহিলা জমা হয়ে গেলো। এতক্ষণ সেদিকে আমি লক্ষ্য করিনি। ওরা এদিকে তাকিয়ে চুপ চাপ বসে আছে দেখে বুঝলাম যে, আমার গান শুনছে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেলাম। মামীর কাছে মাফ চেয়ে দ্রুত আমার কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন এক রকম জোর করেই হোস্টেলে চলে গেলাম।

২৪.

বিএ পাসের পর

১৯৪৬ সালের মে মাসেই বিএ পরীক্ষার ফল বের হলো। আগেই বলেছি, কী কারণে অনার্স ডিগ্রি নিতে পারলাম না। পাস কোর্সে কমপক্ষে তিনটি বিষয় নিতে হয়। প্রতি বিষয়ে তিন পেপারে ৩০০ নম্বর থাকে। আমার বিষয় ছিলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংরেজি ও আরবী। বাংলা ১০০ নম্বরের এক পেপার ও ইংরেজি ১০০ নম্বরের এক পেপার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক।

বাংলা পেপারের জন্য সপ্তাহে ১টি ক্লাস ছিলো। ইংরেজির জন্য শুধু টিউটরিয়াল ক্লাস হতো। ইংরেজির এ পেপারে পাস না করলে অনার্সের ডিগ্রিও মুলতবি করা হতো। সাইন্স কমার্সসহ সব বিভাগের ছাত্রদেরকেই এ পরীক্ষা দিতে হতো। প্রথমবার পাস না করলে আরও দু'বার পরীক্ষার সুযোগ পেতো। আমি প্রথম পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছিলাম।

কোথায় এমএ পড়ব?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পড়ার সিদ্ধান্ত করেই তো আরবী অনার্স বাদ দিয়ে পাস কোর্সে বিএ পাস করলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্যাল সাইন্স ডিপার্টমেন্ট অনেক পুরানো। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্যাল ইকোনমি নামে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান একই বিভাগের অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান ডি এন বানার্জী ১৯৪৮ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর সেখানে পলিটিক্যাল সাইন্স ডিপার্টমেন্ট পৃথক বিভাগ হিসেবে শুরু হয় এবং ডি এন বানার্জী প্রথম হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট হন।

কোলকাতায় এ বিভাগটি নতুন বলে সেখানে পড়ার প্রেরণা বোধ করিনি। ঢাকায় পড়ার আগ্রহই প্রবল ছিলো। বিশেষ করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার মতো আবাসিক নয় বলে ঢাকা ছেড়ে যেতে মন মোটেই চাচ্ছিল না। কিন্তু আব্বার সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত মেনে নিলাম। আমার ছোট চাচা শফীকুল ইসলাম ও ছোট ভাই কোলকাতায় একই হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছিলেন। বিখ্যাত বেকার হোস্টেলে তাদের সাথে থাকার নির্দেশ পেলাম।

সেকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্রকে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিতে হতো। সে অনুমতিপত্রের নাম ছিলো মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট। মাইগ্রেশন মানে তো দেশান্তর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো ছাত্র যাতে চলে না যায় সে নিয়ন্ত্রণ আরোপের উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা রাখা হয়। আমার অভিভাবক হিসেবে আব্বাকে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার বরাবর দরখাস্ত করতে হয়। দরখাস্তে পর্যাপ্ত যুক্তি দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মত করাতে হয়। যা হোক, মাইগ্রেশন পাওয়া গেলো।

কোলকাতা পৌঁছার তারিখ ঠিক করা হলো ১৬ আগস্ট ১৯৪৬। হোস্টেলে সিট বরাদ্দ হলো আমার নামে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে গোটা ভারতে ১৬ ডিসেম্বর ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে (প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস) পালনের ঘোষণা হলো। সবাই পরামর্শ দিলো যে, ঐ তারিখে কী হয় তা না দেখে কোলকাতা যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। যাবার প্রস্তুতি থেমে গেলো।

ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে

ব্রিটিশ সরকারের কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব কবুল করে মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের দাবি মুলতবি করে কংগ্রেসের সাথে সমঝোতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহরুর হঠকারিতার ফলে কেবিনেট মিশন প্ল্যান ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসের ২৭-২৯ তারিখে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে বোম্বে শহরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যে প্রস্তাবে ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয় তা নিম্নরূপ–

'যেহেতু কংগ্রেসের অনমনীয়তা ও ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসভঙ্গের কারণে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল কেবিনেট ডেলিগেশন ও ভাইসরয় কর্তৃক ১৬ মে (১৯৪৬) প্রদত্ত বিবৃতিতে দেওয়া প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু সমঝোতা ও নিয়মতান্ত্রিক পথে ভারতীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে মুসলিম ভারত সব ধরনের প্রচেষ্টা নিঃশেষ করেছে। যেহেতু ব্রিটিশের পরোক্ষ সমর্থনে বলীয়ান হয়ে কংগ্রেস বর্ণ হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর; যেহেতু সাম্প্রতিক ঘটনাপঞ্জী প্রমাণ করেছে যে, ভারতীয় ব্যাপারে ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা নয় বরং ক্ষমতার রাজনীতি নির্ধারণই বিষয়বস্তু; যেহেতু এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়েছে যে, স্বাধীন ও পূর্ণ সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক প্রতিষ্ঠা ছাড়া ভারতীয় মুসলমান শান্ত থাকবে না এবং মুসলিম লীগের অনুমোদন ও সম্মতি ছাড়া কোনো সংবিধান রচনাকারী সংস্থা অথবা স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী সংবিধান অথবা কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের যে কোনো প্রচেষ্টাকে বাধা দেবে, নিখিল ভারত

মুসলিম লীগ কাউন্সিলের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আশ্রয় গ্রহণ করার, তাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করার, তাদের সম্মান রক্ষা করার এবং বর্তমান ব্রিটিশ-দাসত্ব ও ভবিষ্যৎ বর্ণ হিন্দু আধিপত্য ঝেড়ে ফেলার সময় মুসলমান জাতির জন্য এসেছে।'

'এই কাউন্সিল জাতিকে তাদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পেছনে দাঁড়াবার ও যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানাচ্ছে।'

'কাউন্সিল উপরে ঘোষিত নীতিকে কার্যকরী করতে ও প্রয়োজনবোধে শীঘ্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে মুসলমানদেরকে সংগঠিত করতে শীঘ্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি তৈরির জন্যে ওয়ার্কিং কমিটিকে নির্দেশ দিচ্ছে।'

'ইংরেজের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তাদের গভীর ক্ষোভের প্রতীক হিসেবে সরকারের দেওয়া সব ধরনের খেতাব বর্জনের জন্যে মুসলমানদের প্রতি এই কাউন্সিল আহ্বান জানাচ্ছে।' (তথ্য : জাতীয় রাজনীতি ৪৫ থেকে ৭৫ ঃ অলি আহাদ, পৃঃ ১৭)

মুসলিম লীগ সংগ্রাম দিবসে এমন কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করেনি যা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সৃষ্টি করতে পারে। মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ২ আগস্ট (১৯৪৬) সংগ্রাম দিবসের নিম্নরূপ কর্মসূচি ঘোষণা করে ঃ

'ভারতীয় মুসলমানদেরকে ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সালে সকল কাজকর্ম বন্ধ রাখতে এবং হরতাল পালন করতে আহ্বান জানাচ্ছে।' (জাতীয় রাজনীতি ৪৫-৭৫, পৃঃ ১৮)

কোলকাতায় মুসলমানরা দাঙ্গার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। হিন্দুরা যে মারাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে সে সম্পর্কেও বেখবর ছিলো। ফলে হিন্দুদের সশস্ত্র আক্রমণে বহুসংখ্যক মুসলিম নিহত হয়েছে। মুসলমানদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস বা লুট হয়েছে। বহু মুসলিম মহিলা ইয্যত হারিয়েছে।

আমার কোলকাতা পড়া হলো না

১৬ আগস্ট '৪৬ সালে কোলকাতায় হাজার হাজার মুসলমান হিন্দুদের হাতে নিহত হবার পর স্বাভাবিক কারণেই আমার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হতে হলো। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সারেন্ডার করে আমার প্রিয় ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ প্রথম বর্ষে ভর্তি হলাম।

শিক্ষকদের মধ্যে একজন মাত্র মুসলমান ছিলেন, যিনি এসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের মর্যাদায় সবেমাত্র পৌঁছেছেন। তিনি অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী। তিনি আমাদের হলের হাউজ টিউটর থাকায় তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়। এমএ শেষ বর্ষে আমি

ও তোয়াহা (কমরেড) এক সাথেই তাঁর কাছে প্রাইভেট পড়েছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন।

আরো একজন মুসলিম অধ্যাপক অল্পদিন পূর্বে উচ্চ ডিগ্রির জন্য বিদেশে চলে না গেলে তাকেও শিক্ষক হিসেবে পেতাম। তার নাম অধ্যাপক আবদুর রায্যাক যিনি পরবর্তীকালে জাতীয় অধ্যাপক ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন। বিএ পড়ার সময় টিউটরিয়েল ক্লাসে তাঁর কাছে কিছুদিন পড়েছি। লেকচার ক্লাসে যে কয়জন পড়াতেন তারা সবাই হিন্দু ছিলেন।

পলিটিক্যাল সাইন্স ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন ড. নিউম্যান নামে পোল্যান্ডের এক লোক। পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হলে তিনি পালাতে বাধ্য হন। তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন।

হল ইউনিয়ন নির্বাচনে আমার অংশগ্রহণ

এমএ প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পরপরই ১৯৪৬-৪৭ সেশনের হল নির্বাচন শুরু হলো। '৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে আমি সরদার ফজলুল করীম প্যানেলের প্রধান নির্বাচন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের কারণে নির্বাচনী ময়দানে ব্যাপক পরিচিত ছিলাম। নির্বাচনে চুপচাপ থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আর তা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধও ছিলো। নির্বাচনী প্যানেল গঠনে তৎপর হলাম।

এক প্যানেল তৈরি হয়ে গেলো ইতিহাস বিভাগের মুয়ায্যাম হুসাইন চৌধুরীর নেতৃত্বে। অর্থনীতি বিভাগের আযহারুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে অপর প্যানেল গড়ে উঠবার সূচনাতেই তিনি জিদ ধরলেন যে, আমি জেনারেল সেক্রেটারি হতে রাজি না হলে তিনি ভিপি পদে দাঁড়াতে সম্মতি দিবেন না। এ প্যানেলের সংগঠকদের পাল্লায় পড়লাম।

আমি নির্বাচনে প্রার্থী হবার কথা চিন্তাও করিনি। আযহারুল হক চৌধুরীর প্যানেলের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিলাম। আমরা পাশাপাশি দু'কামরায় থাকতাম। তিনি এক ক্লাস সিনিয়র হলেও সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো। বাধ্য হয়ে জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সম্মত হলাম।

নির্বাচনে মুয়ায্যাম প্যানেল বিজয়ী হয়ে গেলো। তীব্র প্রতিযোগিতাই হলো। ভোটের ব্যবধান বিরাট ছিলো না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো, আমাদের প্যানেলের সবাই পরাজিত হলেও আমি রেকর্ড সংখ্যক ভোট পেয়ে জিএস নির্বাচিত হয়ে গেলাম। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সবচেয়ে কম ভোট পেয়ে পরাজিত হলো। তিনি বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। '৭১ সালে তিনি টাঙ্গাইলের ডিসি থাকাকালে আমার সাথে ফোনে কথা হবার পর আর যোগাযোগ হয়নি।

মুয়ায্যাম হোসাইন চৌধুরী ভিপি এবং আমি জিএস হিসেবে দুজন দু'প্যানেল থেকে নির্বাচিত হলেও আমাদের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হতে অসুবিধা হয়নি। এক টীম

হিসেবে আমরা একবছর হল ইউনিয়নে আন্তরিকতার সাথেই কাজ করেছি। বাইরের রাজনৈতিক প্রভাব হল ইউনিয়ন নির্বাচনে না থাকায় স্পোর্টসম্যান স্পিরিটেই নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেবার ঐতিহ্য পূর্ব থেকেই গড়ে ওঠেছিলো।

মুয়ায্যাম হোসাইন চৌধুরী প্রখ্যাত আইনজীবী ও এককালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামীদুল হক চৌধুরীর ভাতিজা। মুয়ায্যাম সাহেব ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাস পেলেন এবং পাকিস্তানের প্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সিএসপি অফিসার হয়ে গেলেন। তার সাথে আমার এখনো যোগাযোগ আছে।

আযহারুল হক চৌধুরী শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদে থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। কয়েক বছর আগে এক বিয়েতে তার সাথে শেষ দেখা। আন্তরিক মহব্বতের সাথে কোলাকুলি হলো। কিছুদিন পরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

ছাত্র রাজনীতি

সেকালে মুসলিম ছাত্র লীগ ছাড়া কোনো উল্লেখযোগ্য ছাত্র সংগঠন ছিলো না। পাকিস্তান কায়েম হবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম ছাত্র লীগের কর্মতৎপরতা কোলকাতাকেন্দ্রিক ছিলো। ঢাকায় মুসলিম ছাত্ররা পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষেই ছিলো বলে ছাত্রদেরকে পৃথকভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। হল নির্বাচনের সাথে দেশের রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তাই ছাত্র রাজনীতি হল ও বিশ্ববিদ্যালয়েই কেন্দ্রীভূত ছিলো। ক্যাম্পাসের বাইরের রাজনীতি মুসলিম লীগের নেতৃত্বেই পরিচালিত হতো।

পাকিস্তান কায়েম হবার পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ঢাকা পূর্ব বঙ্গের রাজধানী হওয়ায় মুসলিম লীগের নেতৃত্ব কোলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। মুসলিম লীগের রাজনীতি তখনো ক্যাম্পাসের বাইরেই ছিলো।

বঙ্গ বিভাগের পূর্বেই প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্বে দুটো গ্রুপ সৃষ্টি হয়। এক গ্রুপের নেতা মাওলানা আকরাম খান, খাজা নাজিমুদ্দীন ও জনাব নূরুল আমীন। অপর গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন জনাব হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাশেম। বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত হবার পর পূর্ব বঙ্গে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে নির্বাচিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিং হয়। এতে প্রথম গ্রুপ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব বঙ্গের প্রাদেশিক সরকার প্রধান হন। আগেই আলোচনা করেছি যে, পূর্ব বঙ্গে মুসলিম লীগ জনাব আবুল হাশেম ও জনাব শামসুল হকের নেতৃত্বে গণ-সংগঠনে পরিণত হয়। প্রথম গ্রুপের নেতাদের অবদান এক্ষেত্রে অতি নগণ্য। তাই পূর্ব বঙ্গে যুব নেতৃত্ব খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রতি কোনো আকর্ষণই বোধ করেনি।

শামসুল হক ও তার সহকর্মী খোন্দকার মুশতাক, অলি আহাদ, তাজুদ্দীন, তোয়াহা, নাঈমুদ্দীনদের মতো যুবকদেরকে সোহরাওয়ার্দী-হাশেম গ্রুপের লোক মনে করে

তাদেরকে কাছে টানার চেষ্টা না করায় মুসলিম লীগ সরকার ছাত্র অঙ্গনে প্রবেশ পথই পায়নি। কোলকাতা থেকে আগত মুসলিম ছাত্র লীগের নেতারা ঢাকায় সম্পূর্ণ অপরিচিতই ছিলো বলা চলে। পাকিস্তান আন্দোলনের ছাত্র কর্মীদের সবাই আমার মতোই শামসুল হকের ভক্ত ছিলো। তাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বাইরের রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলো।

ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে খাজা গ্রুপের কেউ ছিলেন না। বরং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন '৫২ সালের জানুয়ারির ২৭ তারিখে পল্টন ময়দানে 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলে ঘোষণা দেবার প্রতিক্রিয়ায়ই '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন নতুন করে বেগবান হয়। ২১ ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলীতে সালাম-জব্বার-বরকতদের নিহত হবার ফলে ভাষা আন্দোলন গণরূপ লাভ করে।

ভাষা আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক দলের আন্দোলন ছিলো না। মুসলিম লীগ সরকার এ আন্দোলনকে দমন করার অপরাধে ছাত্র সমাজের অন্তর থেকে উৎখাত হয়ে যায়।

মুসলিম লীগ সরকার অবশ্যই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ছিলো। সে সরকার যদি গণতান্ত্রিক রাজনীতির যথাযথ লালন করতো তাহলে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন জাতির উপর চেপে বসতো না। এ দেশে ছাত্র মহলে ঐ আমলেই সন্ত্রাসী রাজনীতির সূচনা হয়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু থাকলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাহিনী তৈরি হয় এবং তারাই জনগণকে সংগঠিত করে। নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকারের উত্থান-পতন হতে থাকে। যেমন প্রতিবেশী দেশ ভারতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দল গণনির্ভর হয়। তাদেরকে ছাত্রনির্ভর হতে হয় না।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার রাজনীতিতে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ খতম করে দিয়েছে। সেশনজটের কারণে ছাত্রজীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে। ফলে বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভারতে যেয়ে লেখাপড়া করতে বাধ্য হচ্ছে।

মহামান্য প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দীন আহমদ গত কয়েক বছর যাবত বারবার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট আহ্বান জানিয়েছেন যাতে ছাত্রদেরকে দলীয় রাজনীতিতে জড়িত না করেন। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী এ ব্যাপারে মহামান্য প্রেসিডেন্টের বক্তব্য সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছে। জামায়াত নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্টকে সাক্ষাতে সমর্থন জানালে তিনি মন্তব্য করেন, 'আপনারা সমর্থন করলেও বড় দুটো দল তো সমর্থন করে না।' ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারার পরিবর্তন না হলে দেশের ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার হবার আশঙ্কা প্রবল

২৫.

বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন নির্বাচন

বর্তমান ডাকসু (DUCSU-Dhaka University Central Student's Union) নামে পরিচিত সংস্থাটিকে সেকালে Dhaka University Student's Union বলা হতো। সম্ভবত সংক্ষিপ্ত নামে DUCSU উচ্চারণে সুবিধার উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল শব্দটি যোগ করা হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের সংখ্যা অনেক। মহিলাদেরও কয়েকটি হল রয়েছে। আমাদের সময়ে মুসলিম ছাত্রদের দুটো হল এবং হিন্দু ছাত্রদের দুটো হল ছিলো। ছাত্রীদের কোন হল ছিলো না। ছাত্রীরা ঐ ৪টি হলের সাথে এটাচ্ড্ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো এবং বাড়ি বা বাসা থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতো। অল্প সংখ্যক ছাত্রী একটি হোস্টেলে থাকতো। এ হোস্টেলের নাম ছিলো 'চামেরী হাউজ'।

ইতঃপূর্বে 'বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন নির্বাচন' শিরোনামে লেখা হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হোস্টেলের নাম ছিলো 'চামেলী হাউজ'। সুসাহিত্যিক মিন্নত আলী সাহেব দৈনিক সংগ্রামে এ নাম সঠিক নয় বলে অভিমত প্রকাশ করে জানালেন যে, হোস্টেলটির নাম ছিলো 'চামেরী হাউজ'।

আমার সহপাঠী বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও '৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব কফীলউদ্দীন মাহমূদের সাথে আলাপ করে জানা গেলো যে, মিন্নত আলী সাহেবের কথাই ঠিক। কিন্তু ছাত্র মহলে 'চামেলী' নামটাই চালু ছিলো। আমি এ নামই জানতাম এবং আমার সাথী ছাত্ররা এ নামই বলতো।

কফীলউদ্দীন মাহমূদ থেকে এ নামের ইতিহাসও জানলাম, যা আগে আমার জানা ছিলো না। সচিবালয়ের কতক ইংরেজ কর্মকর্তা, যারা সপরিবারে ছিলেন না, তারা এ বাড়িতে মেস করে থাকতেন এবং তারাই এ নাম রেখেছিলেন। নামটি বেশ অর্থপূর্ণই ছিলো। শব্দটি ছিলো CHUMMERY HOUSE. 'Chum' অর্থ একই ঘরের বাসিন্দা বা অন্তরঙ্গ বন্ধু।

জনাব মিন্নত আলী দৈনিক সংগ্রামে 'জীবনে যা দেখলাম' নিয়মিত পড়েন, জেনে খুব খুশি হলাম। তিনি আমাকে এ লেখার জন্য মোবারকবাদ জানালেন এবং লেখা অব্যাহত রাখার প্রেরণাও দিলেন।

হল ইউনিয়নের মতো ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের নির্বাচন প্রতি বছর নিয়মিত হতো না। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ছাত্রদের পাঠ্যসূচি বহির্ভূত যাবতীয় কর্মকাণ্ড

হলকেন্দ্রিক ছিলো বলে বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন না থাকলেও বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হতো না। বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের কর্মসূচি হল ইউনিয়নের মতো ব্যাপকও ছিলো না।

১৯৪৪-এর ১ জুলাই থেকে আমার বিএ ১ম বর্ষ শুরু হলো। ঐ মাসেই হল ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু '৪৪-৪৫ সেশনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের নির্বাচন হয়নি। কেন হয়নি তা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করাও প্রয়োজন মনে করেননি বলে জানতে পারিনি।

১৯৪৫-৪৬ সালের বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন নির্বাচন

১৯৪৫-৪৬ সেশনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একটি মাত্র প্যানেল এর বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। কোনো পাল্টা প্যানেল না থাকায় নির্বাচনী প্রচারাভিযানেরও প্রয়োজন হয়নি। দুটো প্যানেল থাকলে সাধারণ ছাত্র ভোটারদের নিকট প্রার্থীদেরকে পরিচিত হতে হতো। আমরা প্রার্থীদের নামের তালিকা দেখলাম বটে; কিন্তু তাদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম না। ফরিদ আহমদ নামের ইংরেজি বিভাগের একজন ছাত্র স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে হলে যেয়ে ছাত্রদের নিকট ভোট প্রার্থনা করায় তাকে দেখলাম, কমনরুমে সমবেত ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে নিজের পরিচয় তুলে ধরলেন। বলা বাহুল্য, সেকালে ইংরেজিতেই সর্বত্র বক্তব্য পেশ করতে হতো। আর কোন প্রার্থী ছাত্রদের সামনে এভাবে না আসায় ফরিদ আহমদ চমৎকার বক্তা হিসেবে অনেকের মনেই স্থান করে নেন। আমিও তাকে ভোট দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরকেও তাকে ভোট দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। অথচ ফরিদ আহমদের সাথে তখনও ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন নির্বাচনে হল নির্বাচনের মতো উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়নি। ১৬ সদস্য বিশিষ্ট প্যানেলের মধ্যে আমাদের হলের ৪জন ছাড়া আর কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চেনার সুযোগ পাইনি। ১৬ জনের মধ্যে পনের জনকে আমি ভোট দিলাম। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ৪ জনের মধ্যে একজনকে বাদ দিয়ে ফরিদ আহমদকে দিলাম। এভাবে নীরবে নির্বাচন হয়ে গেলো। প্যানেলের ১৫ জন ও ফরিদ আহমদ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেই পাস করলেন। ইনিই মৌলভী ফরিদ আহমদ নামে খ্যাত নেযামে ইসলাম পার্টির নেতা শহীদ ফরিদ আহমদ।

হল ইউনিয়নে যেমন ভিপির নামেই প্যানেলকে পরিচিত করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্যানেলে কে ভিপি আর কে জিএস এরও কোন উল্লেখ না থাকায় প্রার্থীদের নাম নিয়ে তেমন চর্চাও হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র হল ইউনিয়ন থেকে ভিন্ন রকমের ছিলো। হল ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রার্থীদের যে প্যানেল হতো তাতে প্রত্যেক প্রার্থীর পদের কথাও উল্লেখ করতে হতো। ভোটার ঐ নির্দিষ্ট পদের জন্য কোনো প্রার্থীকে ভোট দিতো।

বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের নির্বাচন পদ্ধতি

বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন নির্বাচন পদ্ধতি নিম্নরূপ ছিল–

চারটি হলের প্রত্যেক হল থেকে ৪জন প্রার্থীকে সকল হলের ছাত্র-ছাত্রীরা ভোট দিতো। এভাবে ৪×৪=১৬ জন ছাত্র নির্বাচিত হতো। ছাত্রীদের চামেরী হাউস নামক হোস্টেলের একজন প্রতিনিধিসহ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদের ১৭ জন সদস্য নির্বাচিত হতো। ভাইস চ্যান্সেলর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে গঠনতন্ত্র মোতাবেক ১৭ জনের বৈঠকে তাদের মধ্যে পদ বণ্টন করতেন। দুটো পদের গুরুত্ব বেশি হওয়ায় গঠনতন্ত্রে ভিপি ও জিএস-এর মনোনয়নের নিম্নরূপ বিধান ছিলো ঃ

১. ভিপি যদি মুসলিম হয় তাহলে জিএস হবে হিন্দু।

২. পালাক্রমে ৪ হল থেকে ভিপি ও জিএস হবে।

৩. এক সেশনে ভিপি মুসলিম হলে পরবর্তী সেশনে ভিপি হবে হিন্দু।

৪. অন্যান্য বিভাগীয় সেক্রেটারির সমান সংখ্যায় ৪ হলের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

এ বিধান অনুযায়ী '৪৫-৪৬ সেশনের ভিপি পদ পেলো সলীমুল্লাহ মুসলিম হলের আহমদুল কবীর (বর্তমানে দৈনিক সংবাদের মালিক ও সম্পাদক)। জিএস হলো জগন্নাথ হলের একজন, যার নাম মনে নেই। হল ইউনিয়নের মতো ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের নির্বাচিত পরিষদের জাঁকজমকপূর্ণ অভিষেক অনুষ্ঠান হয়েছে বলেও মনে পড়ছে না। ভিপি আহমদুল কবীরের পরিচালনায় ইউনিয়নের কোন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয়েছিল কিনা তাও স্মরণে আসছে না।

৪৫ সালের শেষদিকে জানা গেলো ফরিদ আহমদকে ভিপি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কারণ আহমদুল কবীর ছাত্র জীবন শেষ করে চলে গেছেন।

১৯৪৭-৪৮ সেশন

১৯৪৬-৪৭ সেশনে ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ঐ সেশনের হল ইউনিয়ন নির্বাচনে আমি হলের জিএস হই। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। আমি তখন এমএ ১ম বর্ষের ছাত্র।

১৯৪৭-৪৮ সেশনে আমি এমএ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র থাকাকালে ঐ সেশনের জন্য ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নে '৪৭-৪৮ সেশনের নির্বাচনে ঢাকা হল থেকে হিন্দু ভিপি এবং ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে জিএস হবার কথা।

'৪৭-এর জুলাইর শুরুতেই হল ইউনিয়নের নির্বাচনী অভিযান চলছে। আমাদের হলে তোয়াহাকে ভিপি করে যে প্যানেল হয়েছে আমি এরই সমর্থক। পূর্ববর্তী হল ইউনিয়ন নির্বাচনে তোয়াহা ও আমি একই প্যানেলের পক্ষে কাজ করেছি। আমরা দু'জনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ ২য় বর্ষের ছাত্র। বিএতে আরবী ক্লাসেও আমরা সহপাঠী

ছিলাম। বৃহত্তর নোয়াখালীর বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার এক বর্ধিষ্ণু জোতদার পরিবারে তাঁর জন্ম। চমৎকার বিশুদ্ধ কেরাআত পড়তে পারতো। আমরা হলে এক সিট বিশিষ্ট পাশাপাশি কামরায় থাকতাম। সকালে একসাথে রুমেই নাস্তা করতাম। ভাষা আন্দোলনেও আমরা সহযোদ্ধা। হলে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবেই পরিচিত ছিলাম।

এ তোয়াহাই পরবর্তীকালে কমরেড গলাকাটা তোয়াহা নামে খ্যাত হয়।

হল ইউনিয়ন নির্বাচনে তোয়াহা ভিপি হয়ে গেলো। তারই নেতৃত্বে হলের অনেকেই আমাকে ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের জিএস হবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে প্রার্থী হতে বাধ্য করলো। ঢাকা হলের (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) অরবিন্দ বোসকে ভিপি করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি হল থেকে ৪ জন করে নিয়ে ১৬ জনের প্যানেল তৈরি করা হলো।

বিকল্প কোন ফুল প্যানেল না হলেও বেশ সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী বিভিন্ন হল থেকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় আমাদের প্যানেলকে বিজয়ী করার জন্য নির্বাচনী অভিযান জরুরি হয়ে পড়লো। ফজলুল হক মুসলিম হল ও ঢাকা হল একেবারেই পাশাপাশি, মাঝখানে একটি পুকুর মাত্র।

ঢাকা হলের অরবিন্দ বোস ও আমি আমাদের প্যানেলের পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে একসাথে সব হলে রুমে রুমে যেয়ে ক্যানভাস করায় সবার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এ প্যানেল নির্বাচিত হলে আমরা দু'জনই ভিপি জিএস হবো। দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় এ অভিযান চললো। চারটি হলে সব ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে হলো অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের বাসায় যেয়ে দেখা করার জন্য। রাতদিন খেটে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। দু'জনকে দুটো সাইকেলে একসাথে সারা শহরে ভোটারদের ঠিকানার তালিকা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ধরনা দিতে হয়েছে, যাতে কেউ বলতে না পারে যে, তাদের কাছে যাওয়া হয়নি।

এ কঠিন পরিশ্রমের সুফল পাওয়া গেলো। বিপুল ভোটে গোটা প্যানেল পাস করলো। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কোন পাত্তাই পেলো না। বিজয়ের আনন্দ এক অদ্ভুত অনুভূতি। প্রায় তিন সপ্তাহের কঠিন দৈহিক পরিশ্রম ও ক্লান্তি কেমন করে দূর হয়ে গেলো বুঝাই গেলো না। নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে আমরা দু'জন আবার সব হলের রুমে রুমে যেয়ে হাত মিলিয়ে রাত ১২টা পর্যন্ত হাসি মুখে 'থ্যাঙ্ক ইউ' দিতে থাকলাম। ঘন্টার পর ঘন্টা গাল কুচকিয়ে হাসি দিতে দিতে মুখমণ্ডলে ব্যথা বোধ হলো।

ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর ড. সৈয়দ মুয়ায্যাম হোসেন। আমি যখন '৪৪ সালে আরবী অনার্স নিয়ে ভর্তি হই তখন তিনি আরবীর হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন। পোশাক পরিচ্ছদে একেবারে ইংরেজ সাহেব। এমন কি মাথায় হ্যাট পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। দাড়ি তো ছিলোই না। দেখতে বেশ সুপুরুষ ছিলেন।

নির্বাচনের পর তাঁরই সভাপতিত্বে কার্জন হলে জাঁকজমকের সাথে অভিষেক অনুষ্ঠিত হলো। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারির বক্তৃতা এবং কিছু আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির পর ভ্যারাইটি পারফরমেন্সের (বিচিত্রানুষ্ঠানের) সাথে সাথে লাইট রিফ্রেশমেন্ট (হাল্কা নাস্তা) পরিবেশন করা হয়। বর্তমানে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' নামে যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয় তখন এর প্রচলন ছিলো না।

হাল্কা নাস্তা পরিবেশনের সময়টুকু অতিথিদেরকে একটু আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানে কিছু গান, কিছু আবৃত্তি শুনাবার ব্যবস্থা ছিলো। আবৃত্তি করলো ছাত্ররা, আর গান গাইল রেডিওর শিল্পীরা।

আগেই বলেছি, হল ইউনিয়নের মতো সারাবছর নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের দায়িত্ব ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের ছিলো না। যে সব কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে করা প্রয়োজন, সে কয়টি কর্মসূচিই পালন করা হতো। যেমন ইন্টার-হল লিটারারি কমপিটিশন ও ইন্টার-হল স্পোর্টস। বাইরের রাজনীতি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে প্রবেশ না করায় ইউনিয়নের তৎপরতা রাজনীতিমুক্তই ছিলো।

এ ছাড়া দু'একটি এমন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে করতে হয়েছে, যা হলের আওতায় পড়ে না। এ জাতীয় অনুষ্ঠান ইউনিয়নের নিয়মিত কার্যতালিকায়ও ছিলো না। এ ধরনের দুটো অনুষ্ঠানের উল্লেখ করছি।

ড. মাহমুদ হোসাইনের সম্বর্ধনা

ড. মাহমুদ হোসাইন ১৯৪৮ সালের (কোন্ মাস মনে নেই) মাঝামাঝি সরকারি সফরে ঢাকায় আসলেন। তখন তিনি পাকিস্তান সরকারের স্টেট মিনিস্টার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে রীডার ছিলেন এবং ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভোস্ট ছিলেন। আমি হল ইউনিয়নের জিএস থাকাকালে তিনিই প্রভোস্ট হিসেবে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সে হিসেবে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে তাঁর ঢাকা আগমন উপলক্ষে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন থেকেই করা হলো। ভাইস চ্যান্সেলর ড. সৈয়দ মুয়ায্যাম হোসেনের সভাপতিত্বে কার্জন হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতির নির্দেশে স্বাগত বক্তব্য আমাকেই দিতে হয়। ইউনিয়নের ভিপি অনুপস্থিত ছিলো।

ড. মাহমুদ হোসাইন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষক হিসেবে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাই আমার ওয়েলকাম এড্রেসে যেমন আবেগ প্রকাশ পেয়েছে, অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ড. মাহমুদ হোসাইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁর প্রাণের সম্পর্ক প্রকাশ করতে গিয়ে নিজেও আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন, যা আমাদের সবারই হৃদয় স্পর্শ করে।

পরবর্তীতে আইউব খাঁর সামরিক শাসনামলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৬০ সালে (জামায়াতে ইসলামী তখন বে-আইনি) তামীরে মিল্লাত নামে সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত ৭ দিনব্যাপী ইসলামী সেমিনারে তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন্ বছর তিনি চলে গেলেন তা জানি না। তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর থাকাকালে ১৯৭২ সালে তাঁর সাথে তাঁর অফিসে আমার শেষ সাক্ষাৎ হয়।

প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান

১৯৪৮ সালের ২৭ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়াম ময়দানে ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক বিরাট ছাত্রসমাবেশের আয়োজন করা হয়। ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরকে এতে শরীক হবার আহবান জানানো হয়।

যে উপলক্ষে এ মহা ছাত্রসমাবেশ তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের ঢাকায় প্রথম আগমন উপলক্ষে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে স্মারকলিপি দেবার উদ্দেশ্যেই এ আয়োজন।

'৪৮ সালের জুন মাসে আমার এমএ ক্লাসে কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ায় গ্রীষ্মের ছুটির পর হলে আর উঠিনি। আমার নামে যে সিট বরাদ্দ ছিলো এর মেয়াদ জুন পর্যন্তই ছিলো। আমি তখন আমার চাচা সরকারি কর্মকর্তা জনাব শফীকুল ইসলামের টিকাটুলিস্থ ভাড়া বাসায় থাকি এবং মগবাজারে নতুন ক্রয় করা বাড়ি ও জমি দেখাশুনায় ব্যস্ত।

'৪৮-৪৯ সালে ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের নির্বাচন না হওয়ায় এ সেশনেও জিএস-এর দায়িত্ব আমার উপরই রইল। কিন্তু হলে না থাকায় আমার জন্য এ দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে পড়লো। তাই ভারপ্রাপ্ত জিএস হিসেবে নির্বাচিত সদস্যদের একজনের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

'৪৮-এর ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করার জন্য একটি মেমোরেন্ডাম রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি আবদুর রহমান চৌধুরীর উপর (যিনি বিচারপতি হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন)। একটি কমিটি স্মারকলিপিটি চূড়ান্ত করে।

ইউনিভার্সিটি ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাইস চ্যান্সেলর ড. সৈয়দ মুয়ায্যাম হোসেন তখন বিদেশে থাকায় ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর জনাব সুলতানুদ্দীন আহমদকে সভাপতিত্ব করতে হয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের পর তিনি গভর্নর হয়েছিলেন।

ছাত্র মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর সামনে মেমোরেন্ডামটি কে পাঠ করে শুনাবে এ নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলো। ছাত্র ইউনিয়নের ভিপি'র উপরই এ দায়িত্ব দেওয়া স্বভাবিক ছিলো। কিন্তু স্মারকলিপিতে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক দাবি-দাওয়ার তালিকায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ থাকায় সবাই একমত হলো যে, ঐ পরিস্থিতিতে একজন হিন্দুর হাতে প্রধানমন্ত্রীকে তা পেশ করা মোটেই সমীচীন নয়। কারণ মুসলিম লীগ সরকার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পেছনে হিন্দুদের হাত আবিষ্কার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান হিসেবে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ছাত্র ইউনিয়নের জিএস গোলাম আযমকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সমাবেশে সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র যোগদান করায় বিরাট জিমনেশিয়াম গ্রাউন্ডের বাইরের রাস্তাও ভর্তি হয়ে যায়। সভামঞ্চে সভাপতির ডানপাশে প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান আসন গ্রহণ করেন। তাঁর আসনটি সামনের টেবিলের শেষ মাথায় ছিলো। এর ডানপাশেই বেগম রানা লিয়াকত আলী আসন গ্রহণ করেন। বেগমের সামনে টেবিল ছিলো না। বেগম সাহেবের সামনেই মাইক্রোফোনের স্ট্যান্ড ছিলো। আমি যখন মাইকের নিকট দাঁড়ালাম তখন লক্ষ্য করলাম যে, আমার মাত্র হাত দু'য়েক পেছনেই বেগম রানা বসা আছেন। আমি পড়ে শুনাতে শুরু করলাম। ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পাকিস্তানের সার্বিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে আমাদের সর্বাত্মক ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্যের গুরুত্ব প্রকাশ করে এবং প্রাদেশিক ও আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ মনোভাবের প্রতি কঠোর নিন্দাবাদ জানিয়ে যা পড়া হলো তাতে খুশি হয়ে প্রধানমন্ত্রী টেবিলে হাত চাপড়ালেন। চমৎকার ইংরেজিতে রচিত স্মারকলিপিটি ধীর গতিতে এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করে পড়ে শুনাচ্ছিলাম।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে লেখা প্যারাটি যখন পাঠ করলাম তখন সমাবেশের সবাই হাততালি দিয়ে জোর সমর্থন জানান। হাততালি দীর্ঘায়িত করার সুযোগ দেবার জন্য আমি থামলাম। পেছনে বেগম রানার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'লেংগুয়েজ কি বারেমে সাফ সাফ কাহ্ দেনা' (ভাষার বিষয়ে স্পষ্ট করে বলে দেবে)।

আবার পড়া শুরু করলাম। ভাষার দাবি সংক্রান্ত প্যারাটি আরও বলিষ্ঠকণ্ঠে আবার পড়ে শুনালাম। সমাবেশে হাততালি আরও জোরে চললো এবং অনেকেই দাঁড়িয়ে সমর্থন জ্ঞাপন করলো। হাততালি থেমে যাবার পর আবার দীর্ঘ মেমোরেন্ডামের বাকি অংশ পড়ে শুনালাম।

আয়নায় বাঁধাই করা ফ্রেমে স্মারকলিপিটি ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। তিনি আমার সাথে হাত মিলিয়ে নীরবে তা গ্রহণ করলেন।

এরপর তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। ঐ বছরই মার্চ মাসে কায়েদে আযম জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসভায় 'একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে, আর কোন ভাষা নয়' উচ্চারণ শুনে আমি আরও কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে রাগ করে হলে চলে গেলাম। একদিন পর কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কায়েদে আযম ঐ একই কথা উচ্চারণ করার প্রতিবাদে কতক ছাত্র 'নো নো' আওয়াজ দিলে তিনি বিস্মিত হয়ে থামলেন।

আমি আশঙ্কা করলাম যে, প্রধানমন্ত্রী কায়েদে আযমের দোহাই দিয়ে নিশ্চয়ই ঐ কথাই উচ্চারণ করবেন। বক্তৃতার শুরুতেই তিনি রাগত স্বরে বললেন, 'এসব যদি প্রাদেশিকতা না হয় তাহলে কাকে প্রাদেশিকতা বলা যায়?' ধমকের সুরে বললেন, 'দেশের স্বার্থে ও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে আঞ্চলিকতাকে বরদাশ্‌ত করা হবে না।'

আমার আশঙ্কা আরও বেড়ে গেলো যে, যদি ভাষার ব্যাপারে কায়েদে আযমের মতো বলে ফেলেন এবং বেগমের পরামর্শ অনুযায়ী স্পষ্ট করে তেমন কোনো ঘোষণা দিয়ে বসেন, তাহলে না জানি কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমি তখন কী করবো? বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে সমাবেশের হাজার হাজার ছাত্রের প্রচণ্ড সমর্থন সত্ত্বেও মঞ্চে আমার চুপ মেরে হযম করা কী করে সম্ভব হবে? প্রতিবাদে আমাকে দাঁড়িয়ে 'নো নো' বলতেই হবে।

আমি এ মানসিক অস্থিরতায় ভাষা সংক্রান্ত বক্তব্য শুনবার জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম প্রধানমন্ত্রীর সুর বদলে গেছে। তিনি অন্যান্য দাবি সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য রাখতে লাগলেন। ছাত্রদেরকে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেবার পরামর্শ দিলেন। জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য হবার আহ্বান জানালেন। কিন্তু ভাষা সম্পর্কে কোন কথাই বললেন না। তিনি বলতে পারতেন যে, একা আমার পক্ষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সম্ভব নয়। গণপরিষদ বা পার্লামেন্টই সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি সমাবেশের অবস্থা বিবেচনা করেই হয়তো ভাষার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য দেওয়া সমীচীন মনে করেননি। আমরা তাঁর বক্তৃতায় সন্তুষ্ট না হলেও প্রতিবাদ করার মতো সুযোগও পেলাম না। একজন চালাক নেতা হিসেবে তিনি পরিস্থিতি সামলে নিলেন।

২৬.

এমএ ফাইনাল পরীক্ষা

১৯৪৮ সালের অক্টোবরে আমার এমএ ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া উচিত ছিলো। এমএ প্রথম বর্ষে ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়নের জিএস হিসেবে দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে আরও কিছু ব্যক্তিগত অসুবিধার দরুন সন্তোষজনক প্রস্তুতি হয়নি বিবেচনা করে আমি পরীক্ষা এক বছর পরে দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পরবর্তীতে আমি উপলব্ধি করলাম যে, পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত মোটেই সঠিক হয়নি। আমি নিয়মিত ক্লাসে হাজির থাকতাম ও শিক্ষকদের লেকচার নোট করতাম। এ অবস্থায় ভালো ফল করার বাহানায় পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া মস্তবড় ভুল ছিলো। কোন ভালো ছাত্রই একটা শিক্ষাবর্ষ নষ্ট করতে চায় না। এ ভুলটির দরুন আমার দেড়টি বছর অপচয় হয়ে গেলো। আমি আশা করি, আমার মতো এমন ভুল সিদ্ধান্ত যেনো কেউ না নেয়।

'৪৮ সালে পরীক্ষা না দেওয়ায় আমার জীবন থেকে একটি বছর অপচয় হবার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার দেড় বছর ক্ষতি হয়ে গেলো। কারণ ১৯৪৯ সালে বছরের শেষার্ধে দু'বার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হওয়ায় ঐ বছর এমএ পরীক্ষা হতেই পারেনি। ১৯৪৯ সালের ফাইনাল এমএ পরীক্ষা ১৯৫০-এর মার্চ মাসে এবং ১৯৫০-এর পরীক্ষা ঐ বছর নভেম্বরে হলো।

আমার এমএ ডিগ্রি পাওয়ার কথা ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে। অথচ আমার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ডিগ্রি পেলাম ১৯৫০-এর জুলাই মাসে।

তাবলীগ জামায়াতের আকর্ষণ

পরীক্ষার দু'মাস আগে আব্বা ঢাকায় এলেন। আসরের নামাযের পর বললেন, 'চল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই।' হুকুম অনুযায়ী আব্বার সাথে চললাম। ঘোড়ার গাড়ি একমাত্র যানবাহন ছিলো। হেঁটেই গেলাম। সেকালে মাইল দু'মাইলের পথ হেঁটে চলায় সবাই অভ্যস্ত ছিলো। আজকাল তো অবস্থা এমন যে, ৫/৭ মিনিটের পায়ে চলা পথের জন্যও রিকশা চাই।

যা হোক, আব্বা আমাকে নারিন্দার এক মসজিদে নিয়ে গেলেন। রাস্তায় অন্যান্য কথা হলেও কোথায় কেন নিয়ে যাচ্ছেন সে বিষয়ে কিছুই বললেন না। মসজিদে ঢুকেই দেখা গেলো ২৫/৩০ জন লোক হাত তুলে মোনাজাত করছেন। যিনি দোয়া পরিচালনা করছেন তিনি অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় দোয়া করছেন। বাংলা ভাষায়ই দোয়া করছেন। ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষায় এমন চমৎকার দোয়া শুনিনি। তিনি নিজেও কাঁদছিলেন এবং তার সাথে যারা হাত তুলেছেন তারা সবাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। দোয়ার কথাগুলো আমার অন্তর স্পর্শ করলো। আমার চোখেও অঝোরে পানি এলো। আল্লাহকে ডেকে কাঁদতে এমন অদ্ভুত স্বাদ পেলাম, যা মনে প্রশান্তি এনে দিলো। দোয়া শেষ হলে দোয়া পরিচালকের সাথে আব্বা পরিচয় করিয়ে দিলেন। খুবই সুন্দর, সুপুরুষ তিনি। দেখেই মহব্বত বোধ করলাম। তিনি পূর্ব-পাকিস্তান তাবলীগ জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুল আযীয। জানা গেলো যে, আব্বার সাথে তাঁর আগেই সম্পর্ক কায়েম হয়েছে। তিনি আমাকে বুকে টেনে নিয়ে এমন উষ্ণ স্নেহ বিতরণ করলেন যে, আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। তিনি আমার মন জয় করে

ফেললেন। পরামর্শ দিলেন যেনো প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এশার নামায লালবাগের খান মুহাম্মদ মসজিদে পড়ি। ঢাকার তাবলীগী ভাইয়েরা সেখানে নিয়মিত যান।

পরবর্তীকালে জানতে পারলাম যে, মাওলানা সাহেব যে হৃদয়স্পর্শী দোয়া বাংলা ভাষায় করেছিলেন তা সবই কুরআন ও হাদীসের দোয়ার অনুবাদ। উপলব্ধি করলাম যে, আমাদের মহান রব কত মেহেরবান যে, তাঁর কাছে সুন্দরভাবে চাওয়ার ভাষাও শিখিয়ে দিয়েছেন। যেভাবে চাওয়া প্রয়োজন বান্দাহ সে মানে যাতে চাইতে পারে সে জন্যই এ ব্যবস্থা করেছেন।

সরকারি বড় বড় চাকরির জন্য দরখাস্তের মুদ্রিত ফরম থাকে। দরখাস্তকারী ঐ ফরম পূরণ করে দস্তখত করে দেয়। পিয়ন ও দারোয়ান জাতীয় ছোট চাকরির জন্য সরকারি উদ্যোগে দরখাস্তের ফরম তৈরি করার প্রয়োজন হয় না।

আল্লাহর দরবারে অতি সাধারণ মূর্খ লোকও নিজের ভাষায় মনের আকুতি পেশ করে থাকে। আল্লাহর নিকট অবশ্যই তা গুরুত্ব পায়। কিন্তু যারা আল্লাহর নৈকট্য ও মহব্বতের কাঙ্গাল, আল্লাহ ও রাসূলের (স) শেখানো দোয়া ছাড়া তাদের মনের তৃপ্তি হয় না। সূরায়ে ফাতেহার মধ্যে যে আবেগপূর্ণ দোয়া এর অনুবাদ কি মনের তারে ঐ ঝঙ্কার সৃষ্টি করতে পারে?

তাবলীগী তালীম

মাওলানা আব্দুল আযীযের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী বৃহস্পতিবার লালবাগের খান মুহাম্মদ মসজিদে যেয়ে এশার নামাযে শরীক হলাম। নামাযের পর ৭/৮ জন গোল হয়ে বসলেন। আমার ধারণা হলো যে, এরাই তাবলীগের লোক। কারো সাথে আগে পরিচিত নই। তারা যেভাবে হাসিমুখে পরস্পর সালাম বিনিময় ও মুসাফাহা করলেন তাতে বুঝলাম, তারা সবাই পূর্ব-পরিচিত। আমি তাদের কাছে যেয়ে জানতে চাইলাম, তারা তাবলীগের লোক কিনা। তাদের একজন আমাকে হাত বাড়িয়ে আবেগের সাথে আলিঙ্গন করে তাদের মাঝে বসিয়ে আগ্রহভরে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন।

আমি এমএ পরীক্ষার্থী শুনে তারা সবাই আল হামদুলিল্লাহ বলে উঠলেন। আমি তাদের নিকট নারিন্দা মসজিদে তাবলীগের আমীর মাওলানা আব্দুল আযীযের সাথে সাক্ষাতের বিবরণ দিলাম। আমার আব্বা আমীর সাহেবের বন্ধু জেনে তারা আবেগ আপ্লুত হয়ে আমার সাথে হাত মিলালেন।

এরপর তাদের সাপ্তাহিক বৈঠকের কার্যক্রম শুরু হলো। আমি ছাড়া সবাই পুরানো মনে হলো। হাইকোর্টের এক কর্মচারী আবদুল হক ভাই বৈঠক পরিচালনা করছিলেন। তিনি তাবলীগের ৬ দফা উসূল বয়ান করার জন্য একজনকে নির্দেশ দিলেন। জানা গেলো যে, প্রত্যেক বৈঠকে এক এক জনকে বয়ান করার দায়িত্ব

দেওয়া হয়, যাতে সবাই বক্তৃতা করা শিখতে পারে। কয়েক সপ্তাহ পর আমার উপরও এ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তাবলীগের ৬ উসূলের বয়ান ওখানেই পয়লা শুনলাম। উসূল ৬টি হলো– কালেমা, নামায, ইলম ও যিকর, একরামে মুসলিম (মুসলমানকে সম্মান করা), তাসহীহে নিয়াত (নিয়ত সহী করা) এবং নাফারুন ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথে বের হওয়া)। বক্তা উচ্চ শিক্ষিত না হলেও কথাগুলো মোটামুটি গুছিয়েই বলতে পারলেন। শুনতে বেশ ভালোই লাগলো।

আধ ঘণ্টা পর তারা সবাই বাসা থেকে আনা খাবার বৈঠকের জায়গায় নিয়ে এলো। আমিই শুধু খাবার নিয়ে যাইনি। হল থেকে খেয়েও যাইনি। ধারণা ছিলো ফিরে গিয়ে হলে রাতের খাবার খাবো। ফজর পর্যন্ত মসজিদেই থাকতে হবে, সে কথা আমার জানা ছিলো না। একটু বিব্রতবোধ করলাম। আমি খাবার নিয়ে যাইনি বলে সবার খাবার থেকেই আমাকে খেতে বাধ্য করা হলো। তারা সিদ্ধান্ত দিলেন যে, হল থেকে আমার খাবার নিতে হবে না। আমাকে প্রতি বৃহস্পতিবার তাদের মেহমান হতে হবে।

খাওয়ার পর আবার সবাই বৈঠকে বসলেন। নামাযে যা কিছু পড়তে হয় এর এক একটা অংশ সবাইকে আবৃত্তি করতে হয়। সেদিন তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ) শুনাবার পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন করে আবৃত্তি করলেন। আবদুল হক ভাই কারো উচ্চারণে সামান্য ত্রুটি পেলে সংশোধন করে তাকে মশ্‌ক করাতেন। আমার পালা আসলে আমি পূর্ণ কনফিডেন্স নিয়ে বলিষ্ঠ উচ্চারণে শুনালাম। 'আস্‌সালামু আলাইনা' উচ্চারণে নূনের পরে আলিফের উচ্চারণ না হওয়ায় ভুল ধরা পড়লো। আরো কয়েকজনের বেশ ত্রুটি সংশোধন করা হলো। এ পদ্ধতিতেই প্রতি সপ্তাহে সূরা ফাতেহা এবং আমপারার শেষ দশটি সূরাসহ নামাযে যা কিছু পড়তে হয় তা সংশোধন করা হয়। একদিন একটি অংশ মাত্র আবৃত্তি ও সংশোধন করা হয়। আধা ঘণ্টা এ প্রোগ্রাম চলে।

তালীমের এ পদ্ধতিটা আমার খুবই পছন্দ হলো। ছোট সময় নামায শেখার পর সারা জীবন কোথাও কাউকে শুনাবার সুযোগ হয়নি। শুদ্ধ করে পড়তে জানেন এমন কাউকে না শুনালে নিজের ভুল নিজে ধরা সম্ভব নয়। মসজিদের ইমামগণ যদি তাঁর মুক্তাদিদেরকে ৫/৭ জনের গ্রুপ করে প্রত্যেক গ্রুপে বিশুদ্ধ পড়তে জানেন এমন একজন বসিয়ে শুনাবার ব্যবস্থা করেন তাহলে মুসল্লীগণ খুবই উপকৃত হতে পারে।

আমাদের মহল্লার মসজিদে বেশ কয়েক বছর আগে এ কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে দেখা গেলো উচ্চশিক্ষিত, বয়স্ক, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত লোকেরও বেশ ভুল ধরা পড়লো। পূর্বেই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করায় এতে কেউ লজ্জাবোধ করেননি। বরং তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, সারাজীবন ভুলই পড়ে এসেছেন। শুদ্ধ করার এ সুন্দর সুযোগ পেয়ে সবাই শুকরিয়া জানালেন।

জামায়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইউনিট বৈঠকে এ পদ্ধতি চালু করা হলে সবাই শুদ্ধ উচ্চারণে নামায আদায় করার সুযোগ পাবেন।

তাবলীগী বৈঠকের কর্মসূচি সমাপ্ত করে রাত ১১ টায় সবাইকে ঘুমাতে বলা হলো। রাত সাড়ে তিনটায় তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে দিলো। তাহাজ্জুদের সময় শেষ হবার পর আবার তালীমের বৈঠক বসলো। এ সময় ফাযায়েলের কিতাব থেকে পড়ে শুনানো হলো এবং হেকায়াতে সাহাবা থেকে কোন একটি ঘটনা পড়া হলো। ফজরের আযান পর্যন্ত আধা ঘন্টারও বেশি সময় এ বৈঠক চললো। আযানের পর একসাথে দোয়া করা হলো। চকবাজারে এক লাইব্রেরীতে কর্মরত মুজিবুর রহমান ভাই দোয়া পরিচালনা করলেন। নারিন্দা মসজিদে মাওলানা আব্দুল আযীযের দোয়ার মতোই তিনি আবেগভরা দোয়া করলেন। তিনিও কাঁদলেন, আমরা সবাইও কেঁদে তৃপ্তি পেলাম। এভাবে দোয়া করাই তাবলীগে সর্বত্র প্রচলিত।

গোটা প্রোগ্রামটাই আমার এতো পছন্দ হলো যে, এমএ ফাইনাল পরীক্ষার ফাঁকেও কোন বৃহস্পতিবার বাদ দেইনি। পরীক্ষার দিনগুলোতে সবাই রাত-দিন বেশি সময় পড়াশুনা করে। আর আমি সন্ধ্যার পর থেকে সপ্তাহে একদিন অন্য কাজে ব্যয় করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম 'হে আল্লাহ! পরীক্ষায় যে সব প্রশ্ন রয়েছে সে সব আমি না জানলেও তুমি জান, আমাকে তুমি সাহায্য কর। যাতে আমার প্রস্তুতির বাইরে কোন প্রশ্ন না থাকে। আমি পরীক্ষা চলাকালেও তোমার দীনের টানে সময় খরচ করে ফেলছি। এতে যেন পরীক্ষার কোন ক্ষতি না হয়।'

পরীক্ষা কেমন দিলাম

আল্লাহর মেহেরবানীতে চার পেপারের মধ্যে মাত্র এক পেপারে একটি প্রশ্ন প্রস্তুতির বাইরে পড়ে গেলো। ঐ বছর পলিটিকেল সাইন্সে কেউ ফার্স্ট ক্লাস পাইনি। চারজন হাই সেকেন্ড ক্লাস মার্ক পেল। আমি একটি প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক দিতে পারলে হয়তো প্রথম হতে পারতাম। হয়ে গেলাম তৃতীয়।

এমএ ফাইনাল ক্লাসে আমার সহপাঠী, কেরাম ও ভলিবল খেলার সাথী এবং হলমেট কফীলুদ্দীন মাহমুদ ৪৮ সালের এমএ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে সাথে সাথেই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হয়ে গেলো। ঘটনাক্রমে আমার ঐ পেপারটি, যার একটি প্রশ্ন প্রস্তুতির বাইরে পড়ে গেলো এর পরীক্ষকের দায়িত্ব আমার ঐ সহপাঠীর উপর ছিলো। সে আফসোস করে আমাকে বললো, 'তোমার একটা প্রশ্নের জওয়াব এমন হলো কেন?' লজ্জা পেলাম। তখনই আমার পরীক্ষা মুলতবি করার সিদ্ধান্তটির জন্য অনুতপ্ত হলাম। পরীক্ষা স্থগিত করায় সহপাঠীই আমার পরীক্ষক হয়ে গেলো।

কফীলুদ্দীন মাহমুদ সিএসপি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেলো। বেশ কয় বছর হয় সচিব হিসেবে অবসর নিয়েছেন। '৯১-এর কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। অনেকদিন সিটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন। এখনও একটা সংস্থার প্রধান হিসেবে কর্মজীবনে সক্রিয় আছেন। ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ হয়।

তাবলীগে আকৃষ্ট হলাম

ইতোমধ্যেই আমি তাবলীগ জামায়াতের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। তাবলীগের ৬ উসূলের মধ্যে ৬ নম্বরই হলো নাফারুন ফী সাবীলিল্লাহ। নাফার মানে চলে যাওয়া, দূরে যাওয়া, ছড়িয়ে পড়া ইত্যাদি। কুরআনের 'ইনফিরু-ফী সাবীলিল্লাহ' থেকে এ পরিভাষাটি গ্রহণ করা হয়েছে। সূরা তাওবার এ আয়াতে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে শরীক হবার জন্য আল্লাহ হুকুম করেছেন, 'আল্লাহর পথে বের হও।'

তাবলীগ জামায়াতে লোক তৈরির পদ্ধতি হলো লোকদেরকে একত্র করে ৫, ৭, ১০, ১৫, ২০ জনের জামায়াত বানিয়ে কিছুদিনের জন্য সফরে বের করা। সাধারণত তারা কোনো এক মসজিদে ে য়ে ওঠেন। আসরের পর উপস্থিত মুসল্লীদেরকে মহল্লায় তাদের সাথে 'গাশ্তে' ꣳরীক হবার দাওয়াত দেন। গাশ্ত ফার্সী শব্দ। অর্থ হলো ঘুরে বেড়ানো। অর্থাৎ তারা এক বা একাধিক গ্রুপে রাস্তায় বের হয়ে মহল্লাবাসী যাদের সাথে দেখা হয় তাদেরকে দীনের কথা শুনবার জন্য মাগরিবের নামাযে মসজিদে আসবার দাওয়াত দেন। মাগরিবের পর একজন ৬ উসূল বয়ান করে শ্রোতাদেরকে কিছুদিনের জন্য জামায়াতের সাথে থাকার আবেদন জানান। বয়ানের পর তাবলীগের লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে শ্রোতাদের সাথে কথা বলে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এ মসজিদ থেকে যদি কেউ তাদের সাথে যাবার জন্য রাজি হন তাহলে তাকে নিয়ে পরদিন সবাই অন্য কোন মসজিদে যান।

মসজিদে অবস্থানকালে তারা ঐ কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করেন, যা পূর্বে খান মুহাম্মদ মসজিদের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। যারা তাবলীগে বের হলেন তাদের নামায ও ক্বেরায়াত বিশুদ্ধ করার সাথে সাথে অন্য লোকদেরকে এ পথে আনার চেষ্টা করা যে কর্তব্য সে বিষয়েও তাদেরকে সচেতন করা হয়।

তাবলীগ জামায়াতে যারা বের হয় তাদেরকে দোয়া শেখা ও দোয়া পড়ায় অভ্যস্ত করা হয়। যেমন কোথাও গিয়ে পৌছলে ঐ মহল্লায় বা গ্রামে পৌছার দোয়া পথেই মুখস্থ করানো হয়। মসজিদে পৌছার পর মসজিদে ঢুকবার দোয়া সবাইকে পড়তে হয়। এক সাথে খাবার সময় খাওয়ার শুরুতে এবং শেষে দোয়া পড়ায় অভ্যস্ত করা হয়। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হেঁটে যাবার সময় দোয়াগুলো ভালোভাবে মুখস্থ করানো হয়।

অনেকেই দোয়া শেখেন। কিন্তু শেখা দোয়া প্র্যাকটিস করা হয়ে উঠে না। তাবলীগ জামায়াতে শেখার সাথে সাথে যেখানে যে দোয়া পড়া উচিত সেখানে তার অভ্যাস করানো হয়। যদি গাড়িতে চড়ে যাওয়া হয় তাহলে রেল, বাস, লঞ্চ, নৌকা যাতেই চড়া হোক, একসাথে বসে এ সময়টা তালীমের কাজে লাগানো হয়। এভাবে তাবলীগ জামায়াতে যারা একসাথে চলেন তারা সর্বক্ষণ শিখাতে ও অভ্যাস করতে থাকেন। ঘুমাবার আগের দোয়া, ঘুম থেকে উঠার পরের দোয়া ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করা হয়।

এ কারণেই বলা হয় যে, তাবলীগ জামায়াত চলতা ফেরতা (চলমান-মোবাইল) মাদ্‌রাসা। কালেমা, নামায, ক্বেরায়াত, দোয়া শেখাবার জন্য তাবলীগ জামায়াতের এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।

তাবলীগ জামায়াতের টারগেট

আলেম ও শিক্ষিতদের মধ্যে যারা তাবলীগে শরীক হয় তাদেরকে তাবলীগ জামায়াতের স্থায়ী সংগঠক হিসেবে গড়ে তোলাই আসল টারগেট। সারা জীবন তাবলীগ জামায়াতের কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অল্প কয়দিন তাবলীগে থাকা মোটেই যথেষ্ট নয়। এর জন্য তাদের কোর্স হলো ৩ চিল্লা বা ৪ মাস। চিল্লা ফার্সি শব্দ। এর অর্থ হলো চল্লিশ দিনের মুদ্দত।

যারা চার মাস তাবলীগী সফরে সময় দেন তাদেরকে তাবলীগী জামায়াতের তৈরি লোক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাদেরকে স্থায়ী দায়িত্বশীল হিসেবে কাজ দেওয়া হয়। তারা যেখানে থাকেন সেখানকার কোন মসজিদকে কেন্দ্র করে সাপ্তাহিক নিয়মিত কর্মসূচি পালন করবেন। নিজে সময় দেবেন এবং আরও লোককে সময় দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। এ জাতীয় লোকদের সময় দানের কোর্স হলো সপ্তাহে একদিন, মাসে ৩দিন, বছরে এক চিল্লা।

তাবলীগ জামায়াত জনগণের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যে, এটা নবীওয়ালা কাজ। অর্থাৎ নবী (স) যে কর্মসূচি নিয়ে দীনের কাজ করেছেন তাবলীগী জামায়াত এ কাজই করছে। তাদের এ দাবি কতটুকু সঠিক সে বিষয়ে পরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো। সে সঙ্গে তাবলীগী জামায়াতের দীনী খেতমতের যথাযথ মূল্যায়নও করতে চাই।

২৭.

এমএ পরীক্ষার পর তাবলীগী চিল্লায়

এমএ পরীক্ষার দু'মাস পূর্বে তাবলীগের কাজে শরীক হওয়ার পর দু'মাসে আমি এতটা প্রেরণা বোধ করলাম যে, পরীক্ষার পর তিন চিল্লা বা ৪ মাসের জন্য তাবলীগে বের হয়ে গেলাম।

প্রথম চিল্লা এ দেশে, দ্বিতীয় চিল্লা বিশ্ব-তাবলীগের কেন্দ্র দিল্লিতে এবং তৃতীয় চিল্লা আবার এদেশে।

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে এমএ ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর পরই পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিন চিল্লা বা ৪ মাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে ঢাকার কাকরাইল মসজিদে হাজির হলাম।

মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব তাবলীগী জামায়াতের পূর্বপাক শাখার আমীর ছিলেন বটে; কিন্তু বাস্তব নেতৃত্বের দায়িত্ব ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মুকীত ভাই-ই পালন করতেন। তিনি তখন সচিবালয়ে 'ডিজাইন' বিভাগে চাকরি করতেন। অফিস থেকে বিকালে কাকরাইল মসজিদে এসে এশার নামায পর্যন্ত সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর দাদী ইংরেজ ছিলেন। তাঁর বাপ-দাদা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। মুকীত ভাই দেখতে বড়ই সুপুরুষ ছিলেন। গায়ের রঙ একেবারে কাঁচা হলুদের মতো ছিলো। চেহারাও বেশ আকর্ষণীয় ছিলো। চোখ কালো ছিলো না। ইংরেজদের চোখের মতই ছিলো। চেহারায় সর্বদা প্রশান্ত ভাব এবং মুচকি মিষ্টি হাসি লেগেই থাকতো। তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতে বাধ্য হলাম। তাঁর কথার মিষ্টতা সবাইকে আকৃষ্ট করতো।

কাকরাইল মসজিদ তখন বাদশাহী আমলে তৈরি ছোট আকারে ছিলো। উপর তলায় মসজিদ এবং নিচের তলায় কয়েকটি কামরা। মসজিদের ভেতর এক কাতারে বিশ জনও দাঁড়াতে পারতেন না। মসজিদের ভেতর ও বারান্দার মাঝখানের দেয়াল আড়াই থেকে তিন হাত প্রস্থ। তখন থেকেই এ মসজিদটি তাবলীগের কেন্দ্র ছিলো। প্রতি বৃহস্পতিবার মাসিক ইজতেমা লালবাগ শাহী মসজিদে অনুষ্ঠিত হতো। ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মুকীতের উদ্যোগে এবং তাঁরই ডিজাইন অনুযায়ী বর্তমান বিশাল মসজিদটি নির্মিত হয়।

তাবলীগের তাশকীল পদ্ধতি

আমি ৩ চিল্লার জন্য প্রস্তুত হয়ে কাকরাইল মসজিদে হাজির হলে মুকীত ভাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মুখে দোয়া উচ্চারণ করতে থাকলেন। আমি অত্যন্ত অভিভূত হলাম। আরো যারা চিল্লা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে হাজির ছিলেন তাদেরকে মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত তা'লীম দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মাওলানা আব্দুল আযীয ৬ উসূল সম্পর্কে চমৎকার বক্তব্য রাখলেন, যা আমি মনে গেঁথে নিলাম। মুকীত ভাই চিল্লার উদ্দেশ্য ও চিল্লায় করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় হেদায়াতী বক্তব্য রাখলেন।

এশার নামাযের পর তাশকীল করা হলো। তাশকীল শব্দের অর্থ হলো গঠন করা বা আকৃতি দান করা। আরবী শাক্ল শব্দ থেকে তাশকীল শব্দ গঠিত। তাবলীগের এজতেমায় সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বক্তাগণ বয়ান (বক্তৃতা) করার পর তাবলীগের কর্মীগণ ঐ শ্রোতাদের সাথে ঐ মজলিসেই কথাবার্তা বলে তাদেরকে তাবলীগের সাথে কিছুদিন থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। চিল্লা দেওয়ার জন্য এবং যে যতটা সময় দিতে পারে সে জন্য বক্তৃতায় তাগিদ দেওয়া হয়। এরই ভিত্তিতে তাশকীলের মাধ্যমে কে কতদিন সময় দিতে রাজি হলো তা জানার ব্যবস্থা হয়।

পাকিস্তান আমলে জামায়াতে ইসলামীর সুধী সমাবেশে এবং ছোট ছোট জনসমাবেশে বক্তৃতায় ইসলামী আন্দোলনে যোগদানের গুরুত্ব বুঝাবার পরই উপস্থিত

শ্রোতাদেরকে মুত্তাফিক (সহযোগী সদস্য) ফরম পূরণ করানো হতো। বর্তমানে বড় বড় জনসভায় এটা সম্ভব না হলেও সুধী বৈঠক ও এলাকাভিত্তিক মাসিক সভায় এটা নিয়মিত করতে থাকলে সহযোগী সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকবে। তাবলীগের পরিভাষায় এটাই তাশকীল। টঙ্গীতে বার্ষিক মহাসম্মেলনেও তাশকীলের মাধ্যমে ৩দিন, ৭দিন, ১০দিন এমনকি চিল্লার জন্য জামায়াত গঠন করা হয়।

মরহুম ইঞ্জিনিয়ার খুররাম মুরাদ ঢাকা শহরের আমীর থাকাকালে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদেরকে নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় মুত্তাফিক সংগ্রহ অভিযান চালাতেন। যারা ফরম পূরণ করতো তাদেরকে কর্মী টার্গেট করার জন্য পুরানা কর্মী ও রুকনদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করতেন।

যা হোক, কাকরাইল মসজিদে ঐ রাতে আমি ছাড়া আরো ১৫/১৬ জন চিল্লা দেবার লোক পাওয়া গেলো। এদের বেশিরভাগই এক চিল্লার জন্য রাজি হলেন। চিল্লায় থাকাকালে কেউ কেউ সময় বাড়িয়ে তিন চিল্লাও দিয়েছে। যারা চিল্লা দেবার জন্য সম্মত হলো তাদেরকে জানানো হলো যে, তারা যেনো রাতে মসজিদেই অবস্থান করেন। তাদেরকে ফজরের নামাযের পর তাবলীগী সফরে রওয়ানা করানো হবে।

তিন চিল্লায় রওয়ানা

ফজরের পর মুকীত ভাই প্রয়োজনীয় হেদায়াত দিয়ে আমিসহ বিশজনের একটি জামায়াতের ঘোষণা দিলেন এবং তাদের নাম জানালেন। তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের আমীর মাওলানা আব্দুল আযীয এ জামায়াতের ইমারতের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ কথা শুনে আমি অন্তরে গভীর প্রেরণা বোধ করলাম। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, জানুয়ারিতে আব্বা আমাকে নারিন্দার এক মসজিদে নিয়ে গেলেন যেখানে মাওলানা আব্দুল আযীযের মুনাজাতে আমি মুগ্ধ হই।

এ বিশজনের জামায়াত রওয়ানা হবার সময় মুকীত ভাই আবেগময় দোয়া করে আমাদেরকে বিদায় করলেন। দোয়ার উপর তাবলীগে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। গাশতে (রাস্তায় ও বাড়িতে যেয়ে দাওয়াত দেওয়া) যাবার সময়ও দোয়া করে রওয়ানা হতে হয়। মসজিদের বাইরে রাস্তায় নামার পর মাওলানা আব্দুল আযীয আমাদের সাথে মিলিত হলেন।

এ বিশজনের মধ্যে একেবারে অশিক্ষিত কেউ ছিলো না। সবাই ম্যাট্রিক, আইএ ও মাদ্রাসায় পড়া ছিলেন। ২/৩ জন কিছু পুরানো কর্মীও ছিলেন। তারাই জানতেন যে, এ জামায়াত কোথায় কোথায় যাবে। কেন্দ্র থেকে দেওয়া প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম। যার যার বিছানাপত্র নিজেরাই মাথায়, কাঁধে ও বগলে করে নিলো। আমি এক ব্যাগে প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম।

যানবাহনে চলাচলের চেয়ে হেঁটে চলাই তাবলীগে বেশি পছন্দনীয়। চিল্লার জামায়াতও ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গ বা চট্টগ্রাম পায়ে হেঁটে (পায়দল) যায়। হাঁটতে হাঁটতে সূরা মুখস্থ করা ও দোয়া শেখা সহজ। সময়টা তালীমের কাজে খরচ হয়।

আমরা ২০ জন দু'লাইনে হাঁটা শুরু করলাম। আমাদের আমীর মাঝখানে অবস্থান নিয়ে আমাদের সাথে হেঁটে চললেন। তিনি আমাদেরকে গাড়িতে আরোহণ করার দোয়া শেখাতে শেখাতে ফুলবাড়ীয়া রেলস্টেশনে নিয়ে গেলেন। তিনি কয়েক শব্দ উচ্চারণ করেন, আমরা সবাই একসাথে আওয়াজ করে উচ্চারণ করি। স্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতে দোয়াটি আমার মুখস্থ হয়ে গেলো। অনেককেই গাড়িতে উঠার পর দোয়াটি মশ্‌ক করতে বলা হলো, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়।

নারায়ণগঞ্জ রওয়ানা

নারায়ণগঞ্জের টিকেট কাটা হলো। আগেই শেখানো হলো যে, গাড়িতে উঠবার সময় পয়লা ডান পা পা-দানিতে রেখে বিসমিল্লাহ্ বলে গাড়িতে ঢুকতে হবে। বসার জায়গা পেলে বসে, আর না পেলে স্থির হয়েই আল হামদুলিল্লাহ্ বলে শুকরিয়া আদায় করতে হবে। এর পর ঐ শেখানো দোয়াটি পড়তে হবে। সবাইকে আওয়াজ করে পড়তে হবে, যাতে ভুল হলে শুদ্ধ করে দেওয়া যায়।

জামায়াত পায়দলেই সাধারণত চলে। আমাদের জামায়াতে মাওলানা আব্দুল আযীয থাকায় এবং তিনি চট্টগ্রাম পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে যাবেন বলে যানবাহনেই সফর শুরু করা হলো। তাবলীগ জামায়াত যেখানেই যায় মসজিদেই ওঠে এবং যাবতীয় কর্মসূচি মসজিদভিত্তিকই হয়ে থাকে।

আমরা নারায়ণগঞ্জের এক বড় মসজিদে যেয়ে পৌঁছলাম। গাড়িতে বসা অবস্থায়ই আমরা গাড়ি থেকে নামার দোয়া শিখলাম এবং নামার সময় সবাই আওয়াজ করে পড়লাম। মসজিদে ঢুকবার সময়ও সবাইকে দোয়া পড়ানো হলো।

মসজিদে পৌঁছার পর ওযূ-গোসলের শেষে সবাইকে তালীমে বসানো হলো। ২০ জনকে দু'ভাগে দু'জায়গায় বসানো হলো। মাদ্‌রাসায় পড়া একজনকে এক গ্রুপ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে মাওলানা আব্দুল আযীয অন্য গ্রুপে বসলেন যেটাতে আমি ছিলাম। তাবলীগের তালীম-পদ্ধতি পূর্বে আলোচনা করেছি। সে নিয়মেই যোহরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত তালীম হলো। যোহরের নামাযের পর হোটেল থেকে খাবার এনে মসজিদেই একসাথে খেলাম। খাবার শুরুতে দোয়া সমবেতভাবে পড়ানো হলো। খাওয়ার শেষের দোয়াও একসাথে পড়লাম। যোহরের আগে তালীমের বৈঠকেই এ দুটো দোয়া শেখানো হলো।

তাবলীগের কর্মসূচি

তাবলীগ জামায়াতের স্থায়ী কর্মসূচি হিসেবে আসরের নামাযের পর ইমাম সাহেব দোয়া করার আগেই আমাদের পক্ষ থেকে একজন এলান করলেন যে, ঢাকা থেকে

তাবলীগ জামায়াতের লোক এসেছে। তারা নামাযের পর এলাকাবাসীদেরকে মাগরিবের নামাযে মসজিদে আসবার দাওয়াত দেবার উদ্দেশ্যে গাশ্‌তে বের হবে। আপনাদেরকে সাথে যাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমরা ২০ জন দু'গ্রুপে দু'দিকে গেলাম। স্থানীয় কেউ আমাদের সাথে গেলো না। নিয়ম মতো গ্রুপের একজন রাস্তায়, দোকানে ও বাড়িতে যাদেরকে পাওয়া যায় তাদেরকে দাওয়াত দেয়। বাকি সবাই যিকর করতে থাকে এবং দোয়া করতে থাকে, যাতে লোকেরা দাওয়াত কবুল করে।

আমাদের দাওয়াতে মাগরিবের নামাযে কেউ আসলো কিনা জানি না। মাগরিবের ফরয নামাযের পর আমাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো, 'ঈমান ও আমল সম্পর্কে নামায বাদ বয়ান হবে। আমরা সবাই বসি। বহুত ফায়দা হবে।'

মাওলানা আব্দুল আযীয আগেই ইমাম সাহেবের অনুমতি নিয়েছিলেন। তিনি বয়ান করলেন, ৬ দফার ব্যাখ্যা পেশ করে তিনি তাবলীগ জামায়াতের পরিচয় তুলে ধরলেন এবং জামায়াত নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জ যাবে বলে জানালেন। এ জামায়াতের সাথে কিছুদিন থাকলে দীন সম্পর্কে অনেক জরুরি কথা জানবার সুযোগ হবে বলে দাওয়াত দিলেন।

তাবলীগ জামায়াত তখন মোটেই পরিচিত ছিলো না। মাওলানার বক্তৃতা শেষ হলে আমরা অল্প কিছু লোকের মধ্যে তাশকীল করার সুযোগ পেলাম। আর সব লোক চলে গেলো। যারা নামাযে উপস্থিত ছিলো তাদের অর্ধেকের কম মাওলানার বয়ান শুনলো। তাশকীলে আমরা সফল হতে পারলাম না। একজনও আমাদের সাথে দু'একদিনের জন্যও যেতে রাজি হলো না।

এশার নামাযের পর তালীম শুরু হলো। সারাদিনে যে কয়টি দোয়া শেখানো হলো তা প্রত্যেককে শুনাতে বললে আমরা শুনালাম। যাদের কিছু ভুল রয়ে গেলো তাদেরকে মশ্‌ক করানো হলো। সবার দোয়া শুদ্ধ হবার পর খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

দোয়াগুলোর অর্থ শেখার আগ্রহ কম লোকের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম। অর্থ শিখবার উপর কোন গুরুত্বও দেওয়া হয়নি। কিন্তু ভালোভাবে না বুঝে আমি তৃপ্তি বোধ করতে না পেরে পৃথকভাবে আমীর থেকে বুঝে নিতাম। বিএ পর্যন্ত আরবী পড়া থাকায় অর্থ বুঝা আমার জন্য সহজ ছিলো।

গাড়িতে ওঠার দোয়াটি সূরা যুখরুফের ১৩ নং আয়াত। 'সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবূন।' অর্থ 'সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র ঐ সত্তা যিনি এ (বাহন)-কে আমাদের আয়ত্তাধীন করেছেন। আমরা একে বশীভূত করতে পারতাম না। আর অবশ্যই আমরা আমাদের রবের দিকে ফিরে যাব।'

অর্থ বুঝে দোয়া না করলে দোয়া কবুল হবে কেমন করে তা আমার বুঝে আসে না। হাদীসে আছে যে, দোয়ায় কথার দিকে মনোযোগী না হলে দোয়া কবুল হয় না। এর মানে তো এটাই যে, আমি আল্লাহর কাছে কী চাইলাম সে বিষয়ে যদি আমি নাই জানি তাহলে চাওয়া হলো কেমন করে? অর্থ না বুঝে মুখে শুধু আরবী বাক্য উচ্চারণ করা দোয়ার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই আল্লাহর কাছে নিজের মাতৃভাষায় চাওয়াই বেশি যুক্তিসঙ্গত। তবে কুরআন ও হাদীসে শেখানো আরবী দোয়া মুখে উচ্চারণ করার সময় এর ভাবটা বুঝলেই চলে। শব্দে শব্দে অর্থ জানা জরুরি নয়। যেমন নিরক্ষর লোকও ৫ টাকা, ১০ টাকা, ১০০ টাকার নোট চিনে নেয়। নোটের গায়ের লেখা পড়তে না পারলেও ক্ষতি নেই। ঠিক তেমনি আরবী দোয়া পড়া অবশ্যই উত্তম। তবে মর্মার্থ জানা জরুরি, কবুল হবার স্বার্থেই।

নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জ নৌকা ভ্রমণ

এক জায়গায় পৌছার পরদিনই অন্য জায়গায় রওয়ানা হওয়াই নিয়ম। আমরা নৌকাযোগে মুন্সীগঞ্জ রওয়ানা দিলাম। ছইওয়ালা বেশ বড় নৌকায় সবাই আরামেই বসলাম। তিন ঘণ্টার সফর। নৌকায় আরোহণের পর দোয়া শেখানো হলো 'বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রাহীম।' অর্থ আল্লাহর নামে (রওয়ানা হলাম) এর গতি ও অবস্থান তাঁরই হাতে। আমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।' এটা কুরআনের সূরা হুদের ৪১ নম্বর আয়াত।

জামায়াতের আমীর মাওলানা আব্দুল আযীয নৌকায় তাবলীগের এজতেমার মতোই আমাদের সামনে 'কুন্‌তুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাসি তা'মুরূনা বিল মারূফি ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকারি, ওয়া তু'মিনূনাবিল্লাহ' আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় চমৎকার একটি বক্তৃতা করলেন। আমি সবটুকু বক্তব্য সাথে সাথেই আত্মস্থ করে ফেললাম। এটি সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াত। এর অর্থ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটনো হয়েছে। তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে (জনগণকে) সৎকাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।'

মাওলানার বক্তৃতার পর আমাদেরকে তাবলীগের ৬ উসূল সম্পর্কে বক্তৃতা করতে বললেন। পয়লাই আমার উপর দায়িত্ব দিলেন। ১৫ মিনিটে বক্তব্য রাখতে বললেন। আমি বক্তব্য রাখলাম। মাওলানা আমার বক্তব্য শুনে খুশি হলেন এবং বক্তব্য আরো উন্নত করার জন্য কতক মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। আরও ৩/৪ জন বক্তৃতা করলেন। তিন ঘণ্টার নৌকা ভ্রমণ মনে হলো অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেলো।

মুন্সীগঞ্জ পৌছার আগে নৌকাতেই আরও একটা নতুন দোয়া শেখানো হলো। কোনো এলাকায় প্রবেশ করার সময় এ দোয়াটি পড়তে হয়। মুন্সীগঞ্জ শহরে ঢুকবার সময়ই এ দোয়াটি পড়তে হবে বলে আমি ভালোভাবে শিখে নিলাম। দোয়াটি হলো–

'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহা' কথাটি তিনবার পড়ার পর 'আল্লাহুম্মারযুকনা জানাহা, ওয়া হাব্বিবনা ইলা আহলিহা, ওয়া হাব্বিব সালেহী আহলিহা ইলাইনা।'

দোয়া মুখস্থ করতে আমার সাথীদের অনেককেই বেশ পরিশ্রম করতে হয় এবং যথেষ্ট সময়ও লাগে। তাই তারা দোয়ার অর্থ জানার জন্য এতটা আগ্রহী নয়, যতটা মুখস্থ করার জন্য ব্যস্ত। না বুঝে দোয়া করা তো আমার নিকট অর্থহীন।

উপরের দোয়াটির অর্থ বুঝার পর কোন এলাকায় প্রবেশকালে ঐ দোয়া পড়তে অত্যন্ত মজা পেতাম। দোয়াটির অর্থ 'হে আল্লাহ! এখানে আমাদের জন্য বরকত দাও (৩ বার)। হে আল্লাহ! এখানকার ফল আমাদের রিযিকে দান কর। এখানকার অধিবাসীরা যেন আমাদেরকে মহব্বত করে সে ব্যবস্থা কর এবং আমরা যেন এ এলাকার নেক লোকদেরকে ভালোবাসতে পারি সে সুযোগ দাও।'

মুন্সীগঞ্জের পর আরও কয়েকটি জায়গা হয়ে দশম দিনে চট্টগ্রাম পৌঁছলাম। নারায়ণগঞ্জের কর্মসূচির যে বিবরণ দিয়েছি সব জায়গায়ই একই ধরনের কর্মসূচি পালন করা হয়। এ কর্মসূচির দু'টো অংশ রয়েছে। একটি হলো জামায়াতের সফররত কর্মীদের তালীম। অপরটি হলো দাওয়াত, গাশ্‌ত ও তাশ্‌কীলের মাধ্যমে নতুন লোকদেরকে জামায়াতে শরীক করে সফরে নেবার চেষ্টা। আমাদের ঐ সফরে দ্বিতীয় কাজটি সন্তোষজনক না হলেও প্রথম কাজটি অত্যন্ত সফল ছিলো। তাবলীগ জামায়াতকে ভ্রাম্যমাণ মাদ্‌রাসা বলা সত্যিই সার্থক। যেটুকু শিক্ষা দেবার কর্মসূচি তাবলীগ জামায়াত গ্রহণ করেছে তা এভাবেই শেখানো হয়।

এ দশ দিনের অর্জন

মাত্র দশ দিনে মাওলানা আব্দুল আযীযের মতো উস্তাদের অবিরাম সোহবতে (সান্নিধ্যে) থেকে তাবলীগী বক্তৃতার সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের সব কয়টি আয়াত ও হাদীস এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দোয়া শিখার সুযোগ পেয়ে খুবই উৎসাহ বোধ করলাম। ভালো শিক্ষক আগ্রহী ছাত্র পেলে যেমন বেশি করে শিক্ষা দিয়ে তৃপ্তি বোধ করেন, মাওলানা সাহেব আমাকে তেমনিভাবেই শেখালেন। তিনি আমাকে সব সময় তাঁর কাছে থাকার নির্দেশ দিলেন। খাওয়া, শোয়া, নামাযসহ সব অবস্থায় আমাকে তিনি পাশেই রাখতেন, যাতে আনুষ্ঠানিক তালীমের বাইরে অনেক কিছু শিখতে পারি। আমিও প্রশ্রয় পেয়ে অনেক বিষয় প্রশ্ন করে জেনে নিতাম। তিনিও পূর্ণ দরদ, মহববত ও স্নেহের পরশ দিয়ে আমাকে ধন্য করতেন। ফলে দশ দিনের মধ্যেই আমার মনে হলো যে, আমি আল্লাহর ফযলে বেশ অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছি। মাওলানা সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসা এতটা অনুভব করলাম, যা আর কারো প্রতি অনুভব করিনি।

একটা ছোট্ট ঘটনা

চট্টগ্রামে ইতঃপূর্বে আমি কখনো যাইনি। ওখানকার ভাষা আগে শুনিনি। আমার সহপাঠী নোয়াখালীর ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া আমাদের

সামনেও কথা বলতো না। তাই ঐ ভাষার সাথে পরিচয় ছিলো। কিন্তু চট্টগ্রামের হলমেট বা সহপাঠী নিজেরা একান্তে আঞ্চলিক ভাষা বললেও অন্যদের সামনে বলতো না। তাই ঐ ভাষা সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিলো না।

একটা গল্প শুনেছিলাম। এক মোগল বাদশাহ্ উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষা শেখার জন্য বিভিন্ন লোককে কয়েক মাসের দায়িত্ব দেন। বাদশাহকে ঐ ভাষায় কথা বলা এবং তা অনুবাদ করে ধারণা দেবার দায়িত্বও ছিলো। অন্যান্য অঞ্চলের দায়িত্বশীলরা দক্ষতার সাথেই এ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যিনি চট্টগ্রামের দায়িত্ব পান তিনি টিনের একটা বড় চোংগার মধ্যে পাথরের কণা ঢুকিয়ে বাদশাহর সামনে জোরে জোরে ঝাঁকি দিতে থাকলো। বাদশাহ্ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। ঐ ব্যক্তি বললো 'ঐ ভাষা শুনতে কেমন লাগে হুজুরকে শুনালাম। ঐ ভাষা বাইরের কারো পক্ষে শেখা সম্ভব নয়।' চট্টগ্রামে আমরা যে মসজিদে যেয়ে উঠলাম তা শহরের বিখ্যাত 'দোভাষ' পরিবারের স্থাপিত। মাগরিবের পর এজতেমা শুরু হলো। আমীরে জামায়াত আমাকেও কিছু সময় বক্তব্য রাখতে বললেন। বক্তব্য শেষে আমি শ্রোতাদের দিকে মুখ করে বসলাম। দোভাষ পরিবারের এক মুরুব্বীর পাশেই বসতে হলো। মাওলানা আব্দুল আযীয দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তাবলীগে সময় দেবার জন্যও উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

এর পর দোভাষ মুরুব্বী বক্তব্য শুরু করলেন। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। শুধু ধারণা করলাম যে, মাওলানা সাহেবের ডাকে সাড়া দেবার জন্যই তিনি বলছেন। তার কথার ভঙ্গি ও সুরে আমার এমন হাসি পেলো যে, মুখ জোরে চেপে রাখাও সম্ভব হচ্ছে না। শ্রোতাদের দিকে মুখ করে বসে থাকায় মহাবিপদে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত উঠে বাইরে নির্জন জায়গায় গিয়ে একা একাই প্রাণভরে হাসলাম। লালদীঘির ময়দানে মাওলানা আবু তাহেরের ইসলামাবাদী ভাষার বক্তৃতা শুনে ঐ কথা মনে আসলেও ঐ রকম হাসি-সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তবে ঐ ভাষা শুনতে মজা লাগার কারণে মুচকি হাসি অবশ্যই আসে। সব শব্দ না বুঝলেও বক্তব্য মোটামুটি এখন বুঝতে পারি।

২৮.

তাবলীগের আমীরের দায়িত্ব

আমার তিন চিল্লার প্রথম চিল্লা যে ২০ জনের জামায়াতে শুরু হয় তা দশম দিনে চট্টগ্রাম পৌঁছে। এদেশের তাবলীগী জামায়াতের আমীর মাওলানা আব্দুল আযীযের পরিচালনায় দশদিনে যা কিছু জানা, শেখা ও মুখস্থ করার সুযোগ পেলাম তাতে আমার উৎসাহ ও প্রেরণা বেড়ে গেলো। মাওলানার সোহ্বতে যত বেশিদিন থাকতে পারবো ততই বেশি শেখার সৌভাগ্য হবে ভেবে আমি যখন অত্যন্ত তৃপ্ত, তখন হঠাৎ

করে মাওলানা সাহেব বললেন, 'আজ থেকে এ জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হবে। আমাকে ঢাকায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় বৈঠকে মাশওয়ারার (পরামর্শ) জন্য যেতে হবে।'

আমার সঙ্গীদের সামনেই তিনি এ কথা বললেন। অন্যদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া কেমন হলো তা লক্ষ্য করার মানসিক অবস্থা আমার ছিলো না। আমি বিস্মিত, হতভম্ব ও পেরেশান হয়ে বাকরুদ্ধ অবস্থায় তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে তিনি কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত স্নেহের সুরে বললেন, 'আপনাকে তৈরি করার উদ্দেশ্যেই আমি এ জামায়াতে শরীক হয়ে সফরে বের হয়েছি। আপনি এ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।' আমি বললাম, 'আমার মোটেই সাহস হচ্ছে না।' তিনি বললেন, 'আজ থেকে এ জামায়াতের আমীর আপনি। আমি আরো ৩দিন আপনার পরিচালনায় এ জামায়াতে থাকবো, যাতে কোনো ভুল হলে শুধরে দেওয়া যায়।' তিনি আমার অন্যান্য সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার পরিচালনায় তারা যথারীতি আনুগত্য করবেন কিনা। তারা সবাই একবাক্যে সম্মতি ঘোষণা করায় আমার হিম্মত একটু বাড়লো।

আমি তবু অসহায়ের মতো আরজ করলাম যে, আপনার কাছ থেকে মাত্র দশদিনে যা শিখলাম শুধু এটুকু সম্বল নিয়ে এতগুলো লোককে আমি কতটুকু শেখাতে পারবো? তিনি বললেন, 'প্রয়োজনীয় সকল দোয়া আপনি মুখস্থ করে ফেলেছেন, ৬ উসূলের উপর বক্তব্য সুন্দরভাবে পেশ করতে পারেন, তালীমী বৈঠকে যা কিছু শেখাতে হয় তাও আপনি আয়ত্ত করেছেন; তাবলীগের কর্মসূচি যা তা চালু করা আপনার জন্য মোটেই কঠিন হবে না।'

আমি কাঁদো কাঁদো সুরে বললাম, 'আপনার কাছ থেকে প্রতিদিনই আমি নতুন নতুন কথা শিখছিলাম। আপনিও আমাকে আদর করে শেখাতেন। আপনি চলে গেলে আমার শেখাও বন্ধ হয়ে যাবে। মাত্র ১০ দিনের সম্বল নিয়ে আমাকে চলতে হবে, এটাই আমার সবচেয়ে বড় পেরেশানী।'

তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর পথে চলতে থাকলে আল্লাহ গাইব থেকে ইলম দান করতে থাকেন। আপনি অন্যদেরকে শেখাতে থাকলে আপনার জ্ঞান স্বাভাবিক নিয়মেই বাড়তে থাকবে।'

আমীরের দায়িত্ব পালন শুরু

আমার উপর আমীরের দায়িত্ব দিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি এখন আমারও আমীর। আমি আপনার মামূর। নিঃসংকোচে আপনি দায়িত্ব পালন করবেন। সংকোচ করলে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা যায় না।'

তাঁর এ পরামর্শ অনুযায়ী আমি জামায়াতকে নিঃসংকোচ পরিচালনা করতে লাগলাম। নিজের উপর পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে দায়িত্ব পালন করা শুরু হলো। তিন দিন তিন

জায়গায় জামায়াতকে নিয়ে গেলাম। নিয়মমাফিক কর্মসূচি পালন করে চললাম। মাওলানা সাহেব দু'দিন দুটো বিষয়ে কানে কানে আমাকে পরামর্শ দিলেন।

যেহেতু তিনদিন পর মাওলানা সাহেবকে আর পাবোনা সেহেতু আমি আরও কতক দোয়া শেখা এবং কয়েকটি প্রশ্নের জওয়াব জানার জন্য তাঁকে অসময়েও বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম। তিনি প্রশ্রয় দেওয়ায় আমি সুযোগ নিলাম।

তিন দিন পর তিনি বিদায় নেবার সময় আমাদের জামায়াতের জন্য দোয়া করার জন্য দরখাস্ত করলাম। তিনি প্রাণভরে দোয়া করলেন। খাস করে আমার জন্যও দোয়া করলেন। নিজেও কাঁদলেন, আমাদেরকেও কাঁদালেন। দীনের মাধ্যমে পারস্পরিক নিঃস্বার্থ মহব্বত এমন এক অদ্ভুত সম্পদ যার কোন তুলনা মিলে না।

তিনি বিদায় নেবার সময় জামায়াতের লোকসংখ্যা ২০ থেকে ২৬-এ পরিণত হলো। তালীমে এত লোককে একসাথে শেখানো অসুবিধা। তাই তালীমের বৈঠক দুটো করার পরামর্শ চাইলাম। মাওলানা সাহেব রাজি হলেন। অপর বৈঠকটি পরিচালনার জন্য কার উপর দায়িত্ব দেওয়া যায় সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলে তিনি আমার মত জানতে চাইলেন। আমি যাকে যোগ্য বলে মত প্রকাশ করলাম তিনিও তাকেই পছন্দ করলেন।

গ্রামাঞ্চলে সফর

ঢাকার নির্দেশ অনুযায়ী শহরের বদলে গ্রাম এলাকায় আমাদের সফর শুরু হলো। ২০ দিনের মধ্যে ঢাকায় ফেরৎ আসার কর্মসূচি পেলাম। নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও চট্টগ্রাম শহরে তিন-চারজনের বেশি লোক জামায়াতে শরীক হয়ে সময় দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বেশ সংখ্যায় ৩ দিনের জন্য সময় দেবার লোক পাওয়া গেলো।

আমরা ঢাকা থেকে যে বিশজন রওয়ানা দিয়েছিলাম তাদের মধ্য থেকে ৭ জনকে জামায়াত পরিচালনার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত করলাম। জামায়াতে নতুন শামিল হওয়া লোক নিয়ে তখন সংখ্যা দাঁড়াল ৫০ জন। এদেরকে ৭টি জামায়াতে ভাগ করে ৭ গ্রামে পাঠালাম। পরদিন সবাই কোন বড় মসজিদে জমায়েত হয়ে কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেখান থেকে পরদিন আবার ৭টি জামায়াতকে ৭ গ্রামে পাঠানো হলো। যারা ৩ দিনের জন্য শরীক হয় তাদের সংখ্যা বাড়ে বটে, কিন্তু ৩ দিন পরে পুরানো যারা তারা চলে যায়।

এ পদ্ধতিতে কর্মসূচি পালন করতে করতে ঢাকায় যখন ফিরে এলাম তখন ১ম চিল্লার ৫ দিন বাকি ছিলো। ৩৫ দিন সফর করা হয়ে গেলো। যখন আমরা ঢাকা পৌঁছলাম তখন আমাদের সংখ্যা ছিলো ৩৫ জন। চিল্লার ২০ জন ছাড়া বাকি ১৫ জন কেউ ৩ দিনের এবং কেউ ৭ দিনের জন্য সময় দিতে এসেছে। আমাদের মধ্যে যারা ১ চিল্লার জন্য বের হয়েছিল তাদের এক জনকে ৩ দিন ওয়ালাদের আমীর বানিয়ে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এ সব ব্যবস্থা কেন্দ্র থেকেই করা হয়। আমি ঢাকা ফিরে আসার পর আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলাম।

আমার ইমারতের ২৫ দিন

১০ দিন মাওলানা আব্দুল আযীযের ইমারতের পর আমার উপর দায়িত্ব আসার ২৫ দিন পর ঢাকা ফিরে এলাম। এ ২৫ দিনের অভিজ্ঞতার সামান্য বিবরণ দিচ্ছি।

জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। যারা ৩, ৫, ৭ দিনের জন্য জামায়াতে শরীক হয়েছেন তারা শুদ্ধ করে কালেমা পড়া ও এর অর্থ বুঝা, নামাযে পড়ার জন্য সূরা ফাতেহা এবং ছোট ছোট ৪টি সূরা শুদ্ধ করে পড়া, নামাযে আরও যা কিছু পড়া হয় তা সঠিকভাবে পড়া এবং খাওয়া, শোয়া ও পেশাব-পায়খানার সাথে সম্পর্কিত দোয়া শেখার সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি হয়েছে। আরও বেশি সময়ের জন্য তাবলীগে বের হওয়া জরুরি বলে তারা অনুভব করেছে। অশিক্ষিত ও সামান্য শিক্ষিতদের জন্য এ কর্মসূচি খুবই উপযোগী বলে আমার ধারণা হলো।

আমি নিজে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি। ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার অভ্যাস করার প্রথম সুযোগ তাবলীগেই পেলাম।

আমার উপর আমীরের দায়িত্ব আসার কয়েকদিন পর আমার সাথীদের নিকট আফসোস করে বললাম যে, মাওলানা সাহেবের বক্তৃতা শুনে যে তৃপ্তি পেতাম তা থেকে আমরা সবাই বঞ্চিত হয়ে গেলাম। সাথীরা বলে উঠলো, 'আমাদের মনে হচ্ছে যে, আপনার মুখে মাওলানা সাহেবের বক্তৃতাই শুনছি। তিনি যে কথা যেভাবে বলতেন, যে যে পয়েন্ট বলতেন এবং যে ভাষায় বলতেন সবই আপনার মুখে শুনতে পেয়ে আমরা খুশি।' আমি বিস্মিত হলাম। কেউ কেউ আরও বললো যে, মাওলানা সাহেব যে ভঙ্গিতে হাত নাড়াতেন সে ভঙ্গিতেই আপনি হাত নাড়েন।

অনুভব করলাম যে, কাউকে ওস্তাদ হিসেবে মহব্বত করলে তার কাছ থেকে শেখার সময় তাকে অজান্তেই নকল করা হয়ে যায়। অতঃপর হাত নাড়ার ব্যাপারে সাবধান হয়ে গেলাম।

তাবলীগের তালীম পদ্ধতি

'জীবনে যা দেখলাম'-এর পাঠক-পাঠিকাগণ তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা পড়ে বিরক্ত হচ্ছেন কিনা জানি না। আমি তাবলীগের কর্মসূচিকে অশিক্ষিত বিপুলসংখ্যক জনগণের জন্য খুবই উযোগী মনে করি। এ কাজটি মাদ্রাসার মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। পীর-মুরীদীর মাধ্যমেও এতো ব্যাপকভাবে এটা করা অসম্ভব।

জামায়াতে ইসলামী ঐ তালীম পদ্ধতিতে জনগণকে কালেমা, নামায, দোয়া ইত্যাদি শেখাবার ব্যবস্থা করতে পারে। এক এক ইউনিয়নেই হাজার হাজার পাবলিক রয়েছে। যে সব ইউনিয়নে জামায়াতের কর্মীসংখ্যা শ'খানিক তারা ইউনিয়নের সকল মসজিদেই এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সাধারণ মুসল্লীদের খেদমত করতে পারেন। যে

এলাকায় জামায়াতের কাজ ব্যাপক সেখানে প্রতি মসজিদে এ পদ্ধতিতে তালীমের মাধ্যমে জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হবে। তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে জনগণ ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবেই জানতে পারে। কালেমার মর্মকথা ও নামাযের হাকীকত বুঝার সুযোগ জামায়াতের মাধ্যমেই জনগণ পেতে পারে।

মসজিদে সপ্তাহে একদিন মাগরিব বা এশার পর ঘণ্টাখানিক তালীমের বৈঠক হলে কিছু কিছু করে দীনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা জনগণ পেতে পারে।

নামাযে যা পড়তে হয় তা শুদ্ধ করে পড়ার সাথে সাথে নামাযের ফরয, ওয়াজিবগুলো শেখবার সুন্দর পদ্ধতিটিও উল্লেখ করছি। সাধারণ লোকদের ১৩টি ফরয, ১৫টি ওয়াজিব, অন্যান্য সুন্নাত-মুস্তাহাব মুখস্থ করা সম্ভব নয়। এর জন্য সহজ পদ্ধতি হলো, একজন কমবয়সী ভালো নামাযীকে নামাযের বাস্তব শিক্ষা দেবার জন্য দাঁড় করাতে হবে। যিনি শিক্ষা দেবেন তিনি তাকে পরিচালনা করবেন। আর সবাই লক্ষ্য করবে ও শিখবে।

যিনি শিক্ষক তিনি এভাবে বলবেন

এই যে নামাযে দাঁড়ানো হলো, দাঁড়াবার আগে নামাযের কী কী ফরয তা শেখা যাক। নামাযের জায়গা পাক, শরীর পাক ও গায়ের কাপড় পাক মিলে ৩ ফরয; সতর ঢাকা, সঠিক ওয়াক্তে পড়া, কিবলার দিক হওয়া ও নিয়ত করা— আর চারটি ফরয। মোট এ ৭টি ফরজ নামায শুরুর আগে। এভাবে নামাযের বাইরের ফরয কয়টি জানা গেলো। এরপর শিক্ষক বলবেন যে, নামাযের ভেতরে ৬টি ফরয আছে। তাকবীরে তাহরীম, কিরাআত পড়া, রুকু, সিজদা, নামাযের শেষ বৈঠক ও ইচ্ছাকৃতভাবে নামায সমাপ্ত করা। এ ফরয কয়টি সবাইকে মুখস্থ করাতে হবে।

অতঃপর শিক্ষক দাঁড়ানো লোকটিকে নামাযে যা পড়তে হয় তা পড়তে বলবেন। কিরাআত পড়া হয়ে গেলে শিক্ষক বলবেন, 'যা এখন পড়া হলো তাতে সূরা ফাতেহা দ্বারা ফরয কিরাআত হয়ে গেলো। ফাতেহার পর যা পড়া হলো তা ওয়াজিব। আর ফাতেহার আগে যা পড়া হয়েছে তা সুন্নাত।'

শিক্ষক এরপর রুকু করতে বলবেন। রুকু অবস্থায় থাকাকালেই শিক্ষক বলবেন 'রুকু করা ফরয, কিছুক্ষণ রুকুতে দেরি করা ওয়াজিব, আর তাসবীহ পড়া সুন্নাত। রুকুতে দেরি না করলে নামায হবে না।

শিক্ষক এরপর রুকু থেকে দাঁড়াতে বলবেন। তখন শিক্ষক বলবেন যে, রুকুর পর কিছুক্ষণ দাঁড়ানো ওয়াজিব। স্থির হয়ে না দাঁড়ায়ে সিজদায় চলে গেলে নামায হবে না।

শিক্ষক এরপর সিজদায় যেতে বলবেন। সিজদায় থাকা অবস্থায় শিক্ষক বলবেন যে, সিজদা করা ফরয, সিজদায় কিছুক্ষণ দেরি করা ওয়াজিব, তাসবীহ পড়া সুন্নাত,

পয়লা সিজদার পর স্থির হয়ে বসা ওয়াজিব। একটু দেরি না করে বসার সাথে সাথেই আবার সিজদায় চলে গেলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সিজদার পর আবার দাঁড়াতে বলবেন এবং প্রথম রাকাআতের মতো ফরয ও ওয়াজিবগুলো আবার চিহ্নিত করবেন। দ্বিতীয় রাকাআতের পর তাশাহুদের জন্য বসা ওয়াজিব এবং তাশাহুদ পড়াও ওয়াজিব।

এটা যদি শেষ বসা হয়, অর্থাৎ দু'রাকাআত নামাযের পর বসা হয় তাহলে শেষ বসাটা ফরয। ৩ ও ৪ রাকাআত নামাযে দু'রাকাআতের পর বসা ওয়াজিব। সালাম শব্দ দ্বারা নামায সমাধা করাও ওয়াজিব।

এভাবে নামায পড়তে থাকা অবস্থায় ফরয ও ওয়াজিবগুলো চিনিয়ে দিলে সহজেই মনে থাকে। ফরয ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত যা নামাযে পড়া হয় তা সবই সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

এ গুরুত্বপূর্ণ কথাটি শেখা জরুরি যে, নামাযে কোনো ফরয ভুলে বাদ পড়ে গেলে আবার নামায পড়তে হবে। কিন্তু কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে সালাম ফিরাবার আগে সহু সিজদা দিলেই চলবে। অন্য কিছু বাদ পড়লেও নামায বাতিল হবে না। তাই ফরয ও ওয়াজিব জানা জরুরি।

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায়, রুকু ও সিজদার অবস্থায় এবং তাশাহুদ পড়ার সময়, বসা অবস্থায় হাত কোথায় কিভাবে রাখতে হবে এবং দৃষ্টি কোন জায়গায় রাখতে হবে এ সবই শেখার বিষয়।

নামাযে প্রতিটি অঙ্গ ধীরে-সুস্থে আদায় করলে 'খুশূ' ও 'খুযূ' (ভক্তি ও বিনয়) পয়দায় সহায়ক হয়। তাড়াহুড়া করে নামায আদায় অর্থহীন। নামায আদায়ের সময় যেখানে যা পড়া হয় তখন মনে কী ভাবতে হবে তা তাবলীগের তালীমে শেখানো হয় না। এটা ছাড়া নামায প্রাণহীন হয়ে পড়ে। আমরা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নামাযে যা করি এবং মুখে যা পড়ি তা দিয়ে নামাযের দেহ পয়দা হয়। আর মনে যা ভাবা উচিত তা ভাবনায় থাকলে নামাযের রূহ পয়দা হয়। এভাবে নামায জীবন্ত হয়। দেহ মৃত হলে যেমন কোন কাজের যোগ্য থাকে না, তেমনি মরা নামায দ্বারাও আসল উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। আমার লেখা 'স্টাডী সার্কেল' নামক বইটিতে 'জীবন্ত নামায' শিরোনামে নামাযের গোটা তালীম সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছি, এখানে তা তুলে দিলাম।

তাবলীগ জামায়াতে শেখা নামাযের এ পদ্ধতির তালীম বেশ কয়েক বছর আগে জেলা আমীর সম্মেলন অথবা কেন্দ্রীয় মাজলিশে শূরা উপলক্ষে সমবেত দায়িত্বশীলগণের সামনে প্রদর্শন করা হয়েছিলো।

২৯.

জীবন্ত নামায

জিবরাঈল (আ) নিজে নামায আদায় করে রাসূল (স)-কে দেখালেন। রাসূল (স) বলেছেন, 'আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখো সেভাবেই তোমরা নামায আদায় করো।'

এ থেকে বুঝা গেলো যে, কারো মুখে শুনে বা কোন লেখা পড়ে নামাযের পূর্ণরূপ বা আকার বুঝা সম্ভব নয়। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং রুকু, সিজদা ও বসা অবস্থায় কিভাবে কোথায় রাখতে হবে তা একজন অভিজ্ঞ ও সঠিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে নামাযরত অবস্থায় দেখলে বাস্তবে যে ধারণা জন্মে তা অন্য কোনোভাবে জানা সম্ভব নয়।

যে কোনো মসজিদে নামাযরত লোকদের রুকু, সিজদা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ফ্রি স্টাইলে যার যেমন খুশি বিভিন্ন ও বিচিত্র আকারে নামায পড়ছে। রাসূল (স) নিশ্চয়ই এত প্রকার রূপে নামায পড়া শেখাননি।

নামাযের প্রয়োজনীয় সব কথা নিম্নে সিন্‌পসিস আকারে পেশ করা হলো ঃ

১. নামায পয়লা বুনিয়াদী ইবাদাত

ক. হাশরে এর হিসাবই পয়লা নেওয়া হবে।

খ. কালেমা তাইয়েবার পয়লা বাস্তব আমলী স্বীকৃতি।

গ. কালেমায় ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবনযাপন করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বাস্তব অনুশীলন ও ট্রেনিং।

ঘ. মুমিনের মি'রাজ (আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সবচেয়ে কার্যকর সোপান)।

ঙ. আল্লাহর সাথে গোপন আলাপ।

চ. আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের বাহ্যিক রূপ ও দেহমন মনিবের চরণতলে ঢেলে দেওয়ার চরম প্রকাশ।

ছ. বান্দাহ হিসেবে ফেরেশতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার প্রমাণ ঃ ফেরেশতাদেরকে পূর্ণ নামায আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়নি। তাদের কেউ সিজদা, কেউ রুকুতে রত।

২. নামাযের দেহ ও রূহ

ক. দেহকে সুন্দর অবস্থায় রাখার যেমন আগ্রহ দেখা যায় তেমনি মুনিবের নিকট সুন্দর নামায পেশ করার জযবা থাকা চাই।

খ. শরীর দিয়ে নামাযে যা পড়া ও করা হয় তাতে নামাযের দেহ গঠিত হয়। যতো শুদ্ধ করে পড়া হয় এবং রুকু সিজদা ইত্যাদি যত সুন্দরভাবে আদায় করা হয় নামাযের দেহ ততই সুন্দর হয়।

গ. প্রাণহীন সুন্দর দেহের কোন মূল নেই।

ঘ. নামায আদায়ের সময় মনের অবস্থার উপর নামাযের রূহ পয়দা হওয়া নির্ভর করে।

– মুখে যখন যা পড়া হচ্ছে এর হাকীকতের দিকে খেয়াল রাখা।

– দেহ যখন যে অবস্থায় আছে তখন মনে যে চেতনা থাকা উচিত তা ধ্যানে রাখা।

– মনকে সচেতনভাবে কাজ দেওয়া– কিছুতেই খালি হতে না দেওয়া।

ঙ. নামাযে খুশু ও খুযু তথা ভক্তিসহকারে বিনয়াবনত হওয়া ও কাতরভাব প্রকাশ করা। খুশু মানে ভক্তি-শ্রদ্ধা, খুযু মানে বিনয়। (Submit Solemnly with Reverence)

চ. নামাযের দেহ যত সুন্দর হবে এবং রূহ যত সজাগ ও সচল থাকবে সে হিসেবেই ১০-৭০০ গুণ সওয়াব পাবে।

ছ. নামাযের দেহ ও রূহ একই সাথে পয়দা হতে হবে। দেহ ছাড়া রূহ থাকবে কোথায়? আর রূহ ছাড়া দেহ বাঁচে না।

দেহ	রূহ
ক. আহসান ওয়াযু।	ওযূ করার সময় খেয়াল ঠিক রাখার জন্য বিভিন্ন দোয়া।
খ. ঠিকভাবে দাঁড়ান।	দুনিয়া থেকে মনকে আলাদা করা।
গ. যা পড়া হয় শুদ্ধ পড়া।	এর মর্মের দিকে খেয়াল রাখা।
ঘ. দেহ চার অবস্থায় থাকে– দাঁড়ান, রুকু, সিজদা ও বসা।	ইহসানের সাথে নামায পড়া। ইহসান অর্থ হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছো (কমপক্ষে এতটুকু হওয়া উচিত যে, তিনি তোমাকে দেখছেন)। (হাদীস) মনিবের সামনে ভক্তির সাথে দাঁড়ান, মনিবের নিকট বিনয়ের সাথে নত হওয়া, মনিবের নিকট গোটা সত্তাকে সমর্পণ, মনিবের সামনে আদবের সাথে বসে ভক্তি প্রকাশ, নবীর প্রতি সালাম ও গুনাহ মাফের দোয়া।

৬. যা পড়া হয়– তাকবীর তাহরীমাহ, তাওয়াজ্জুহ, হামদ, সানা, তাআউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতিহা, কিরাআত, রুকু ও সিজদায় তাসবীহ, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ও দু'সিজদার মাঝে দোয়া, তাশাহুদ, দরূদ, দোয়া মাসূরা ও সালাম।	কালবের দিকে খেয়াল করে পড়া ও সাথে সাথে অর্থ ও মর্ম বুঝে অন্তরে জযবা বোধ করা, সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আল্লাহর জওয়াবের খেয়াল করা। 'সালাতকে ভাগ করেছি আমি এবং আমার বান্দার মধ্যে, অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক বান্দার।' (হাদীস)

৩. নামাযের প্রধান মাসয়ালা-মাসায়েল

ফরয ও ওয়াজিব

ক. ফরয ছুটে গেলে আবার নতুন করে নামায পড়তে হবে,

খ. ওয়াজিব তরক হলে সহু সিজদা দিতে হবে,

গ. ফরয-ওয়াজিব ছাড়া বাকি সবই সুন্নাত-মুস্তাহাব।

৪. নামাযের ১৩ ফরয; বাইরে ৭টি ও ভেতরে ৬টি

ক. **বাইরের ৭ ফরয ঃ** শরীর পাক, কাপড় পাক, স্থান পাক, সতর ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া, নিয়ত করা ও ওয়াক্ত চিনা।

খ. **ভেতরের ৬ ফরয ঃ** তাকবীর তাহরীমা, দাঁড়ান, কিরাআত, রুকু, সিজদা, শেষ বসা, ইচ্ছা করে নামায শেষ করা।

৫. সব নামাযে ১১টি ওয়াজিব

১. সূরা ফাতিহা, ২. সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া, ৩. রুকুতে এক তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করা, ৪. রুকু থেকে স্থির হয়ে দাঁড়ানো, ৫. সিজদায় এক তাসবীহ পরিমাণ দেরি করা, ৬. দু'সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা, ৭. প্রত্যেক বৈঠকে তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া, ৮. সালাম শব্দ দ্বারা নামায সমাপ্ত করা, ৯. ফরয-ওয়াজিবগুলো তারতীব মতো আদায় করা, ১০. ইমাম জোরের স্থলে জোরে এবং আস্তের স্থলে আস্তে কিরাআত পড়া ও ১১. তা'দীলে আরকান অর্থাৎ নামাযের রুকনসমূহ (কিরাআত, রুকু ও সিজদা) নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত মনে ধীরে ধীরে আদায় করা।

৬. অতিরিক্ত আরও ৩টি ওয়াজিব

১. চার বা তিন রাকাআতের নামাযে দু'রাকাআতের পর বসা, ২. বেতের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়া, ৩. দু'ঈদের নামাযে তাকবীর বলা।

৭. নামাযের আদাব যা খুশু ও খুযুর সহায়ক

ক. মানসিক ব্যস্ততা ও পরবর্তী কাজের তাকীদ বর্জন,

খ. নামাযের সময় না কমিয়ে ধীরে-সুস্থে আদায়,

গ. ফরয নামায মসজিদে আদায় বা অন্তত জামাআতে আদায়, তা না হলে

নামায কাযা হতেই থাকবে,

ঘ. নামাযের উন্নয়নের জন্য তাহাজ্জুদ পড়া,

ঙ. মনকে মসজিদে ঝুঁকিয়ে রাখা, 'তার মন মসজিদে ঝুলন্ত থাকে' (হাদীস)

চ. মুখে উচ্চারণকালে কালবের দিকে খেয়াল রাখা যাতে কোন শব্দ অমনোযোগে উচ্চারিত না হয়।

৮. নামায কালেমা তাইয়েবার ওয়াদা মতো চলার বাস্তব ট্রেনিং

ক. আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো চলার নিয়মিত অভ্যাস এবং দেহের প্রতি অঙ্গের ট্রেনিং। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা ছাড়া নামাযে অন্য কিছু পড়া বা করা যায় না, করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

খ. চব্বিশ ঘণ্টার রুটিন নামাযের ভিত্তিতে তৈরি করা।

–ফজরের নামায দিয়ে শুরু এবং এশার নামায দিয়ে শেষ।

–মাঝখানে ৩ বার দুনিয়ার দায়িত্ব থেকে ডেকে এনে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, তুমি আল্লাহর গোলাম।

৯. নামাযে প্রচ্ছন্ন ওয়াদা

ক. নামাযে যেমন কোন কাজই নিজের মরযী মতো করি না তেমনি নামাযের বাইরেও করবো না।

খ. যে মুখে আল্লাহর কালাম পড়ি এ মুখে এমন কথা বলবো না, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন।

গ. রুকুতে যে মাথা রাব্বুল আলামীনের সামনে নত হয়ে মর্যাদার অধিকারী হয়েছে এ মাথাকে আর কারো কাছে নত করে অপমান করবো না।

ঘ. সিজদায় আমার যে রবের নিকট দেহ-মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছি সে মহান ও নিরাপদ আশ্রয় কখনও ত্যাগ করবো না। অন্য কোন আশ্রয়ও তালাশ করবো না।

ঙ. যে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য নামায আদায় করলাম তাঁকে নামাযের বাইরে আরও বেশি করে স্মরণ করবো।

'আমাকে স্মরণ করার জন্যে নামায কায়েম কর।' (সূরা ত্বাহা)

'যখন নামায শেষ হয় যমীনে বের হয়ে পড়। আল্লাহর ফযল তালাশ কর এবং আল্লাহকে আরো বেশি করে স্মরণ কর।' (সূরা জুমআ)

'নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আনকাবুত)

১০. নামাযই দীনী জিন্দেগীর রিপোর্ট

নামাযের প্রভাব বাইরে—বাইরের প্রভাব নামাযে,

বাইরের জীবনেই নামাযের অবস্থা যাচাই হয়।

১১. নামাযের মজা পেতে হলে

'নামায মুমিনের মেরাজ' হিসেবে আন্তরিক গভীর অনুভূতি নিয়ে নামায আদায় করতে হবে।

মনোযোগ ছুটে গেলে আবার সচেতন হতে হবে এবং কালবের দিকে খেয়াল রেখে যা পড়া হবে তা মুখে ও কালবে একসাথে পড়তে হবে।

১২. রাসূল (স)-এর নামায

ক. অন্তরের প্রশান্তি, 'নামাযকে আল্লাহ্ তাআলা আমার জন্য চোখের শান্তি বানিয়েছেন।' (হাদীস)

খ. তিনি পেরেশানীতে নামাযের মাধ্যমে স্বস্তি বোধ করতেন, 'নামায ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য চাও।' (সূরা বাকারা)

গ. রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য আল্লাহ্ একটা করে খাহেশ পয়দা করেছেন, আমার খাহেশ রাতের নামায। আল্লাহ্ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি মর্যাদার লুকমা বানিয়েছেন, ৫ ওয়াক্তের নামায আমার লুকমা।

ঘ. দীর্ঘ সময় দাঁড়াবার দরুন পা বা হাঁটু অবশ হয়ে যেতো।

১৩. সাহাবায়ে কেরামগণের নামায

ক. আবু বকর (রা) খুঁটির মতো নিশ্চল হয়ে নামাযে দাঁড়াতেন।

খ. উমর (রা) বল্লমের আঘাতে বেহুঁশ অবস্থায় নামাযের কথা বলায় হুঁশ হলো।

গ. উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদেরকে লক্ষ্য করে তাঁর বিবি বললেন, এমন লোককে হত্যা করলে, যে রাতের নামাযে কুরআন খতম করতেন।

ঘ. আলী (রা)-এর পায়ে বিদ্ধ তীর সিজদারত অবস্থায় সহজে খোলা গেলো।

ঙ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) চোখের চিকিৎসা ত্যাগ করলেন, কারণ চিকিৎসক সিজদা দিতে নিষেধ করেছিলেন, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।

চ. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঙ্গুল পর্যন্ত কিবলা রুখ করে রাখতেন।

ছ. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) নিশ্চল থামের মত দাঁড়াতেন এবং বলতেন এটাই খুশু।

জ. আবু তালহা আনসারী (রা) বাগানে নামাযের সময় পাখির দিকে খেয়াল করায় রাকাআতের সংখ্যা ভুলে যাওয়ার কাফফারা হিসেবে ঐ বাগানটাই রাসূল (স)-কে দিয়ে দিলেন আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য।

৩০
তাবলীগে আমার দ্বিতীয় চিল্লা দিল্লীতে

প্রথম চিল্লার ৩৫ দিন সফর শেষে ঢাকা ফিরে আসার পর ইঞ্জিনিয়ার মুকীত ভাই খুব খুশি প্রকাশ করে আমাকে জানালেন যে, আমার দ্বিতীয় চিল্লার সময়টা দিল্লীতে কাটাতে হবে। আমি খুব উৎসাহ বোধ করলাম। জানতে পারলাম যে, আমার সাথে আরো একজন ঢাকা থেকে যাবেন চিল্লার উদ্দেশ্যেই এবং কোলকাতা থেকেও একজন আমাদের সঙ্গী হবেন।

১৯৫০ সালের এপ্রিলের কথা। তখনো ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে অবাধেই যাতায়াত হচ্ছিল। পাসপোর্ট-ভিসার ঝামেলা তখনো শুরু হয়নি। প্রয়োজনীয় যাবতীয় পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে মাওলানা আবদুল আযীয সফরের সাফল্যের জন্য দোয়া করে আমাদেরকে বিদায় জানালেন। রেলপথেই কোলকাতা পৌছে তাবলীগের কেন্দ্রীয় মসজিদে হাজির হলাম। আমাদের সম্পর্কে তারা আগেই অবহিত ছিলেন। উর্দুভাষী একজন কোলকাতা থেকে চিল্লার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথী হলেন ঐ উর্দুভাষী ভাইয়ের উপর এ তিন জনের আমীরের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

দিল্লীগামী ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠলাম। কোলকাতার আমীর শিয়ালদহ রেল স্টেশনে দোয়া করে আমাদেরকে বিদায় দিলেন। আমাদের আমীর গাড়িতে উঠবার সময়কার দোয়া আওয়াজ করে উচ্চারণ করে আমাদেরকে দোয়া পড়ার কথা স্মরণ করালেন। দিল্লী পৌছতে ২৪ ঘন্টা লেগে গেলো। বড় বড় স্টেশন ছাড়া কোথাও ট্রেন না থামা সত্ত্বেও একটা দিন পুরোই লেগে গেলো। আমাদের আমীরের পরিচালনায় এ সময়টা এমনভাবে কেটে গেলো যে, সফরের স্বাভাবিক বিরক্তিভাব সৃষ্টিই হতে পারেনি।

উর্দু শেখার সূচনা

চৌমুহনীর জনাব নূরুল হক আমার সফর সাথী ছিলেন। আমীরের নাম মনে করতে পারছি না। আমাদের আমীর উর্দু ভাষী হওয়ায় উর্দু শোনা ও বুঝার সুযোগ পেয়ে ভালোই লাগলো। উর্দু ভাষায় এক প্রকার মিষ্টতা আছে, যার কারণে শ্রুতিমধুর মনে হয়। আমার বাল্যকালের বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছি যে, আমার মুখে কথা ফোটার বয়সে আম্মা মাস দেড়েকের জন্য ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলো। সমবয়সী মামাত ভাইয়ের সাথে খেলাধুলা করতে করতে কিছু উর্দু বলা শিখলাম। বাড়িতে গিয়ে নাকি দাদীর সাথে উর্দুতে কথা বলা শুরু করেছিলাম। এ সব দাদী ও আম্মার মুখে শোনা কথা। প্রতিবছর ঢাকাস্থ নানার বাড়িতে বেড়াতে আসলে উর্দু কথা শুনতে পেতাম। অবশ্য সে উর্দু ঢাকার কথ্য ভাষা, শুদ্ধ উর্দু ভাষা নয় বলে পরে বুঝতে পেরেছি।

আমাদের আমীর উর্দু ভাষী হলেও কোলকাতার অধিবাসী হওয়ায় বাংলা মোটামুটি বুঝেন ও কিছু কিছু বলতেও পারেন বলে আমাদের জন্য শিখতে সহজ হলো। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের সময় উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকায় উর্দু শিখব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সে ক্ষোভ আর রইলো না। উর্দু শেখা শুরু হয়ে গেলো। ট্রেনে আমরা সব ওয়াক্ত জামায়াতে নামায পড়েছি। হিন্দু ও শিখ যাত্রীরা আমাদেরকে জামায়াতে নামাযের জন্য হাসিমুখে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

আমাদের তালীমী বৈঠকে যা কিছু হয়েছে তা দেখে ও শুনে যাত্রীরা উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করতো বুঝা গেলো। তারা আমাদেরকে ধার্মিক হিসেবে সম্মানের চোখে দেখেছে এবং আমাদের সাথে সুন্দর আচরণ করেছে। এ রেল সফরে আরো কিছু নতুন দোয়া শেখা হয়ে গেলো।

আমীর সাহেব হেকায়াতে সাহাবা নামে মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের লিখিত বই থেকে সাহাবায়ে কেরামের কাহিনী পড়ে শোনাতেন। তিনি যখন পড়তেন আমি পাশে বসে বইটির পাতায় ভালো করে দেখতে থাকতাম। তালীমী বৈঠক শেষ হলে এ বইটি নিয়ে যে অংশটি তিনি পড়ে শুনিয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বুঝিয়ে দিয়েছেন সে অংশটি পড়ার চেষ্টা করতাম। বিষয়টা জানা থাকায় এবং তার পড়ার সময় আমি লেখার দিকে মনোযোগ দেওয়ায় পড়তে সক্ষম হচ্ছি বলে সাহস পেলাম। যে শব্দটা পড়তে পারিনি তা আমীর সাহেব থেকে শিখে নিতাম। বইটি খুবই সহজ ভাষায় লেখা। উর্দুতে প্রচুর আরবী শব্দ থাকায় আরো সুবিধা হলো। বিএ পর্যন্ত আরবী পাঠ্যসূচিতে থাকায় যা শিখেছিলাম তা কাজে লাগছে দেখে আরো উৎসাহ বোধ করলাম।

ছাত্র জীবনে আরবী পাঠ্যবই যা পড়েছি তাতে জের-জবর দেওয়া ছিলো। উর্দুতে আরবী হরফ অথচ জের-জবর-পেশ ইত্যাদি ছাড়া কেমন করে পড়া যায়, এমন একটা ভীতি আমার ছিলো। হিকায়াতে সাহাবা বইটি আমীরের সাহায্যে ২৪ ঘণ্টার সফরে ২/৩ বার পড়ার চেষ্টা করেই বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলাম। আমার আগ্রহ দেখে আমীর সাহেব বইটি আমাকে দান করে দিলেন।

বিশ্ব তাবলীগ জামায়াতের কেন্দ্রে পৌঁছলাম

পুরানা দিল্লীর বস্তি নিজামুদ্দীন নামক মহল্লার এক ছোট মসজিদই জামায়াতের কেন্দ্র। মসজিদটি ঢাকাস্থ কাকরাইলের পুরানা মসজিদ থেকে একটু বড় হলেও প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে মিল রয়েছে। লালবাগের খান মুহাম্মদ মসজিদ ও কাকরাইল পুরানা মসজিদে যেমন দোতলায় মসজিদ ও নিচতলায় থাকার উপযোগী কতক কামরা, এ মসজিদটিও ঠিক তেমনি।

তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (র) এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই কাজের সূচনা করেন। তাই তাবলীগ জামায়াত সম্প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও বরকতের জন্য এ মসজিদই বিশ্ব জামায়াতের কেন্দ্র। মসজিদের দোতলায়ই একপাশে পৃথক কামরায় মরহুম হাফেজ মাওলানা ইলিয়াসের ছেলে মাওলানা ইউসুফের বাসস্থান। তিনিই তখন কেন্দ্রীয় আমীর। সবাই তাকে হযরতজী উপাধিতে ডাকেন। মসজিদটিতে সব সময় লোক সমাগম হয়। জামায়াতবদ্ধ হয়ে লোক আসে। আবার চিল্লায় বের হয়ে যায়। আমি ও আমার ২ সাথী ৩ দিন ঐ মসজিদে ছিলাম। নামায, ঘুম ও খাওয়ার সময় ছাড়া বাকি সব সময় সেখানে ৩ ধরনের কাজ চলে। প্রত্যেক নামাযের জামায়াতের পর দায়িত্বশীল মুবাল্লিগদের বক্তৃতা হয়। ২/৩ জন ১৫/২০ মিনিট করে উর্দুতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মূল বিষয় ৬ উসূল হলেও ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণীয় ভূমিকা হওয়ায় শুনতে বেশ ভালোই লাগলো। বক্তৃতার টারগেট হলো শ্রোতাদেরকে চিল্লা দিতে উদ্বুদ্ধ করা।

দ্বিতীয় ধরনের কাজ হলো তালীমের বৈঠক। বিভিন্ন আমীরের পরিচালনায় আগত জামায়াত পৃথক পৃথকভাবে মসজিদের ভেতরে বারান্দায় ও চত্বরে বৈঠক হয়।

তৃতীয় ধরনের কাজ হলো, দিনে একবার ও রাতে একবার হযরতজী মাওলানা ইউসুফ হেদায়াতী বক্তব্য রাখেন। এ বক্তব্য আমার নিকট সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিলো। যদিও সব শব্দের অর্থ বুঝে আসতো না, তবুও বক্তব্যের মর্মকথা বুঝতে পারায় কোন অস্বস্তি বোধ করিনি। কোলকাতার ভাই থেকে অজানা শব্দের অর্থ জেনে নিতাম।

নতুন কোন ভাষা শেখার মজাই আলাদা। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকায় উর্দু বক্তৃতার সব শব্দ না বুঝলেও ভাব বুঝতে তেমন কষ্ট লাগতো না। ঢাকা থেকে আমরা দু'জন বাংলাভাষী সেখানে ছিলাম। আর সবাই উর্দু ভাষী। বাধ্য হয়ে উর্দু বলা শুরু করতে হলো। বেশ সংকোচবোধ করতাম। ভুল হলে কে কি মনে করবে, সে আশঙ্কায় কথা কমই বলতাম।

হযরতজীর বক্তব্য

ঢাকা থেকে যাবার পর ৩ দিন একটানা ৫/৬ বার তাঁর বক্তব্য শুনেছি। চিল্লার শেষদিকে ঢাকা রওয়ানা হবার পূর্বে ৩ দিন ঐ মসজিদেই তাঁর বক্তব্য শুনেছি। এদ্দিনে উর্দু বক্তৃতা বুঝতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁর বক্তৃতায় আরও আকৃষ্ট হয়েছি। তিনি ৩ টি কথার উপরই বেশি গুরুত্ব দিতেন–

১. মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন নবী-রাসূলগণ। আল্লাহ তাঁদেরকে পাঠালেন মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে ডাকতে। কুরআনের ঐ আয়াত আবৃত্তি করলেন যার অর্থ, 'যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি একজন আত্মসমর্পনকারী, তার কথার চেয়ে সুন্দর আর কার কথা হতে পারে?' আসমানের

নিচে এবং জমিনের উপর আল্লাহর দিকে ডাকার চাইতে মহান কোন কাজ নেই। আল্লাহকে যে চেনে না তাকে আল্লার সাথে সম্পর্কিত করাতে পারলে আল্লাহ যে কত খুশি হন তা মরুভূমিতে হারানো উট ফিরে পেয়ে এক ব্যক্তির খুশির সাথে রাসূল (স) তুলনা করে বুঝিয়েছেন।

তিনি বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের চেয়ে বড় সাফল্য আর কি আছে? আমাদের কোনো আমলই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক উপযোগী নয়। যত ভালোভাবেই আমল করা হোক তাতে ত্রুটি থাকবেই। কিন্তু আমার ডাকে যদি আল্লাহ্‌র কোন পথহারা বান্দাহ আল্লাহর পথে আসে তাহলে এটা বিশুদ্ধ ও ত্রুটিহীন আমল ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম।

এ সব কথা বলে হযরতজী তাবলীগে দীনের কাজে আত্মনিয়োগ করা ও বেশি বেশি সময় দেবার তাগিদ দিতেন। খুবই আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তিনি এ আহবান জানাতেন।

২. দায়ী ইলাল্লাহর সংখ্যা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি একটা সহজ উদাহরণ দিলেন। গরমের দিনে রেল স্টেশনে গাড়ি থামলে বিনা পয়সায় ঠাণ্ডা পানি যাত্রীদেরকে দিলে সবাই খুশি হয়। আপনি একা কয়জনকে পানি খাওয়াতে পারবেন? বেশি মানুষকে পানি খাওয়াবার সওয়াব যদি পেতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? আপনি যদি কিছু লোককে উদ্বুদ্ধ করে পানি খাওয়াবার কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে তারা যত লোককে পানি খাওয়াবে এর সওয়াব আপনিও পাবেন। আরও অগ্রসর হয়ে বললেন, মানুষকে পানি পান করাবার মতো যদি একদল লোক তৈরি করতে পারেন তাহলে তাদের চেষ্টায় যতলোক পানি খাওয়াবার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে তাদের সওয়াবও আপনার আমলনামায় আসবে। আপনি একা অল্প কিছু লোককেই পানি খাওয়াতে পারেন। পানি খাওয়াবার জন্য উদ্বুদ্ধকারী লোকের সংখ্যা যদি বাড়ে তাহলে হাজার হাজার লোক আপনার চেষ্টার ফলে পানি খেয়ে দোয়া করবে।

এ উদাহরণ দিয়ে তিনি দাওয়াতে দীনের কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যত বেশি লোক চিল্লা দেবে ততই আল্লাহ্‌র দিকে ডাকার লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকবে।

৩. তৃতীয় কথাটি বড়ই আবেগময়। তিনি বলেন, রাসূল (স) দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পাওয়ার পর দুনিয়ার কোন কাজে আর সময় দিতে ফুরসত পাননি। তিনি সফল ব্যবসায়ী হিসেবে খাদীজার ব্যবসা পরিচালনা করতেন। বিয়ের পর তিনি সচ্ছল ছিলেন। দাওয়াতে দীনে পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগের ফলে ব্যবসায় আর সময় দিতে পারেননি। ব্যবসার পুঁজিও কমতে কমতে শেষ হয়ে গেলো। আজীবন অভাব-অনটনেই কাটালেন।

জীবনটা তিনি এমন এক কাজে উৎসর্গ করলেন যার চেয়ে মহৎ, যার চেয়ে মহান, যার চেয়ে কল্যাণকর, যার চেয়ে উন্নতমানের কোন কাজ কল্পনাও করা যায় না।

আল্লাহর দীন নবী-রাসূলের চেয়েও বড়। তাই নবীদের মতো আল্লাহ্র সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিগণকেও তাঁর দীনের স্বার্থে আজীবন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আমরা যদি আল্লাহ্র নিকট প্রিয় হতে চাই তাহলে ঐ দীনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করা কর্তব্য। হযরতজীর ভাষায় 'দীনকে লিয়ে জিন্দেগী খাপা দোও। ইয়েহি জিন্দেগী বানানেকা সহী তরীকা হায়।' অর্থাৎ 'দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দাও। জীবন গড়ার এটাই সঠিক পদ্ধতি।'

৩১.

তাবলীগী চিল্লায় দিল্লী থেকে বিজনোর

ঢাকা থেকে আমরা দু'জনসহ মোট ১০ জনের একটি জামায়াত মাওলানা যিয়াউদ্দিন আলীগড়ীর নেতৃত্বে দিল্লী থেকে সফরে রওয়ানা হলাম। যুক্ত প্রদেশের বিজনোর জেলায় তাবলীগী সফর শুরু হলো। জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১৫ দিন সফর শেষে জেলা শহরে পৌঁছলাম। এ ১৫ দিনে ১০/১১ টি স্থানে গিয়েছি। পূর্বের আলোচনায় তাবলীগের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

এ সফরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মাওলানা যিয়াউদ্দিন আলীগড়ীর ব্যক্তিত্ব। আমার বড় সৌভাগ্য যে, তাঁর মতো ব্যক্তির সান্নিধ্য পেলাম। শ্যামলা রংয়ের খাট আকারের লোকটির মধ্যে এতো গুণের সমাহার দেখে আমি মুগ্ধ-বিস্ময় বোধ করেছি। তাঁর কাছ থেকে শেখার মতো অনেক কিছু পেয়েছি।

১. তিনি খুবই সহজ ভাষায় বক্তব্য পেশ করতেন। সাধারণ শ্রোতারাও তাঁর বক্তৃতা বুঝে তৃপ্তিবোধ করতো।

২. তাবলীগের ৬টি উসূল বর্ণনার পূর্বে এক এক সময় এক এক ধরনের এমন চমৎকার ভূমিকা পেশ করতেন যে, শেষ পর্যন্ত না শুনে কাউকে উঠে যেতে দেখিনি।

৩. তাঁর ভাষায়, কণ্ঠে ও চেহারায় শ্রোতাদের প্রতি গভীর ভালোবাসার আমেজ অনুভব করা যেতো।

৪. তাবলীগে সময় দেবার জন্য তাঁর আবেদনে শ্রোতাদেরকে যেমন সাড়া দিতে দেখেছি এমনটা ইতঃপূর্বে দেখিনি।

৫. তিনি কুরআন-হাদীস থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিতেন, যা তাবলীগী বক্তাদের মধ্যে কমই লক্ষ্য করা যায়।

তিনি আমাদের আমীর ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের কাউকে তাঁর খেদমত করার সুযোগ দিতেন না। সফরে চলা অবস্থায় এবং খাওয়া ও শোয়ার সময় তিনি আমাদের খেদমতেই ব্যস্ত হয়ে যেতেন। আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা এর খোঁজ-খবর নিতে থাকতেন। তালীমের বৈঠকে আমাদের মধ্যে যারা একটু দুর্বল তাদের দিকে

তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতেন। তিনি এমন একজন আমীর ছিলেন যে, কোনো বিষয়ে আমাদেরকে হুকুম দেবার প্রয়োজন হতো না। যখন যা করা দরকার বিনা নির্দেশেই তা করার জন্য আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। এমন সার্থক আমীর ইতঃপূর্বে আমি দেখিনি। পরবর্তীতে আমি যখন আমীরের দায়িত্ব পালন করেছি তখন তাঁকে অনুকরণের চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু সমপরিমাণ সফল হতে পেরেছি বলে মনে হয়নি।

বিজনোর জেলা শহরে ৫ দিন

জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১৫ দিন সফর শেষে জেলা শহরের বড় মসজিদকে কেন্দ্র করে ৫ দিন তাবলীগী কার্যক্রম চলে। এক একদিন শহরের বিভিন্ন মসজিদে আসরের নামাযের পর হাজির হয়ে মাগরিব পর্যন্ত গাশ্‌ত, মাগরিবের পর নতুন যোগদানকারীদেরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় মসজিদে এসে খাওয়া ও রাত যাপন করতে হতো।

কেন্দ্রীয় মসজিদটি বেশ বড়। এক সাথে ৫০ জনেরও বেশি লোকের ওযূ করার মতো বিরাট চৌবাচ্চার প্রতি আমার সবচেয়ে আকর্ষণ ছিলো। সময়টা মে মাসের মাঝামাঝি হওয়া সত্ত্বেও প্রচণ্ড গরম ছিলো। চৌবাচ্চার পানি চমৎকার ঠাণ্ডা। গরমে যখনি অস্থিরতা বোধ করেছি তখনি চৌবাচ্চায় এসে ওযূ করে রোমাল ভিজিয়ে গা মুছে ঠাণ্ডা উপভোগ করার চেষ্টা করেছি।

আমি ছোটবেলা থেকেই গরম-কাতর। শীতকালই আমার বেশি প্রিয়। ইতোমধ্যে রমযান মাস শুরু হয়ে গেলো। একটা প্রবচন আছে যে, 'একে তো ভেজা বিড়াল, আরো পড়লো গিয়ে ফেনের পাতিলে।' আমার তখন এমনই দশা।

উর্দু কথোপকথন তখন চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ভাষায় লিঙ্গ সমস্যা বিরাট। বস্তুর বেলায়ও লিঙ্গ ভেদ রয়েছে। আমীর সাহেব একটা নিয়ম বলে দিলেন। পুংলিঙ্গের বেলায় স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার দূষণীয়, তাই যেখানে সন্দেহ হয় পুংলিঙ্গ ব্যবহার করলে কেউ দোষ ধরবে না, মনে করবে লোকটি ভালো উর্দু জানে না। এ উপদেশ পেয়ে নির্ভয়ে উর্দু বলা সহজ হলো।

ইফতারের সময় প্রচণ্ড গরমের কারণে খাবারের চেয়ে ঠাণ্ডা পানির প্রতিই তীব্র আকর্ষণ স্বাভাবিক। ১৫/২০ জন এক সাথে ইফতারে বসেছি। ঠাণ্ডা পানি আমার কাছে তখনো পৌঁছেনি, আমি অস্থির হয়ে বললাম, 'খানেকা পানি দিজিয়ে।' পাশের একজন উঠে গিয়ে পানি নিয়ে এসে বললেন, 'ভাই লিজিয়ে খানেকা পানি, ইয়ে হ্যায় পিনেকি রুটি।' শরম পেলাম ভুলের জন্য। ওরা পানি খায় না, পান করে। আমরা সবাই চা, শরবত, দুধ খাওয়ায় অভ্যস্ত। আমাদের দেশের হিন্দুরা জলপান করে। কিন্তু মুসলমানরা পানি খায়। অবশ্য হিন্দুরা নাস্তাকে জলখাবার বলে; কিন্তু জল তারা খায় না। অবশ্য আজকাল তাদেরও অনেকে পানি খায়।

মজার ব্যাপার হলো, জল ও পানি দু'টোই হিন্দি শব্দ। অথচ পানিকে মুসলমানী শব্দ মনে করা হয়। বাংলাভাষী হিন্দুরাই শুধু জল বলে। হিন্দিভাষীরা পানিই বলে, জল বলে না। ঐ একবারই পানি খাবার কথা বলে লজ্জাবোধ করলাম। আমীর সাহেবের কাছ থেকে জানলাম যে, ফারসি ভাষায়ও পানি খাওয়া বলা হয়। তখন আত্মপ্রত্যয় বোধ করলাম। দিল্লীতে ফিরে আসার পর 'খানেকা পানি হ্যায়' জিজ্ঞেস করতেই এক ভাই হেসে বললেন, 'জরুর হ্যায়, পিনেকা রুটি ভী হ্যায়।' এবার লজ্জা না পেয়ে জওয়াব দিলাম, 'আপ পানি পীতে রাহো, হাম পানি খাতেই রাহেংগে।' আশে পাশের সকলেই এ হালকা কৌতুক উপভোগ করলেন।

বিজনোরের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা

বিজনোরে আমার চিল্লার সাথী চৌমুহনীর নূরুল হক ভাই অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিন দিন তিনি তাবলীগের প্রোগ্রামে যেতে পারেননি। তাকে একা ফেলে সবারই চলে যাওয়া ঠিক নয় বলে তার খেদমতের জন্য আমীর সাহেব আমাকেই রেখে যান। দীনী ভাইয়ের জজবা নিয়ে আমি যথাসাধ্য রোগীর সেবা-যত্ন করতে লাগলাম। আন্তরিকতার সম্পদ থাকলে মানুষ অসাধ্যও সাধন করতে পারে। তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করতেও আমার সামান্য সংকোচ বোধ হয়নি। দীনের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে আর কোনো সম্পর্কের তুলনাই হয় না।

একটা কবিতার কথা মনে পড়ে। কবির নাম মনে নেই। কবি তার সফরের বিবরণ দিতে গিয়ে যা লিখেছিলেন এর সারকথা নিম্নরূপ–

'এক সফরে গিয়ে দারুণ অর্থ সংকটে পড়লাম। এক সফর সাথী আমাকে ধার দিলেন। বাড়িতে ফিরে এসে তার ধার শোধ করে দিলাম। তার অনুগ্রহের প্রতিদান স্বরূপ পর্যাপ্ত উপঢৌকন দিয়ে ভাবলাম যে, আমি তার নিকট বাধিত রইলাম না।'

'অপর এক সফরে আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এক সফর সাথী সযত্নে আমার সেবা শুশ্রূষা করে এমন এক মহাঋণে আবদ্ধ করলো যে, আমি সারা জীবন তার অনুগৃহীত হয়েই রইলাম। এর কোনো প্রতিদান দেবার পথই বের করতে পারলাম না।' আমি এ কবির কথাটি মনে করে খুব তৃপ্তি বোধ করলাম যে, তেমনি একটি খেদমত করার সুযোগ আল্লাহ্ পাক আমাকে দিলেন।

দিল্লী থেকে ঢাকা

বস্তি নিযামুদ্দিন মসজিদে চিল্লার শেষ তিন দিন কাটিয়ে ঢাকা রওয়ানা হলাম। হযরতজী মাওলানা ইউসুফের আকর্ষণীয় ও অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য দিল্লীতে প্রথম এসে যে পরিমাণ বুঝতে পেরেছি, ঢাকা ফিরে আসার পূর্বের তিন দিনে এর বেশি তৃপ্তিবোধ নিয়ে উপলব্ধি করেছি। কারণ ইতোমধ্যে উর্দু আগের চেয়ে সহজে বুঝি।

হযরতজীর সাথে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পাওয়া সম্ভব ছিলো না। তবে মাওলানা যিয়াউদ্দীন আলীগড়ী আমার সম্পর্কে তাঁকে কিছু ধারণা দেবার কারণে বিদায়ের সময় অত্যন্ত স্নেহের ভাষায় বিদায় জানালেন এবং দোয়া করলেন।

ঢাকা থেকে আমরা যে দু'জন গিয়েছিলাম সে দু'জনের সাথে ওখানকার ১ জনকে আমীরের দায়িত্ব দিয়ে ঢাকায় পাঠানো হলো। কোলকাতা থেকে বাংলাভাষী আরো দু'জন আমাদের সাথে শামিল হলেন। এভাবে আমরা পাঁচজন কাকরাইল মসজিদে এসে পৌছলাম। আমাদের উর্দুভাষী আমীর দীর্ঘ রেলপথ ভ্রমণকালে সুন্দরভাবেই দায়িত্ব পালন করলেন।

দিল্লী থেকে বিদায়কালে মাওলানা যিয়াউদ্দীন আলীগড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময় তাঁকে জড়িয়ে ধরতেই আমার এমন কান্না পেলো যে, কয়েক মিনিট পর্যন্ত কিছুতেই কান্না থামাতে পারছিলাম না। তিনিও চোখের পানি ফেলতে ফেলতে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং প্রাণস্পর্শী ভাষায় আমার জন্য দোয়া করলেন। দীনী ওস্তাদ হিসেবে তিনি আমার হৃদয়ে স্থায়ী আসন দখল করে আছেন।

১৯৫৪ সালে আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের খবর পেয়ে তিনি দুঃখিত হলেও মন্দ কোনো মন্তব্য করেননি বলে ১৯৫৫ সালে কাকরাইল মসজিদে তাঁর সাথে দেখা হলে জানতে পারলাম।

৩২.

আমার তৃতীয় চিল্লা

দিল্লী থেকে ফিরে আসার পর ইঞ্জিনিয়ার মুকীত ভাই বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন। আমার দিল্লী ও বীজনোরে দেওয়া চিল্লার রিপোর্ট তিনি পেয়েছেন বলে জানালেন। আমার তিন চিল্লার শেষ চিল্লাটি কোথায় কিভাবে কাজে লাগাতে হবে সে বিষয়ে তিনি সফরসূচি তৈরি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করলেন। দু'দিন কেন্দ্রে থেকে অভিজ্ঞ পুরানো মুবাল্লিগ ভাইদের সাথে কাটাবার পর পরবর্তী সফর শুরু হবে, জানতে পারলাম।

অভিজ্ঞ মুবাল্লিগদের দু'জনের সাথে বৈঠক হলো। তাদের একজন পুরানা পরিচিত জনাব আবদুল হক ভাই, যিনি হাইকোর্টের কর্মচারী ছিলেন। অপরজন ইঞ্জিনিয়ার যার নাম মনে নেই। বৈঠকে জানতে পারলাম যে, ১৫ জনের এক জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হচ্ছে। সবগুলো জেলা শহরেই যেতে হবে। পথে যে কয়টি মহকুমা শহরে সম্ভব যেতে চেষ্টা করতে হবে।

খুলনা ও চট্টগ্রামে তাবলীগের সংগঠন আছে। তাই এ দু'জেলা শহরে যাবার প্রয়োজন নেই। যে সব জেলা শহরে এখনও তাবলীগের দাওয়াত পৌছেনি সে সব শহরে ২/৩ দিন করে থেকে সংগঠনের ভিত্তি রচনা করার দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হলো।

আমার প্রথম চিল্লা পূর্ববঙ্গে কাটালাম। তাই আমি উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আগে যাওয়ার প্রস্তাব করলাম। বৈঠকের সবাই সম্মত হয়ে মুকীত ভাইকে জানালে তিনিও রাজি হলেন। ১ চিল্লা বা ৩ চিল্লা দেবার জন্য যারা প্রস্তুত এমন ১৫ জন লোক নিয়ে আমরা রওয়ানা দিলাম। মুকীত ভাই রওয়ানা হবার সময় মূল্যবান উপদেশ দিলেন এবং আবেগপূর্ণ দোয়া করে বিদায় করলেন।

দিনাজপুর থেকে চিল্লা শুরু

ঢাকা থেকে রেলপথে সরাসরি দিনাজপুর রওয়ানা হলাম। নামাযের সময় হলে, জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি বক্তৃতা করলাম। তাবলীগী সাথীদেরকে সম্বোধন করে বলা হলেও বগীর অন্যান্য যাত্রীদেরকে শুনাবার উদ্দেশ্যে উচ্চ কণ্ঠেই বললাম। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় লোকের ভিড় থাকেই। আমাদের একজনকে আযান দিতে বললাম। দেখা গেলো কতক যাত্রী ওযূ করলেন। যারা নামাযে শরীক হলো না তারা বসার জায়গা থেকে উঠে এক পাশে সরে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগ করে দিলেন।

নামাযের পর সবাই যার যার জায়গায় বসার পর সবাইকে সম্বোধন করে তাবলীগের ৬ উসুলের প্রথম দু'টো– কালেমা ও নামায সম্পর্কে বক্তৃতা শুনালাম। তাবলীগ জামায়াতের পরিচিতিও তুলে ধরলাম। আমরা কেন বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছি, কি কাজ করি, কোথায় যাচ্ছি ইত্যাদি শুনে দিনাজপুরগামী কিছু লোক দিনাজপুর শহরে কোন মসজিদে থাকবো জানতে চাইলো। ৪/৫ জন যাত্রী পরদিন ঐ মসজিদে ২ দিন থাকার উদ্দেশ্যে আসলো।

তাবলীগ জামায়াতের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত না হলেও আমার সাথীদেরকে নিয়ে সারাপথে এমন একটা কাজ করলাম যা সবাইকে মুগ্ধ করেছে এবং সকল যাত্রীই আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছে। কাজটি হলো স্টেশনে গাড়ি থামলে যাত্রীদের মাল-সামান নিয়ে নেমে যেতে সাহায্য করা ও নবাগত যাত্রীদেরকে গাড়িতে উঠতে সহযোগিতা করা এবং মহিলা, বৃদ্ধ ও রোগী যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া। আসন খালি না থাকলে আমাদের লোককে উঠিয়ে বসার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। জামায়াতের সাথীদেরকে আমি বললাম যে, বয়স্ক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে আপনারা উঠে তাকে বসতে দেবেন। ইসলাম বড়দেরকে সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছে।

এখনো ঐ সুন্দর দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যে, কোন বয়স্ক লোক গাড়িতে উঠলে অল্প বয়সের সাধারণ যাত্রীরাও উঠে আসন ছেড়ে দিচ্ছে। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মানবিক মূল্যবোধ জনসাধারণের মধ্যে বিরাজ করছে। এ অনুভূতিকে জাগ্রত করার প্রচেষ্টারই অভাব। মনুষ্যত্ববোধ চিরন্তন। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের যারা একসাথে কয়েকজন রেলে সফর করেন তারা সহযোগীদের মধ্যে এ মানবতাবোধ জাগ্রত করার সুযোগ নিতে পারেন।

প্রসঙ্গত মনে পড়লো। ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগের ৬ দফার সাথে আরও ৫ দফা যোগ করে মাওলানা ভাসানী বামপন্থীদের নেতা হিসেবে ময়দানে আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেললেন। অথচ ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব যখন ৬ দফা পেশ করেন তখন মাওলানা ভাসানী খুলনার জনসভায় ৬ দফা 'ডিসমিস' ঘোষণা করলেন।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রাশিয়ার মাধ্যমে তাসখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সাথে পাকিস্তানের স্বার্থ বিরোধী চুক্তি করায় এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেযামে ইসলাম পার্টি ও পিডিপি (জনাব নূরুল আমীনের পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি) PDM (Pakistan Democratic Movement) নামে জোটবদ্ধ হয়। এ জোটের চেয়ারম্যান ছিলেন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ্ খান। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে নেযামে ইসলাম পার্টির প্রেসিডেন্ট চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর লাহোরস্থ বাসভবনে পিডিএম-এর ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভের বৈঠক হয়। আমিও সে বৈঠকে ছিলাম। শেখ মুজিব ঐ বৈঠকেই প্রথম ৬ দফা দাবি পেশ করেন। অন্য চারদল তা সমর্থন না করায় পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পিডিএম থেকে বেরিয়ে আসে। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ্ খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফা বিরোধী আওয়ামী লীগ গঠিত হয়, যার সভাপতি ছিলেন এডভোকেট আবদুস সালাম খান। তিনি শেখ মুজিবের সম্পর্কে মামা ছিলেন।

পূর্ব-পাকিস্তান রিজিওনাল পিডিএম-এর সভাপতি ছিলেন ঐ আবদুস সালাম খান। আমি ছিলাম এর সেক্রেটারি। নূরুল আমিন সাহেবের পিডিপি'র সেক্রেটারি আবদুস সামাদ (পরবর্তীতে আব্দুস সামাদ আযাদ, বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা) ছিলেন ট্রেজারার।

শেখ মুজিবের ৬ দফার বিকল্প ৮ দফাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলে পিডিএম। শেখ মুজিব তখন জেলে। ৬ দফার আন্দোলন স্তিমিত। তিন বছর পিডিএম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুবের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে বিরাট জনমত সৃষ্টি করে।

এ পরিবেশে মাওলানা ভাসানী ১১ দফার ডাক দিয়ে ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। শেখ মুজিবের ৬ দফাও ঐ ১১ দফার শামিল থাকায় আওয়ামী লীগের শক্তিও ময়দানে সক্রিয় হয়। ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। পুলিশের গুলীতে ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হলে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলনে আরও গতি সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়ায় আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ আরও সক্রিয় হয়।

পিডিএম-এর ৮ দফাভিত্তিক আন্দোলন আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধেই ছিলো। কিন্তু রাজনীতিতে কোন তৃতীয় ধারা সৃষ্টি করা যায়নি। আমাদের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ফসলও ৬ ও ১১ দফার পকেটেই গেলো। ফলে পিডিএম-এর আন্দোলন পেছনে পড়ে গেলো। অবশ্য পরে পিডিএম-এর সাথে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ, ওয়ালী খানের ন্যাপ ও মুফতি মাহমুদের জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম মিলে ৮ দলীয় DAC (Democratic Action Committee) গঠিত হয়। যার কেন্দ্রীয় আহবায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানই ছিলেন, আর পূর্ব-পাকিস্তানের আহবায়ক ছিলেন, খোন্দকার মুশতাক আহমদ।

ঐ সময় লাহোরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের বৈঠক উপলক্ষে মাওলানা মওদূদী (র)-এর সাথে আমার একান্ত বৈঠকে পূর্ব-পাকিস্তানের সামগ্রিক অবস্থার রিপোর্ট নিলেন। ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি কিছুটা হতাশা প্রকাশ করলাম।

মাওলানা তখন যা বললেন, তা আমার আন্দোলনের জীবনে সব সময়ের জন্য পাথেয় হয়ে রইলো। তিনি বললেন, জনগণ থেকে হতাশ হওয়া মোটেই সঠিক নয়। নবীগণ যদি হতাশ হতেন তাহলে কাজ বন্ধ করে বসে থাকতেন। মনুষ্যত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ ও বিবেক চিরন্তন। মিথ্যাবাদী লোকও সত্যাবাদীর প্রশংসা করে। আরবের অসভ্য সমাজের লোকগুলো যে সামাজিক পরিবেশে বসবাস করতো তাতে চরিত্রবান লোক গড়ে উঠা স্বাভাবিক ছিলো না। অসৎ নেতৃত্ব সমাজে অসততা ও চরিত্রহীনতারই প্রচলন করেছিলো।

ঐ অসভ্য ও চরিত্রহীন সমাজে যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী হিসেবে বেড়ে উঠলেন, তখন কি সমাজ তাঁকে মন্দ বলেছে? সব লোক তাঁকে প্রশংসা করলো কেমন করে? তাঁকে আল আমিন ও আস সাদেক উপাধি দিলো কিভাবে? মানুষ যতো খারাপই হোক, যে ভালো তাকে ভালো বলে স্বীকার করতে বাধ্য। তাই জনগণ সম্পর্কে নিরাশ হওয়া কখনো সমীচীন নয়। মানবতাবোধ জাগ্রত করতে পারলে জনগণ সাড়া দেয়।

ভিন্ন এক প্রসঙ্গে আলোচনা একটু দীর্ঘ হয়ে গেলো। আমরা দিনাজপুর রেল স্টেশনে নেমে শহরের একটি বড় মসজিদে পৌছলাম। এখানে তিনদিন থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

৩৩.

দিনাজপুরে তিনদিন

তাবলীগ জামায়াতের বাঁধাধরা কর্মসূচি অনুযায়ী দিনাজপুরে কাজ করার সাথে সাথে অতিরিক্ত কিছু কাজের মাধ্যমে তাবলীগ জামায়াতের পরিচিতি মসজিদের বাইরেও তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

তাবলীগের দাওয়াতী প্রোগ্রাম আসর থেকে এশা পর্যন্ত চলে। আমি যে ১৫ জন নিয়ে এলাম তাদেরকে ৫ জন করে তিন জামায়াত বানিয়ে প্রত্যেক দিন তিন মসজিদে আসরের পূর্বে পাঠিয়ে দিতাম। তারা কর্মসূচি পালন করে কেন্দ্রীয় মসজিদে এসে আমাদের সাথে মিলিত হতেন। ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত তালীমের কাজ চলে। ১৫ জনের মধ্যে ১১ জনকে এ কাজের জন্য মসজিদে রেখে আমি ৩ জনকে নিয়ে ভিন্ন ধরনের কিছু কাজে মসজিদ থেকে বের হলাম।

জেলা স্কুলের হেড মাস্টারের সাথে গিয়ে দেখা করলাম। তাবলীগ জামায়াতের কাজ সম্পর্কে ধারণা দেবার চেষ্টা করলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে আমার নাম তিনি শুনেছেন বলে উল্লেখ করলেন। তিনি যোহরের নামাযের আগে এক প্যারিয়ড ক্লাস ছুটি দিয়ে হল রুমে শিক্ষক ও ছাত্রদের সমবেত করলেন।

৪৫ মিনিট কালেমা ও নামায সম্পর্কে আমি আলোচনা করে তাদেরকে বড় মসজিদে মাগরিবের নামাযে হাজির হবার দাওয়াত দিলাম। কয়েকজন শিক্ষক ও বেশ সংখ্যক ছাত্র মসজিদে উপস্থিত হয়ে আমার সাথে দেখা করায় অত্যন্ত খুশি হলাম। মাগরিবের পর তাবলীগের ছয় উসূলের বয়ানের পর তাশকীলের সময় কিছু লোক পরদিন সকাল ১০ টা থেকে তালীমের বৈঠকে হাজির হবার জন্য রাজি হলো। মাত্র ৩ জন লোক আমাদের সাথে পরবর্তী দিন সময় দিতে সম্মত হলেন। এভাবে ৩ দিনের মধ্যে প্রথমদিন গত হলো।

যে মসজিদকে কেন্দ্র করে আমরা কাজ করছিলাম এর মুতাউয়াল্লী থেকে জানা গেলো যে, দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একজন ইসলামপ্রিয় ব্যক্তি। সেকালে জেলা প্রশাসকের এ পদবিই ছিলো। আইয়ুব খাঁর শাসনামলে ডিসি পদবি চালু হয়। আগের দিনের মতোই ১১ জনকে তালীমের জন্য রেখে আমি ৩ জনকে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে দেখা করতে গেলাম। ভাবলাম যে, তাবলীগ জামায়াতের পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ পেলে ভালোই হয়।

জেলা প্রশাসকের অফিসে যিনি রিসিপশনের দায়িত্বে তাকে জানালাম যে, আমরা তাবলীগ জামায়াতের পক্ষ থেকে তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছি। তিনি তার বস্

থেকে অনুমতি চাইতে গেলে তিনি নাকি মন্তব্য করলেন, 'তাবলীগ জামায়াত আবার কী?' তবুও তিনি সময় দিলেন।

ভেতরে যেয়ে দেখি তিনি এক যুবককে ধমকের সুরে যা-তা বলছেন। তিনি তাকে বিদায় করে আমাদেরকে ডাকলেই সঠিক হতো। আমাদেরকে ইশারায় বসতে বললেন। যুবকটিকে তিনি যে সব কথা বলে ধমকাচ্ছিলেন তাতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সে একজন কমিউনিস্ট এবং হিন্দু। যে ভাষায় রাগান্বিত হয়ে কথা বলছিলেন তা তার পদমর্যাদায় মোটেই মানায় না। তাছাড়া যার হাতে প্রচণ্ড ক্ষমতা রয়েছে তার তো রাগ দেখাবার প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তিগতভাবে ক্রুদ্ধ হওয়া তার জন্য একেবারেই বেমানান। ব্যক্তিগত মন্দ আচরণ করা কোন ভদ্র লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক নয়।

অভদ্র আচরণের আরেকটি উদাহরণ

আমি ১৯৯২ ও '৯৩ সালে ঢাকা জেলে থাকাকালে ডিআইজি সাহেব ভিজিটে আসলেন। আমি ২৬ সেলের প্রথম কামরায় ছিলাম। ২৬ সেল নামক বিল্ডিংটি মন্ত্রীদের জেলখানা নামে পরিচিত। ১২ টি কামরার মধ্যে সবচেয়ে সেরা কামরাটিই ১ নং কামরা। আমার পূর্বে এ কামরায় যারা ছিলেন তাদের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পরে ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ছিলেন। জেল থেকে বের হয়ে এ তিনজনের সাথে দেখা হলে তাদেরকে রুমমেট বলে সম্বোধন করলে তারাও কৌতুকবোধ করলেন।

জেলের ভেতরে বিভিন্ন এলাকাও দেয়ালে ঘেরা থাকে। এর পৃথক গেটও থাকে। হঠাৎ গেটের ভেতরে উচ্চৈঃস্বরে কথা কানে এলে তাকিয়ে দেখলাম ডিআইজি সাহেব সুবেদার সাহেবকে অত্যন্ত অভদ্র ও কটু ভাষায় গালাগাল দিচ্ছেন। বয়সে ডিআইজি সাহেব ৪০/৪৫ হবেন এবং সুবেদার ৬০-এর বেশি বয়সের।

আমি বসে পড়াশুনা করছিলাম। বাঁ পাশেই জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। আমি গলায় আওয়াজ করলাম। ডিআইজি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। তিনি ভিজিটে আসলে আমাদের সাথে দেখা করেন এবং সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলেন। একটু পরেই আসলেন। তখনো মেজাজ পুরো স্বাভাবিক হয়নি বলে এবার কথাবার্তা কমই হলো। হয়তো কিছুটা লজ্জাও বোধ করতে পারেন। পরে আমি তাঁকে অত্যন্ত শালীন উপদেশমূলক ভাষায় চিঠি দিলাম। লিখলাম, 'আপনার নিরংকুশ ক্ষমতা আছে। অধীনস্থ কর্মচারীকে অপরাধ করলে শাস্তি দিতে পারেন। বিধি মোতাবেক শাস্তি দিলে অপরাধীও ক্ষুব্ধ হয় না। কিন্তু মন্দ বললে মানুষ মনে যে ব্যথা পায় তা সে ভুলে না। আপনার প্রতি কর্মচারীদের শ্রদ্ধা শাস্তি দিলেও বহাল থাকবে। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহার ভালো না হলে শ্রদ্ধা থাকে না।'

দিনাজপুরের জেলা প্রশাসকের আচরণ দেখে আমাদের মনে তার সম্পর্কে ভালো ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিলো না। যা হোক ১৫/২০ মিনিট পর ঐ যুবককে একজন পুলিশ এসে নিয়ে গেলে ডিএম সাহেব আমাদের সাথে এসে বসলেন।

তাবলীগ জামায়াত ইসলামের কী খেদমত করছে, সে বিষয়ে মিনিট পাঁচেক শুনেই তিনি ইসলামের দার্শনিক দিক নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। পাকিস্তান ইসলামের জন্যই কায়েম হয়েছে বলে মুসলিম লীগ নেতাদের মতোই বলতে থাকলেন।

আমরা ইসলামের খেদমত কীভাবে করছি সে বিষয়ে কিছু বলার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, 'অত্যন্ত খুশির বিষয় যে, আপনারা ইসলামের জন্য কাজ করছেন। কী কী কাজ করছেন ও কিভাবে করছেন সে বিষয়ে আমাকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমি আমার পক্ষ থেকে সাধ্যমত ইসলামের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আপনারাও কাজ করে যান।'

সুতরাং আমাদের সময়টা শুধু শুধুই খরচ হয়ে গেলো। আমার এ অভিজ্ঞতা হলো যে, কেউ যদি নিজকে বিরাট কিছু মনে করে বসে তাহলে আর কিছু শেখার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ জাতীয় লোকেরা নিজের কথাই শুনাতে আগ্রহী; আর কারো কাছ থেকে শুনবার মতো ধৈর্য তাদের থাকে না।

আমরা বিদায় নিতে চাইলে তিনি আরো কিছু বলার জন্য দেরি করালেন। নামাযের তাশাহুদ নিয়ে কাগজে নকশা এঁকে কী যে বুঝাতে চাইলেন তা তিনিই জানেন। বেশ চেষ্টা করেই বিদায় হয়ে আসলাম। এক আজব মানুষ দেখলাম।

দিনাজপুরে তাবলীগের কাজ চালু করতে হলে এখান থেকে চিল্লা দেবার লোক যোগাড় করতে হবে। এটাই স্বাভাবিক। চিল্লায় না গেলে এ কাজ শেখা সম্ভব নয়। কাজ না শিখলে দায়িত্ব দেওয়া যায় না। তিনদিন দিনাজপুরে কাজ করে দু'জন লোক ৩ দিনের জন্য এবং একজন লোক ৭ দিনের জন্য আমাদের সাথে তাবলীগী সফরে যাবার মতো পাওয়া গেলো। যিনি ৭ দিনের সময় দিলেন তিনি পরে এক চিল্লা (৪০ দিন) দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আমরা নতুন ৪ জনসহ রংপুর রওয়ানা হলাম। সেখানেও তিনদিন থাকার সিদ্ধান্ত হলো। দিনাজপুর যে মসজিদে তিনদিন রইলাম এর ইমাম সাহেব আগ্রহী হলেন এবং পরে এক সময় চিল্লা দেবার জন্য মনস্থ করলেন।

আমরা রেলপথেই রংপুর গেলাম। বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদেরকে সহযোগিতা করতে আমরা সবাই উৎসাহ বোধ করলাম। গাড়িতেই রংপুরের এক যাত্রী আমাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য রাজি হলেন। রংপুরের সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত মসজিদ কোন্‌টি জানতে চাইলাম। তিনি বললেন যে, স্টেশন থেকে আমাদেরকে ঐ মসজিদে তিনিই পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি আমাদেরকে কেরামতিয়া মসজিদে নিয়ে গেলেন।

৩৪.

রংপুরে তিন দিন

রংপুর কেরামতিয়া মসজিদটি বেশ পুরানো। শহরের সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত মসজিদ। বর্তমানে সে মসজিদ আরও অনেক বড় করা হয়েছে। কোর্ট-কাচারি মসজিদটির অতি নিকটে। তাই যোহর ও আসরের জামায়াতে যথেষ্ট লোক হয়। অনেক শিক্ষিত লোকের নিকট দাওয়াত পৌছাবার সুযোগ হবে আশায় উৎসাহ বোধ করলাম।

মসজিদের ইমাম সাহেব বেশ সুপুরুষ এবং চমৎকার কিরাআত পড়েন। যে মসজিদে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়, সে মসজিদের ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করে অনুমতি নেয়ার নিয়ম আমরা পালন করি। ইমাম সাহেব মুতাওয়াল্লীর সাথে আলাপ করে অনুমতি দিলেও তিনি কোন সহযোগিতা করলেন না।

পরবর্তীকালে আমার রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে যখন জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত নিয়ে যাই তখনো এই ইমাম সাহেবই ছিলেন। তাঁর নাম মাওলানা আলী আহমদ রিযভী। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি জামায়াতের দাওয়াত কবুল করলেন এবং জামায়াতের শহর সংগঠনের তিনিই প্রথম দায়িত্বশীল হলেন। আমি ৫০ সালের ডিসেম্বরে কলেজে যোগদান করি। আর ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে শরীক হই। এ ক'বছর তাবলীগের কাজে কেরামতিয়া মসজিদে বহুবার গিয়েছি। কোন সময় তিনি সহযোগিতা করেননি।

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পর তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে মন্তব্য করলেন, 'আপনার সাথে ৪ বছর থেকে পরিচয়। রংপুর তাবলীগ জামায়াতের আমীর হিসেবে আপনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু তাবলীগ জামায়াতের দাওয়াতে আমি সামান্য আকর্ষণও বোধ করিনি। এটা নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথেই আমি কেন কবুল করলাম সে কথা না বলে পারছি না। আমি মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরির ছাত্র। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বিপ্লবী লেখা ও আল্লামা ইকবালের কাব্য আমার অন্তরে যে ভাবধারা সৃষ্টি করেছে সে উদ্দেশ্যে কাজের কোন পথ ইতঃপূর্বে পাইনি। আপনার নিকট থেকে জামায়াতের দাওয়াত পেয়ে মনে হলো, আমি যেন এমন একটি আন্দোলনেরই অপেক্ষায় ছিলাম।'

যা হোক ইমাম সাহেবের সহযোগিতা না পেলেও তিনি কোন বাধার সৃষ্টি করেননি। আমরা তিন দিন ঐ মসজিদকে কেন্দ্র করে কাজ করেছি। দিনাজপুরের মতোই বিভিন্ন মসজিদে কাজ করে সবাই কেন্দ্রীয় মসজিদে ফিরে আসতো।

মাওলানা কেরামত আলীর মাযার

মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর নাম ছোট সময় থেকেই শুনেছি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। রংপুর কেরামতিয়া মসজিদের বারান্দায় তাঁর মাযার দেখে তাঁর সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ জন্মাল। মাযারটি মসজিদের ভেতরে অবস্থিত। মসজিদ আরও বড় হওয়ায় বর্তমানে কবরটি মসজিদের মাঝখানে মনে হয়। মাযারের চার পাশেই জামায়াতের সময় নামাযীরা দাঁড়ায়। মদীনা শরীফে রাসূল (স)-এর মাযারও মসজিদে নববীর ভেতরেই অবস্থিত। মুসল্লীরা জামায়াতে নামায় আদায় করে। মসজিদের ইমাম সাহেব থেকে শুধু এটুকু জানা গেলো যে, তিনি একজন বিখ্যাত মুবাল্লিগ ছিলেন। জৌনপুর (ভারত) থেকে তিনি এদেশে এসে ইসলাম প্রচার করেন। দেশে আর ফিরে যাননি। গোটা জীবন দীনের খেদমতেই কাটিয়ে দেন। পরবর্তীকালে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (র) সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। শহীদ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র) ও শহীদ মাওলানা শাহ ইসমাইলের নেতৃত্বে পরিচালিত তাহরীকে মুজাহিদীনের (মুজাহিদ আন্দোলন) সাথে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন। ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে শিখদের সাথে যুদ্ধে মুসলমান নামধারী মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও শিখদের সাথে ইংরেজদের সহযোগিতার ফলে মুজাহিদদের পরাজয় ঘটে এবং ঐ দু'মহান নেতা শহীদ হন। তাই তাঁদের নামের সাথে শহীদাইনে বালাকোট (বালাকোটের দু'শহীদ) কথাটি উল্লেখ থাকে।

সংগ্রাম ও আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ার পর দাওয়াতে দীনের দায়িত্ববোধ নিয়ে মাওলানা কেরামত আলী এদেশে প্রথমে নোয়াখালী অঞ্চলে কাজ শুরু করেন। নোয়াখালীতে কেরামতিয়া কামিল মাদ্‌রাসা তাঁরই স্মৃতি বহন করছে। রংপুর কেরামতিয়া মসজিদে তিনদিন থাকাকালে তাঁর মাযারের পাশেই তাহায্‌যুদের নামায আদায় করতাম। তিনি দীনের যে জযবা নিয়ে জন্মভূমি ছেড়ে এদেশে কাজ করেছেন তেমনি জযবা আমার মধ্যেও অনুভব করলাম। তখন দিল্লীতে হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (র)-এর বক্তৃতার কথাও মনে জাগলো। দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করার যে প্রেরণা মাওলানা ইউসুফ সাহেব দিলেন তা আরও শাণিত বোধ করলাম। আল্লাহর দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করার জযবা আমার মধ্যে তাবলীগ জামায়াতেরই মহান অবদান। তাই তাবলীগ জামায়াতকে আমি ভালোবাসি এবং দীনের মহান খেদমত হিসেবে গণ্য করি। ইকামাতে দীনের কোন কর্মসূচি অবশ্য তাদের নেই।

আমার এমএ পরীক্ষার ফল বের হয়নি। পাস করে কি করব সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তখনো নিইনি। আমার সহপাঠীদের সাথে পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে সিএসপি ও পিএসপি ইত্যাদিতে যাবার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিলো। পাকিস্তান কায়েম হবার পর বড় বড় সরকারি চাকরি তখন মুসলমানদের বড় আকর্ষণের বিষয় ছিলো।

তাবলীগ জামায়াত আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আমি কেরামতিয়া মসজিদেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কলেজে শিক্ষকতা করবো, যাতে বড় বড় ছুটিতে চিল্লা দেওয়া

যায় এবং ছাত্রদের মধ্যে দাওয়াতে দীনের কাজ করার সুযোগ নেওয়া সহজ হয়। এমএ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পর আমি দেশের সেরা ৪ টি কলেজে লেকচারার পদের জন্য দরখাস্ত পাঠাই। কোন কলেজে ভেকেন্সী আছে কিনা তা জানা ছিলো না। ইন্টারভিউ ছাড়াই রংপুর কলেজে আমি নিয়োগ পেয়ে গেলাম। এটা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয় যে, যে রংপুরে অবস্থানকালে কলেজে শিক্ষকতার সিদ্ধান্ত নিলাম, সে রংপুরেই কেমন করে সুযোগ পেয়ে গেলাম। এ কারণেই রংপুর কেরামতিয়া মসজিদ আমার স্মৃতিতে চির অম্লান হয়ে রইলো। আমার কর্মজীবন রংপুরেই শুরু হলো। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে রংপুরেই জেলে যেতে হয়েছে। এখনও রংপুর গেলে মনে হয় যে, নিজের এলাকায় এলাম।

তিন চিল্লা সমাপ্ত

রংপুর তিন দিন তাবলীগী কর্মসূচি পালন করে বগুড়া, পাবনা, রাজশাহীতেও তিন দিন করে কাজ করার পর ঢাকার দিকে রওয়ানা হয়ে পথে কয়েকটি জায়গায় ১ দিন, ২ দিন করে থেকে সম্ভবত জুনের শেষ দিকে ঢাকা ফিরে এলাম। তখন আমার চিল্লার ৩ দিন বাকি। এ তিন দিন আমাকে ঢাকার ৩ টি মসজিদে ১০ জনের এক জামায়াতের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। কাকরাইল মসজিদে মাওলানা আবদুল আযীয ও ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মুকীত আমাকে বুকে জড়িয়ে কিছুক্ষণ দোয়া করলেন এবং আমার তিন চিল্লা পুরা হওয়ার জন্য আন্তরিক মুবারকবাদ জানালেন।

এশার নামাযের পর উপস্থিত সকলকে নিয়ে মাওলানা আবদুল আযীয সাহেব আমার জন্য দোয়া করে বিদায় করলেন এবং চার মাস তাবলীগী সফরে কাটিয়ে মগবাজারস্থ বাড়িতে আব্বা-আম্মার সাথে মিলিত হলাম।

৩৫.

এমএ পাস করলাম

১৯৫০ সালের মার্চের মাঝামাঝি এমএ পরীক্ষা দিয়ে তাবলীগ জামায়াতে তিন চিল্লার (চার মাস) জন্য বের হয়ে জুলাইয়ের মাঝামাঝি ঢাকায় ফিরে এলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে জানতে পারলাম যে, আমার ভাইবার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। আজকাল লিখিত পরীক্ষার পর পরই নাকি ভাইবা হয়ে যায়। সেকালে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল সামনে নিয়ে ভাইবা হতো।

ভাইবাতে জানা গেলো যে, ৪ পেপারের মধ্যে ৩ পেপারে ভালো নম্বরই পেয়েছি। ১ পেপারে কেন কম পেলাম, সে বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হলো। অন্য তিন পেপারের মতো ঐ পেপার হলে ফল ফার্স্ট ক্লাসের সম্ভাবনা ছিলো ভাইবাতে পরীক্ষকগণ সন্তুষ্টই হলেন।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেলো। জানা গেলো যে, এবার কেউ ফার্স্ট ক্লাস পায়নি। ৪ জন হাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে এবং আমার অবস্থান দ্বিতীয়।

তাবলীগের চিল্লায় থাকাকালে রংপুর কেরামতিয়া জামে মসজিদে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, শিক্ষতার পেশাই গ্রহণ করবো। ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল সাইন্সের হেডের সাথে দেখা করে জানলাম যে, আমার অনার্স ডিগ্রি না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। ফার্স্ট ক্লাস পেলে অনার্স ছাড়াও সুযোগ থাকে। এমএ-তে আমার চেয়ে কম নাম্বার পাওয়া একজন অনার্সে থার্ড ক্লাস সত্ত্বেও সুযোগ পেয়ে গেলো।

চারটি নামকরা কলেজে দরখাস্ত পাঠালাম। অবিভক্ত বাংলায় ৫টি ডিগ্রি কলেজ প্রিমিয়ার কলেজ হিসেবে বিখ্যাত ছিলো। কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, বরিশাল বিএম কলেজ ও মোমেনশাহী এমএম কলেজ। এর মধ্যে কোলকাতা প্রেসিডেন্সি ছাড়া বাকি চারটিই পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানের এলাকায় থাকায় আমি এ চার কলেজেই প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটসহ দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম।

কোনো কলেজে লেকচারের পদ খালি আছে কিনা জানাও ছিলো না। পত্রিকায় কোনো বিজ্ঞাপনও দেখিনি। শূন্যে তীর ছোঁড়ার মতো কাজই করলাম। এমএ পাসের পাকা সার্টিফিকেট পেতে আরও দেরি হবে বলে ডিপার্টমেন্টের হেড থেকে লিখিত সার্টিফিকেট এবং আরও দু'জন প্রফেসারের প্রশংসাপত্র যোগাড় করে দরখাস্ত পাঠালাম। অধ্যাপক ড. মুজাফফর আহমদ (শেখ মুজিবের শাসনামলে যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন) আমাকে যে সার্টিফিকেট দিলেন তা আমার যোগ্যতার চেয়েও বেশি প্রশংসাসূচক ছিলো।

একাউন্টেন্ট জেনারেলের সাথে সম্পর্ক

তাবলীগী চিল্লার পর পরই একাউন্টেন্ট জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ জামীল সার্কিট হাউজস্থ তাঁর বাসায় যেতে বললেন। তিনি তাবলীগ জামায়াতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি উর্দুভাষী ছিলেন। ইউপি বা দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে একাউন্টেন্ট জেনারেলের পদটি 'হার ম্যাজেস্টিক সার্ভিস' হিসেবে গণ্য ছিলো। এতবড় পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কাকরাইলে তাবলীগী মসজিদে জামায়াতে শরীক হতেন। সার্কিট হাউজ থেকে হেঁটেই মসজিদে যেতেন। সাপ্তাহিক ছুটিতে তিনি মাঝে মাঝে তাবলীগের সফরেও বের হতেন। একাধিকবার তাঁর সফরসাথী হিসেবে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগও পেয়েছি। তাঁর বয়স তখন ৫০-এর উপর আর আমি তরুণ। এ সত্ত্বেও তিনি আমাকে আপন করে নিলেন। তাঁর মহব্বত ভরা হাসি আমাকে খুবই আকৃষ্ট করতো। তিনি ঢাকা থেকে দু'বছর পর বদলী হয়ে গেলেন। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলীতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইয়ুথ কনফারেন্সে তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা।

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজস্ব উদ্যোগে একটি সংগঠন করে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, জাপান ইত্যাদি দেশে সফর করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বেশ কিছু যুবক ইসলাম গ্রহণ করেন। সে হিসেবেই এক যুব-সংগঠনের নেতা হিসেবে তিনি ঐ সম্মেলনে এসেছিলেন। আমাকে পেয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। লন্ডনে আমার নির্বাসন জীবনের অবস্থা জেনে তিনি প্রাণ ভরে আমার জন্য দোয়া করলেন। আমি তাঁর দোয়া ও উপদেশে অনুপ্রেরণা বোধ করলাম। অনুভব করলাম যে, আল্লাহর সাথে যাদের ভালোবাসার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় তাদের অন্তর মানুষের প্রতি অত্যন্ত উদার হয়ে যায়।

একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিস ইউডি ক্লার্কের চাকরির প্রস্তাব

সার্কিট হাউসে একাউন্টেন্ট জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ জামীলের বাসায় গেলাম। তিনি পরম স্নেহের সাথে আমাকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসালেন। বললেন, 'আপনার এমএ পরীক্ষার ফল বের হওয়া এবং চাকরিতে যোগদান করার পূর্ব পর্যন্ত আপনি আমার অফিসে ছোট্ট একটা চাকরি নিন। আমার বিরাট অফিসে কয়েক শ'লোক কাজ করে। আপার ডিভিশন ক্লার্কের সবাই গ্রাজুয়েট। লয়ার ডিভিশন ক্লার্কের কেউ ম্যাট্রিকের নিচে নয়। আমি যোহরের নামাজের সময় আধা ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ৪৫ মিনিট করে দিয়েছি। অফিসারদের মধ্যে যারা ঈমান ও আমলের বিষয়ে বলার যোগ্যতা রাখেন তাদেরকে ঐ সময় ২০/২৫ মিনিট বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তাদের বক্তব্য আশানুরূপ নয়। আমি আপনার বক্তব্য বহুবার শুনেছি। আমার আশা যে, আপনি চাকরি নিলে আপনার সহকর্মী কর্মচারীদের নিকট দীনের কথা পরিবেশনের সুযোগ নিতে পারবেন। আশা করি ইসলামের খেদমতের এ সুযোগ আপনি গ্রহণ করতে আপত্তি করবেন না।

এ জাতীয় চাকরি করার সামান্যতম কোনো আগ্রহও আমার ছিলো না। কিন্তু জামীল সাহেবের স্নেহের দাবি প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়নি। ভাবলাম, মন্দ কি, অভিজ্ঞতাও হবে, দীনের কাজও করা যাবে, পকেট খরচের জন্য আব্বার কাছে হাতও পাততে হবে না। রাজি হলাম।

তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, আমি যেন আজই দরখাস্ত দিই। দরখাস্তের ফরম নিজেই দিলেন। বললেন, প্রতি সপ্তাহেই ইন্টারভিউ হয়। ইন্টারভিউতে আপনার মতো ছেলে সহজেই টিকে যাবে। দরখাস্তের ৪ দিন পরই ইন্টারভিউর চিঠি পেলাম। ২ দিন পরই ইন্টারভিউতে হাজির হলাম। তিন দিন পর চাকুরিতে যোগদান করলাম।

প্রৌঢ় বয়সী এক সুপারিন্টেনডেন্টের অধীনে প্রায় ২৫/৩০ জন ক্লার্কের মধ্যে আমি একজন। নতুন হিসেবে তিনি আমাকে কাজ শেখাবার জন্য বারবার আমার টেবিলে এসে দেখতেন এবং পরামর্শ দিতেন। তিনি বেশ সহানুভূতিশীল ছিলেন। অংক কষার কাজই প্রধান। কাজের ধরন আমার মোটেই পছন্দ না হলেও চাকরির খাতিরে করতে লাগলাম।

কয়েক দিন পর অফিসার বক্তাদের একজন আমাকে যোহরের নামাজের পর পরিচয় করিয়ে দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানালেন। শ্রোতারা পছন্দ করছে বলেই মনে হলো। কিন্তু একজন ক্লার্ক অফিসারের মান-মর্যাদা পেয়ে যাওয়ায় সিনিয়র কতক ক্লার্কের মধ্যে কিছু গুঞ্জনের আভাস পাওয়া গেলো। আল্লাহর রহমতে কয়েক দিনের আলোচনার পর আমার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেলো। সপ্তাহ খানেক পর যারা বক্তব্য শুনে আমার সাথে হাত মিলিয়ে পরিচয় করতে আসতো তাদেরকে কাকরাইলের মসজিদে যাবার দাওয়াত দিলাম। এভাবে ঐ অফিসে মাত্র ৪০ দিন (একচিল্লা) কাজ করে ৮/১০ জনকে তাবলীগে সময় দিতে রাজি করাতে সক্ষম হই।

৩৬.

একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে বড় পদের সুযোগ

ইউডি ক্লার্ক হিসেবে মাস খানেক চাকরি করার পর একাউন্টেন্ট জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ জামীল আমাকে তাঁর বাসায় যেতে বললেন। ইতোমধ্যে আমার এমএ পাসের খবর তিনি পেয়েছেন। আমার সকল শিক্ষাগত সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্র সাথে নিয়ে যেতে পরামর্শ দিলেন। যথাসময় পৌঁছলাম। তিনি আমার কাগজ পত্র কিছুক্ষণ দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'আমি আপনাকে মহব্বত করি দীনের খাতিরে। আমার অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট আপনার কাজের যোগ্যতার চমৎকার সার্টিফিকেট দিয়েছেন। যোহরের নামাযের সময় আপনার দীনী আলোচনার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সন্তোষজনক। আমি চাই আপনি এ অফিসে স্থায়ী হোন। আপনাকে অফিসার পদে আমি প্রমোশন দিতে চাই। আপনি যদি সম্মত হন তাহলে এ কাগজে দস্তখত দিন।'

একথাগুলো বলে আমার দিকে ৪/৫ পৃষ্ঠার একটি কাগজ এগিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম যে, কাগজগুলো অফিসার পদে দরখাস্তের সরকারি ফরম। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, ফরমের প্রায় সব কলাম পূরণ করা আছে। বুঝলাম যে, ক্লার্ক পদে দরখাস্ত থেকে আমার যাবতীয় পারটিকুলার এ ফরমে লেখা আছে। শুধু কয়েকটি মাত্র কলাম পূরণ করা বাকি।

আমার প্রতি তাঁর এ অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে চুপ হয়ে কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, 'আমি আরও দু'বছর ঢাকায় আছি। এক বছর পর আমি আরও উচ্চ পদে প্রমোশন দিতে পারবো। এর পরের বছর আমি এমন ব্যবস্থা করে যেতে চাই যে, আপনি চাকরিতে দ্রুত উন্নতি করতে সক্ষম হবেন। তাই আপনি নিশ্চিন্তে দস্তখত করে দিন।'

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এবং আবেগজড়িত কণ্ঠে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম, 'আমি জানি যে, দীনের কারণেই আপনি আমাকে এতো স্নেহ করেন। দীনের জযবা নিয়েই আমি পেশা হিসেবে কলেজের শিক্ষকতাকে বাছাই করে নিয়েছি।' আমার তৃতীয় চিল্লায় থাকাকালে রংপুর কেরামতিয়া মসজিদে শেষ রাতে

কী মনোভাব নিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এর বিবরণ দিলাম। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে কপালে চুমু দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'এতো বড় অফারকে প্রত্যাখ্যান করার মতো হিম্মত আপনার মধ্যে দেখে আপনার প্রতি আমার মহব্বত আরও গভীর হয়ে গেলো। আল্লাহ্ পাক দীনের জন্য আপনাকে কবুল করুন। আপনার মতো লোকের সরকারি চাকরি মোটেই যথার্থ পেশা নয়। আপনি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। বাড়িতে এসে আব্বাকে এ বিষয়টা জানালে তিনি মন্তব্য করলেন যে, এ ব্যাপারে তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার মনোভাব নিয়ে এবং ইসলামী জযবার ভিত্তিতে ফায়সালা করবে।

ইউডি ক্লার্কের পদ ছেড়ে দিলাম

ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মুকীত ভাই আমাকে জানালেন যে, বেশ কয়েকজন সম্ভবনাময় শিক্ষিত যুবক এক চিল্লায় বের হতে তৈরি হয়েছে। তাদেরকে গড়ে তোলার জন্য তোমার মতো একজন আমীর প্রয়োজন। আমি বললাম, আমি কয়েকটি কলেজে লেকচারার পদের জন্য দরখাস্ত করেছি। কখন খবর আসে সে অপেক্ষায় আমার ঢাকায় থাকা প্রয়োজন। তিনি বললেন, তোমার আব্বার সাথে যোগাযোগ রাখবো। কোন খবর পেলে তোমাকে জানাবো। আমি বললাম, আমি জামীল সাহেবের অফিসে চাকরি করছি। তিনি বললেন, ছুটি নেওয়া যাবে। কিন্তু জানা গেলো যে, মাত্র মাস খানেক হলো চাকরি হয়েছে বলে এতো লম্বা ছুটি পাওয়া সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে চিল্লায় চলে গেলাম। চাকরিতে মাত্র এক চিল্লা (৪০ দিন) পরিমাণ সময় ছিলাম।

সম্ভবত অক্টোবরের শেষদিকে চিল্লা সমাপ্ত করে ঢাকায় ফিরে এলাম। চাকরি না থাকায় ঢাকা ও এর আশেপাশে তাবলীগ জামায়াতের কাজেই নিয়োজিত রইলাম। নভেম্বরের মাঝামাঝি এক টেলিগ্রাম পেলাম। মাত্র কয়েক শব্দের টেলিগ্রামটি থেকে বুঝতে পারলাম না যে, কোন কলেজের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। এটা সত্যি বিস্ময়কর। টেলিগ্রামের কোথাও কোনো কলেজের নাম লেখা নেই। কোন জেলা থেকে প্রেরিত সে কথারও উল্লেখ নেই। প্রেরক টেলিগ্রাম অফিসের নাম 'আলম নগর' লেখা।

রংপুর কারমাইকেল কলেজের নিয়োগপত্র পেলাম

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে একটি পদ খালি আছে, প্রিন্সিপাল সাহেব ডাকলে যেন যাই-এ মর্মে একটি খবর কে দিয়েছিল তা মনে নেই। তাই পাবনায় গেলাম। জানতে পারলাম যে, ঐ কলেজ থেকে কোনো টেলিগ্রাম পাঠানো হয়নি। টেলিফোন অফিসে গিয়ে জানা গেলো যে, আলমনগর রংপুরে। রংপুর রওয়ানা হয়ে গেলাম। কিন্তু ইন্টারভিউর তারিখ তো পাবনায়ই কেটে গেলো। পরদিন রংপুর পৌঁছে প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় গেলাম। প্রিন্সিপাল সাহেবকে দেখে অভিভূত হয়ে বললাম, 'স্যার আপনি এখানে আছেন জানলে আমি অনেক আগেই এসে দেখা করতাম।' তিনি আমার সাথে মযবুত হাতে হ্যান্ডশেক করে বসায়ে

বললেন, 'গতকাল কেনো এলে না?' আমি কারণ জানালে তিনি বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন, 'হেড ক্লার্কটা একটা ইডিয়েট। সে কেমন করে এ ধরনের টেলিগ্রাম পাঠালো? যাক তুমি কিছু মনে নিও না। তোমার কোন দোষ নেই।'

বিষণ্ন বদনে চিন্তান্বিত মনে ও করুণ সুরে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, আমাকে কি ইন্টারভিউ দেবার সুযোগ দেওয়া যাবে?' তিনি হাত বাড়িয়ে মুবারকবাদ জানিয়ে বললেন, 'কোন ইন্টারভিউ দেওয়ার দরকার হবে না। যারা ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল তাদের চেয়ে তোমার সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র ও আমার সাথে তোমার সম্পর্কের পরিচয় জেনে তোমাকে নিয়োগ দেবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তুমি আগামীকালই নিয়োগপত্র নিয়ে যাও এবং নির্দিষ্ট দিনে এসে জয়েন করো।' অন্তর থেকে মহান মনিবের প্রতি শুকরিয়া স্বরূপ মুখ দিয়ে 'আলহামদুল্লিাহ' বের হলো এবং আমার সমগ্র সত্তা তৃপ্তি বোধ করলো। বুঝা গেল, আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত হলে এমনটাই হয়। বিনা ইন্টারভিউতেই নিয়োগ পাওয়া যায়। তার ইচ্ছা না থাকলে চেষ্টা করেও সফল হওয়া যায় না।

প্রিন্সিপাল আবদুল হাকীম কুরাইশী সরকারি ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল থাকাকালে আমি ক্লাস নাইন থেকে আইএ পর্যন্ত চার বছর পড়েছি। আইএ ক্লাসে তিনি সেক্সপিয়ারের ড্রামা 'জুলিয়াস সীজার' পড়ান। নাটকীয় ভঙ্গিতেই পড়াতেন। পূর্বের আলোচনায় তার নাম উল্লেখ না করলেও প্রিন্সিপাল হিসেবে উল্লেখ করেছি।

আল্লাহর মহিমা

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৫০-এর মে মাসে রংপুর কেরামতিয়া মসজিদে তাবলীগের চিল্লায় থাকাকালে আমি এক শেষ রাতে সিদ্ধান্ত নেই যে, আমি কোন সরকারি চাকরি করবো না, কলেজে শিক্ষকতা করবো যাতে দীনের কাজে বেশি সময় দিতে পারি এবং ছাত্রদের মধ্যে দীনের দাওয়াত দেবার সুযোগ পাই।

আল্লাহর অপার মহিমা যে, ঐ রংপুরেই আমার শিক্ষকতা করার সুযোগ হয়ে গেলো। আরো তিনটি বড় কলেজে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। কোথাও থেকে কোন খবরই আসেনি। অথচ রংপুরে ইন্টারভিউ ছাড়াই নিয়োগপত্র পেয়ে গেলাম।

কলেজে দু'জন অধ্যাপকের সাথে পরিচয় হলো

একজন কুমিল্লার অধ্যাপক জমীরুদ্দীন আহমদ অপরজন রংপুর কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক কলীমুদ্দীন আহমদ। জানতে পারলাম যে, তারা আগেই অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও কোন অনিয়মের কারণে তাদেরকে নতুন করে নিয়োগপত্র নিতে হচ্ছে। এভাবে আমরা তিনজন একই সাথে নিয়োগপত্র পেলাম। কলেজে জয়েন করার তারিখও একই, ৩ ডিসেম্বর ১৯৫০ সাল। অধ্যাপক জমীর বাংলা বিভাগে এবং অধ্যাপক কলীম ফিলসফীতে। আর আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। নিয়োগপত্র নিয়ে ঢাকায় ফিরে গেলাম।

৩৭.

রংপুর কারমাইকেল কলেজে যোগদানের প্রস্তুতি

রংপুরে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই যে মানের শীত দেখে এলাম, তাতে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে প্রচণ্ড শীতের নিশ্চয়তা পেলাম। আমার শীতের জামা-কাপড় ছিলো না। সুতি শার্ট-পায়জামা পরেই ছাত্রজীবন কাটলো। বেশি শীতে খদ্দরের চাদরই যথেষ্ট মনে করতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী ছাড়াও বেশ সংখ্যক ছাত্র শীতে সুয়েটার পরতো। অল্প সংখ্যক ছাত্র গরম কোট-প্যান্ট পরে ক্লাসে যেতো। চাদর গায়ে দিয়ে ক্লাসে যেতে কেউ লজ্জা বোধ করতো না। হিন্দু শিক্ষকরা বেশির ভাগই গরম চাদর গায়ে দিয়ে লেকচার দিতেন। তাদের কয়েকজন প্যান্ট পরতেন। বাকি সবাই ধুতি পরে ক্লাসে যেতেন।

রংপুর কলেজে অধ্যাপকদের মধ্যে যাদের সাথে পরিচয় হয়েছিল, তারা সবাই গরম শেরোয়ানী বানাবার পরামর্শ দিলেন। তাই ঢাকায় ফিরে এসে ফ্লানেলের শার্ট ও গরম শেরোয়ানী বানালাম। গরম প্যান্ট বানাবার পরামর্শ দেননি কেউ। প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র যোগাড় করা হলো। লেপ-তোষক রংপুরেই কেনার সিদ্ধান্ত নিলাম।

৩ ডিসেম্বর কলেজে যোগদান করার কথা। ১ তারিখ দিবাগত রাতের মেইল ট্রেনে রওয়ানা দিয়ে দু'তারিখ দুপুরের পর রংপুর পৌঁছলাম। কলেজ কম্পাউন্ডে অধ্যাপকদের জন্য যে সব বাসা আছে এরই একটিতে কয়েকজন মেস করে থাকেন। আমি সেখানেই গিয়ে উঠলাম। বিকেলে প্রিন্সিপাল স্যারের বাসায় গিয়ে দেখা করে এলাম। সন্ধ্যার পর অধ্যাপক জমীরুদ্দীন কলেজ কম্পাউন্ডে সপরিবারে যে কয়জন মুসলিম অধ্যাপক আছেন তাদের বাসায় নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অধ্যাপক জমীরুদ্দীন বাংলার অধ্যাপক। আমার চেয়ে তিনি কয়েক বছরের বড়। আল্লাহর ফযলে তিনি এখনো বেঁচে আছেন। কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্র কান্দিরপাড়ের নিকটেই নিজের বাড়িতে থাকেন। একটি ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে বেশ কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

কারমাইকেল কলেজে যোগদান

৩ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে সকাল ১০টায় প্রিন্সিপালের অফিসে একই সাথে আমরা তিনজন আনুষ্ঠানিকভাবে লেকচারার হিসেবে যোগদান করলাম।

ক্লাস রুটিনের দায়িত্বে নিয়োজিত সিনিয়র অধ্যাপক গোপাল বাবুকে (পুরো নাম মনে নেই) প্রিন্সিপাল সাহেব আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বেশ বয়স্ক এবং দন্তহীন হলেও যথেষ্ট কর্মতৎপর। আমাকে সাদরে গ্রহণ করে তাঁর অফিসে নিয়ে

গেলেন। ক্লাস রুটিনের বিরাট প্রশস্ত কাগজ টেবিলে খুলে প্রায় ১০ মিনিট পর্যন্ত একটি কাগজে নোট করলেন। টাইপিস্টকে ডেকে এক্ষুণি ঐ নোট করা কাগজটি টাইপ করে দিতে বললেন। ভদ্রলোক বেশ আলাপী। আমাকে কংগ্রেচুলেশন জানিয়ে মুরব্বীয়ানা সুরে বললেন, 'আমরা আর ক'দিন থাকবো। আপনারাই কলেজের দায়িত্বে আসবেন। আর দু'বছর পর আমি রিটায়ার করবো। গত ১০ বছর আমি রুটিন সাজাবার কঠিন দায়িত্ব পালন করছি। আর কেউ এ ঝামেলা নিতে চায় না বলে আমাকেই এ বোঝা বইতে হচ্ছে।'

ইতোমধ্যে টাইপিস্ট আমার সাপ্তাহিক রুটিন রেডি করে নিয়ে এসে গোপাল বাবুর হাতে দিল। তিনি এক নযর চোখ বুলিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'I wish you all success, wel come'. রুটিনের কাগজটা দেখে চিন্তিত হলাম। কারণ আইএ ফার্স্ট ইয়ার ও সেকেন্ড ইয়ার এবং বিএ ফার্স্ট ইয়ার ও সেকেন্ড ইয়ারের মোট ২৪টি ক্লাস ৬ দিনে নিতে হবে। স্কুল মাস্টারের মতো রোজ ৪/৫টা করে ক্লাস নেওয়া কঠিন ব্যাপার।

গোপাল বাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এপ্রিলের পর আইএ ও বিএ সেকেন্ড ইয়ার ক্লাস শেষ হয়ে গেলে আপনাকে সপ্তাহে মাত্র ১২/১৪টা ক্লাস নিলেই চলবে। জুলাই মাসে আবার ক্লাসের সংখ্যা ডবল হয়ে যাবে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'পলিটিক্যাল সাইন্স ও সিভিক্স-এর সব ক্লাস আমাকেই নিতে হবে?'

গোপাল বাবু বললেন, 'আপনার ডিপার্টমেন্টে আপনি একা। এদ্দিন ইকনোমিক্সের প্রফেসর আবদুল মান্নান অর্ধেক ক্লাস নিচ্ছিলেন।'

প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করে বললাম, 'স্যার ডিপার্টমেন্টে আমিই নাকি একমাত্র টিচার। এদ্দিন কিভাবে চললো? আমি নতুন হিসেবে রোজ এতগুলো ক্লাস কিভাবে নেবো?' তিনি গোপাল বাবুকে ডাকলেন এবং আমার সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। গোপাল বাবু বললেন যে, অধ্যাপক আবদুল মান্নান এদ্দিন একাই এ বিভাগ পরিচালনা করেছেন। তিনি যদি সপ্তাহে মাত্র ৬টি ক্লাস নেন তাহলেই বোঝা কমে যাবে। প্রিন্সিপাল সাহেব অধ্যাপক আবদুল মান্নানকে ডেকে গোপাল বাবুর প্রস্তাব পেশ করলে তিনি সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। সপ্তাহে আঠারটি ক্লাস আমার ভাগে রইল।

ক্লাস নেওয়া শুরু হলো

কারমাইকেল কলেজ উত্তরবঙ্গের নামকরা সেরা কলেজ। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও পাবনার সব জেলার (বর্তমানে ১২ টি জেলা) ছাত্রদের প্রধান আকর্ষণ এ

কলেজ। প্রচুর ছাত্র এ কলেজে ভর্তি হয়। ছাত্রীদের সংখ্যা কম। আইএ ক্লাসে প্রতি ইয়ারে ১০/১২ জন করে এবং বিএ ক্লাসে ৩/৪ জন করে মাত্র।

৫ ডিসেম্বর আমার প্রথম ক্লাস শুরু হয় আইএ ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে। নিয়ম অনুযায়ী টিচারকে মেয়েদের কমনরুম থেকে ছাত্রীদেরকে নিয়ে ক্লাসে ঢুকতে হয়। ক্লাস শেষে মেয়েরা নিজেরাই কমন রুমে চলে যায়। আমি ১০/১২ জন ছাত্রী নিয়ে ক্লাসে ঢুকলাম। ছাত্ররা সব দাঁড়িয়ে গেলো।

একটি চৌকির উপর টিচারের জন্য চেয়ার ও টেবিল রয়েছে। চৌকিতে উঠেই ছাত্রদেরকে Take your seat বলে আমি বসলাম। ছাত্ররা আমার সামনে সারিবাঁধা বেঞ্চগুলোতে বসলো। ছাত্রীদের বেঞ্চগুলো আমার বামপাশে সাজানো। আমার দিকে মুখ করে তারা বসলো। ছাত্ররা এক পাশ থেকে ছাত্রীদেরকে দেখতে পাচ্ছে, সামনাসামনি নয়।

৪৫ মিনিটের মধ্যে ৫ মিনিট রোল কলেই খরচ হয়ে গেলো। লেকচার শুরু করার আগে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম যে, পেছনে বেশ কিছু ছাত্র বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট ক্লাস রুম। দু'শ'-এর কাছাকাছি ছাত্র সংখ্যা। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সিভিক্স-এর ক্লাসে আইএসসি ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে এডিশনাল বিষয় হিসেবে যারা সিভিক্স নেয় তাদের কারণেই ছাত্র সংখ্যা এত বেশি হয় যে, বেঞ্চে জায়গা হয় না।

সেকালে ক্লাসে শুধু ইংরেজি বলারই নিয়ম ছিলো। ক্লাসের বাইরেও ছাত্রদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলারই রেওয়াজ পূর্ব থেকে চালু ছিলো। বিষয়ভিত্তিক লেকচার শুরু না করে তাদের নিকট ১৫ মিনিট পর্যন্ত উপদেশমূলক বক্তব্য রাখলাম। বললাম, তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। সর্বক্ষেত্রে তোমরাই দেশকে গড়ে তুলবে। তাই সব দিক দিয়ে তোমাদেরকে উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে হবে। এর জন্য একদিকে যেমন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের জন্য চেষ্টা করবে; অপরদিকে উন্নতমানের মানুষ হবার জন্য সচেতনভাবে পাঠ্যসূচির বাইরেও কিছু কাজ করতে হবে।

পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে–

১. যথাসময়ে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হতে হবে।

২. যে বিষয়ে ক্লাসে লেকচার দেব এ বিষয়ে আগেই বই পড়ে আসবে।

৩. ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও খাতায় নোট করবে।

৪. সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সহপাঠীদের সাথে বিগত ক্লাসগুলোর আলোচ্যবিষয় নিয়ে মতবিনিময় করবে।

৫. কোন বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে কাগজের টুকরায় প্রশ্ন লিখে আমাকে দিয়ে যাবে। পরদিন জওয়াব দেবো। মনে রাখবে, ভালো ছাত্ররাই প্রশ্ন করার সাহস পায়। যারা ভালোভাবে বুঝতে চায় তাদের মনেই প্রশ্ন জাগে। আমি তোমাদেরকে শেখাতে চাই। যারা শিখতে আগ্রহী তারা আমাকে কাছে পাবে।

উন্নত মানুষ হবার জন্য আমার পরামর্শ

১. মহৎ লোকদের জীবনী পড়বে। যাদের জীবনী লেখা হয় তারা বড় বলেই তাদের জীবন থেকে শেখার জন্য তাদের জীবনী বই আকারে পাওয়া যায়।

২. কলেজ লাইব্রেরীতে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার যে সব বই আছে তা নিয়মিত পড়বে।

ছাত্রদের চোখ-মুখ দেখে মনে হলো যে, আমার কথায় এরা বেশ উৎসাহ বোধ করছে। এরপর পাঠ্যসূচি থেকে এক বিষয়ে লেকচার দিয়ে পরের দিনের বিষয়টি পড়ে আসতে বলে ক্লাস শেষ করলাম। ছেলেরা বিদায় হবার সময় বেশ খুশি মনে হলো। ক্লাসের বাইরে বারান্দায় ৮/১০ জন ছাত্র ঘেরাও করে বলল, 'এমন সুন্দর উপদেশ ইতঃপূর্বে শুনিনি।' ওদের পেছনে আরও কিছু ছাত্র হাত তুলে ওদের কথার প্রতি সমর্থন জানালো।

প্রথম ক্লাসটি নিয়ে আমিও উৎসাহ এবং তৃপ্তিবোধ করলাম। শিক্ষক জীবন তো আমি শুধু পেশা হিসেবে গ্রহণ করিনি, জীবনের মিশন হিসেবেই বাছাই করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ব্রত নিয়েই এ পেশায় এসেছি। আমার সহপাঠীদের অনেকেই সাময়িকভাবে এ পেশায় যোগদান করেছে। যাদের অন্য পেশা জুটেনি তারাই দায়ে ঠেকে এ পেশায় রয়ে গেছে।

আইএ ফাইনাল পরীক্ষায় আমার সহপাঠী ইউসুফ সেকেন্ড হয়েছিলো। রংপুর কলেজে সে ইতিহাসের অধ্যাপক হলো। দু'বছরের মাথায় সে কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ১৯৫২ সালে পিএসপিতে (পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসে) যোগ দেয়। আশির দশকে ডিআইজি হিসেবে রিটায়ার্ড হয়।

আমার ধারণা যে, মানুষ গড়ার ব্রত নিয়েই শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করা কর্তব্য। শুধু জীবিকার উদ্দেশ্যে যারা এ পেশা গ্রহণ করে তাদের পক্ষে তেমন কোন অবদান রাখা সম্ভব নয়। তারা শুধু গতানুগতিক রুটিন হিসেবেই জীবন কাটায়। মানুষ গড়ার তৃপ্তি বোধ করার সৌভাগ্য তাদের হয় না।

৩৮.

টিচার্স কমন রুমে

আইএ ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে আমার প্রথম লেকচার শেষ করে টিচার্স কমন রুমে গেলাম। এক পিরিয়ড পর বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাসের অপেক্ষা করছি। আমার সাথে ৩ ডিসেম্বর একসাথে জয়েন করলেও দর্শনের অধ্যাপক কলীমুদ্দীন ও বাংলার অধ্যাপক জমীরুদ্দীন আর সকল অধ্যাপকের সাথে পূর্বেই পরিচিত ছিলেন। তারা অধ্যাপক হিসেবে বেশ কয়েক মাস কর্মরত থাকলেও তাদের নিয়োগে কিছু অনিয়ম থাকায় গভর্নিং বডি তাদেরকে নতুন করে নিয়োগ দান করে। অধ্যাপক কলীমুদ্দীন এ কলেজের ছাত্র। সিনিয়র অধ্যাপকগণ সবাই তাঁর শিক্ষক। তাই তিনি আমাকে অন্যান্য অধ্যাপকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সিনিয়র অধ্যাপকদের মধ্যে আরবীর অধ্যাপক আবুল হোসাইন এবং ফারসি ও উর্দুর অধ্যাপক সাইয়েদ ইসহাক আহমদ ছাড়া বাকি সবাই হিন্দু। দু'তিন বছরের মধ্যে তারা সবাই রিটায়ার্ড হয়ে যাবার পর তাদের স্থানে মুসলিম অধ্যাপকগণ নিয়োগ পান।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না হতো তাহলে রংপুর কারমাইকেল কলেজের হিন্দু অধ্যাপকগণের অবসর গ্রহণের পর আবার হিন্দুরাই নিয়োগ পেতেন।

১৯৪৭-এর পূর্বে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক সরকারি উচ্চপদে ছিলো। তেমনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী, বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পেশা হিন্দুদের দখলেই ছিলো। মুসলমানদের সংখ্যা মোটেই উল্লেযোগ্য ছিলো না। সামরিক বাহিনীতে মুসলমান সবচেয়ে কম ছিলো। রেল ও পুলিশ বিভাগেও একই অবস্থা বিরাজ করছিলো।

সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নতি শুরু

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বাধীন মর্যাদা লাভ করার পর সকল ময়দানে বাঙালি মুসলমানদের উন্নতির সূচনা হয়। প্রশাসনের উচ্চপদে বাঙালি মুসলমানদের অতি নগণ্য সংখ্যক থাকায় সচিব পদে অবাঙালি মুসলমান কর্মকর্তারা ভারত থেকে অপশান দিয়ে ঢাকায় আসেন। এ জাতীয় পদে আইসিএস (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোক)-ই নিয়োগ পেতো। জনাব নূরুন্নবী নামে একজন মাত্র বাঙালি মুসলমান ছিলেন যিনি সরাসরি নন, বিসিএস থেকে পদোন্নতি পেয়ে আইসিএস পদবি লাভ করেন। পুলিশ বিভাগে নিয়োজিত হিন্দুরা অপশান দিয়ে ভারতে চলে যাওয়ায় এদেশে বহু থানায় ৩ থেকে ৫ জনের বেশি পুলিশ কর্মচারী ছিলো না। জনগণের মধ্যে পাকিস্তানী জযবা ব্যাপক না থাকলে ডাকাতরা ঐ সব থানার অস্ত্রশস্ত্র লুট করে নিয়ে যেতো।

রেল বিভাগে মুসলমান কর্মকর্তা ও কর্মচারী এত অল্প ছিলো যে, হিন্দুরা চলে যাওয়ায় ভারত থেকে হিজরত করে আসা রেল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এসে ঐ শূন্য স্থান পূরণ করেন।

১৯৪৯ সাল থেকেই আইসিএস পদমর্যাদায় সিএসপি (সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান) পদের বাঙালি মুসলমানের নিয়োগ শুরু হয়। পাকিস্তানের প্রথম সিএসপি পরীক্ষায় চট্টগ্রামের শফীউল আযম সারা পাকিস্তানে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এমএ ক্লাসে আমার সহপাঠী কফীলুদ্দীন মাহমুদ, ফযলুর রাহমান, শামসুর রাহমান, ফজলুল হক মুসলিম হলে আমি জিএস থাকাকালে যিনি ভিপি ছিলে, সে মুয়াযযম হুসাইন চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন সিএসপি অফিসার হন। প্রতি বছরই তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ঢাকায় মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল ও আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ছিলো। মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো কলেজ ছিলো না। বাঙালি মুসলমান ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার এক-দু'আঙুলে গোনার বেশি সংখ্যায় ছিলো না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইস্কুলে মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য ছিলো। সেনাবাহিনীতে দু'জনের বেশি বাঙালি মুসলমান কর্মকর্তা ছিলো না। জোয়ানদের সংখ্যাও নগণ্য ছিলো।

পাকিস্তান কায়েম হবার আগে ঢাকায় কোন হাইকোর্ট ছিলো না। কোলকাতা হাইকোর্টে পূর্ববঙ্গের মুসলমান এডভোকেট কয়েকজন মাত্র ছিলেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক তাদেরই একজন। ব্যারিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। ঢাকায় হাইকোর্ট শুরু হলে পূর্ববঙ্গের মুসলমান যারা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে সিনিয়র ছিলেন তারা হাইকোর্টের এডভোকেট হবার সুযোগ পেলেন। ডিস্ট্রিক্ট কোর্টেও সর্বত্র হিন্দু এডভোকেটদেরই প্রাধান্য ছিলো। পশ্চিমবঙ্গের ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ ও ড. কামাল হোসেন মুসলমান হবার সুবাদেই তখনকার ঢাকা হাইকোর্টে এবং বর্তমান বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে উচ্চ মর্যাদার আসন পেয়েছেন। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট তো দূরের কথা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ও মুনসিফ কোর্টেও বাঙালি মুসলমান সামান্য কয়েকজন মাত্র ছিলেন।

'৪৭-এ যদি ভারত বিভাগ না হতো

যদি '৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম না হতো তাহলে বর্তমান বাংলাদেশ অবিভক্ত ভারতের একটি প্রদেশের মর্যাদাও পেতো না, অবিভক্ত বঙ্গদেশের অংশ হিসেবে গণ্য হতো। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুপ্রধান ভারত রাষ্ট্রে বাঙালি মুসলমানদের উন্নতির এ মহা সুযোগ কি হতো, যা বাংলাদেশে হয়েছে?

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ভারতের ৭ টি হিন্দুপ্রধান প্রদেশে মুসলমানদের সাথে প্রাদেশিক সরকার যে আচরণ করেছে, সে তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই ভারত বিভাগ (পাকিস্তান) আন্দোলন দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ

করে। ভারতের যে সব প্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার দাবি করা হয়নি ঐ সব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানরাও '৪৬-এর নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙালি মুসলমানরা পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মুসলমানদের চেয়েও অনেক বেশি সংখ্যায় পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছে। বাংলাদেশ ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ইংরেজের রাজনৈতিক গোলাম থাকাকালে হিন্দুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গোলামির কারণেই '৪৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে শতকরা একজন মুসলমানও ভোট দেয়নি।

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আজ যারা মেজর জেনারেল তাদের কয়জন অবিভক্ত ভারতের সেনাবাহিনীতে মেজর হতে পারতেন? বর্তমানে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার তারা কি কেউ এ পদের অধিকারী হতে পারতেন? যারা সরকারের সচিব তাদের কয়জন এ ক্ষমতার অধিকারী হতেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান প্রফেসর ও রীডারদের যে বাহিনী দেশে বর্তমানে রয়েছে তারা অবিভক্ত ভারতে কি এ সব গৌরবের অধিকারী হতে সক্ষম হতেন? ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানায় বাঙালি মুসলমানদের যে অর্জন সম্ভব হয়েছে তা কি পাকিস্তান না হলে সম্ভব হতো? সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে এবং ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে মুসলমান ব্যারিস্টার ও জাঁদরেল এডভোকেটদের সংখ্যা নিয়ে আমরা গৌরব বোধ করতে পারি। ভারত বিভাগ না হলে কি এটা সম্ভব হতো? আজ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। বিগত ৩০ বছরে সর্বক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান যথেষ্ট উন্নতি করার সুযোগ পেয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নতি না হলেও বিরাট সংখ্যায় বাঙালি মুসলমান বৈষয়িক দিক দিয়ে লাভবান হয়েছে। বাঙালি মুসলমান বিদেশেও বিরাট সংখ্যায় যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ পরিবার সচ্ছল হয়েছে।

'৪৭-এর ভারত বিভাগ কি ভুল ছিল?

এটা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয় যে, এক শ্রেণীর বাঙালি জাতীয়াবাদী ভারত বিভাগ ভুল ছিলো বলে দাবি করে। আমি ভেবে পাই না যে, এ সামান্য কথাটুকু তাদের মগজে কেন ঢুকে না যে, '৪৭-এ বিভাগ না হলে '৭১-এ স্বাধীন হওয়া কী করে সম্ভব হতো? এটা আরও বিস্ময়কর যে, কেউ '৪৭-এর কথা বললে এমন কিছু আইনজীবী এবং বুদ্ধিজীবীরাও বিরূপ মন্তব্য করেন, যারা মুসলমান হওয়ার কারণেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিজরত করে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হন। এদেশে এসে তারা যে উন্নতি ও মর্যাদা লাভ করেছে তা কি ঐ দেশে সম্ভব হতো?

রংপুর কলেজের কথা বলতে গিয়ে

রংপুর কারমাইকেল কলেজের হিন্দু সিনিয়র অধ্যাপকগণের '৫১ থেকে '৫৪ সালের মধ্যে অবসর গ্রহণের পর ঐ সব পদে বাঙালি মুসলমানগণ নিয়োগ পান। এ কথার প্রসঙ্গ টেনে লম্বা কথা বলে ফেললাম। প্রসঙ্গটা এমন যে, সংক্ষেপে বলা সম্ভব হলো না। নতুন প্রজন্মের এ দিকটা বুঝার কথা নয়। তারা তো '৪৭ পূর্ব অবস্থা জানে না।

বিএ ক্লাসে

টিচার্স কমন রুমে এক পিরিয়ড সময় উপস্থিত অধ্যাপকগণের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম। পরের পিরিয়ডে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাসে গেলাম। ৩৫-৪০ জন ছাত্রের মধ্যে ৩ জন মাত্র ছাত্রী। ছাত্রদের মধ্যে ২ জনের বয়স আমার চেয়েও বেশি মনে হলো। ৩ বছর ফেল করার পরও রেগুলার ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিতে চায়। তখনো ইংরেজি ভাষায়ই ক্লাসের সব লেকচার দেওয়া হতো। সে সুবাদে ছাত্রদের সাথে ক্লাসের বাইরেও বাংলা না বলে ইংরেজিতেই কথা বলতাম। আমার বয়সী ছাত্রদের সাথে তুমি বলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ইংরেজিতে বলাই নিরাপদ মনে করতাম। ইংরেজি ও আরবীতে এ সমস্যা নেই। বাংলায় তো আপনি, তুমি ও তুই-এর বিরাট সমস্যা। ছাত্রদেরকে তুমি বলার অভ্যাস করতে ৬ মাসেরও বেশি সময় লেগে গেলো। প্রায় ৫ বছর অধ্যাপনার পর আন্দোলনের প্রয়োজনে যখন চাকরি থেকে বের হয়ে এলাম তখন আমার ছাত্র নয় এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও সহজেই তুমি বলতাম। ছাত্র হলে আর আপনি বলতে পারতাম না।

৩৯.

রংপুর কারমাইকেল কলেজ: পরিবেশ ও মর্যাদা

ব্রিটিশ শাসনামলে অবিভক্ত বঙ্গদেশে পাঁচটি কলেজ প্রিমিয়ার (প্রধান) কলেজ হিসেবে বিখ্যাত ছিলো। কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়া বাকি ৪টি কলেজই বাংলাদেশে রয়েছে। এর মধ্যে রংপুর কারমাইকেল কলেজ একটি। ৯ একর বিস্তৃত জমির উপর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত। কলেজের বিশাল বিল্ডিং-এর চারিপাশে প্রিন্সিপালের জন্য নির্দিষ্ট বাসভবন এবং অধ্যাপকগণের জন্য বড়-ছোট বেশ সংখ্যক বাসভবন তখনও ছিলো।

কলেজটি রংপুর শহর থেকে দেড়-দু'মাইল দূরে অবস্থিত। কলেজ এলাকাটির উত্তর দিকে ঢাকা-দিনাজপুর রেল লাইন এবং বাকি তিন দিকেই গ্রাম। কলেজের মূল বিল্ডিং-এর চারিপাশে বিশাল ময়দান। কলেজের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ছাত্রদের হোস্টেল।

আদর্শ শিক্ষাঙ্গনের জন্য চমৎকার শান্ত পরিবেশ দেখে আমার খুবই ভালো লাগলো। ঢাকায় ক্লাস নাইন থেকে এমএ পাস করা পর্যন্ত কোথাও এমন পরিবেশ পাইনি। ডক্টর সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, জেনারেল জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীল থাকাকালে তিনি রংপুর কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান নাকি সম্মতি দিয়েছিলেন।

রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও সিলেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি সংগ্রহ করতে হয়েছে। রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি যোগাড় করারও প্রয়োজন নেই। কলেজের বিশাল এলাকায় বিল্ডিং নির্মাণ করার জন্য জায়গার অভাব নেই। অথচ এখনো পর্যন্ত রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম না হওয়া বিস্ময়ের ব্যাপার।

অধ্যাপকদের সামান্য বেতন

আমি মাত্র ১৫০ টাকা বেতন ও ৩০ টাকা মহার্ঘ্যভাতা মিলে মোট ১৮০ টাকায় চাকরি জীবন শুরু করলাম। ঐ সময় নতুন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে উচ্চপদের সরকারি চাকরিতে যোগদানের বিরাট সুযোগ ছিলো। ঐ সব চাকরিতে যে বেতন পাওয়া যেতো সে তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন নগণ্যই ছিলো। এর ফলে উন্নত ও আদর্শ শিক্ষাবিদ হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিরাও সরকারি সুপিরিয়র সার্ভিসকে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আমার সম-সাময়িক সিনিয়র ও জুনিয়র বেশ কয়েকজন সম্পর্কে জানি যে, তারা সম্মানজনক বেতন পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করে সিএসপি পদের আকর্ষণে চলে যেতেন না।

শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে উন্নত মানের শিক্ষক প্রয়োজন। আর উন্নত মানের শিক্ষক পেতে হলে শিক্ষকদের বেতন এমন পরিমাণ হওয়া প্রয়োজন, যাতে যারা এ পেশাকে পছন্দ করে তারা যেনো ভালো বেতনের জন্য অন্য পেশায় যেতে বাধ্য না হয়।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন যারা শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে তাদের মধ্যে মেধাবী ব্যক্তিরা কয়েক বছর পর্যন্ত সরকারি চাকরির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। না পেলে বাধ্য হয়েই শিক্ষকতার পেশায় থেকে যান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস এবং ইংরেজি বক্তৃতায় Burk of the East উপাধি পেয়েও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের বড় কর্মকর্তা থাকাকালে জনাব আযীযুল হকের সাথে ৬০ বা ৬১ সালে আমার দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার সুনাম যথেষ্ট শুনেছি। আপনার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে হলো না কেনো? এখানে আপনাকে মানায় না।' সেকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে Edmund Burk শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর সাথে তুলনা করেই তাঁকে ঐ উপাধি দেওয়া হয়।

তিনি বেদনার সাথে জানালেন, 'যদি স্বপরিবারে স্বাচ্ছন্দ্যে চলার মতো বেতন পেতাম তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়েই থেকে যেতাম।'

আমার সহপাঠী কফীলুদ্দীন মাহমুদ ৪৮ সালে এমএ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেকচারার হিসেবে যোগদান করে। যদি ভালো বেতন পেতো তাহলে সিএসপি হয়ে অন্য পেশায় যেতো না। এ রকম বেশ কিছু লোকের কথা আমার জানা আছে।

আমার কথা আলাদা। আমি তো মিশনারী মনোভাব নিয়ে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেছিলাম। বেতনের অংক আমার নিকট বড় বিষয় মনে হলে আমি তাদের মতো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতাম।

বিএ ফাইনাল ক্লাসের ছাত্রদের আমি শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতাম। তাদেরকে বলতাম, এ পেশাটি এমন যে, পেশার খাতিরেই নৈতিক মান বজায় রাখার প্রয়োজন হয়। ঘুষ ও দুর্নীতি থেকে বেঁচে থাকা যায়, সারাজীবন ছাত্রদের ভক্তি-শ্রদ্ধা পাওয়া যায়, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদেরকে চরিত্রবান হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়।

নীলফামারী জেলার ডিমলা হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেড মাস্টার আমার প্রিয় ছাত্র আব্দুল মজীদ (তার বর্তমান বয়স ৭৩ বছর) কিছুদিন পূর্বে আমার সাথে দেখা করে গেলো। বললো, 'স্যার শুনে খুশি হবেন যে, আমি বৃহত্তর রংপুরে ২১টি স্কুল কায়েম করেছি।' বুঝলাম, তার দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবন সম্পর্কে সে গর্বিত।

রংপুর কলেজে মাত্র কয়েক বছর শিক্ষক ছিলাম। ইসলামী আন্দোলনের টানে ঐ পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য না হলে ঐ পেশাতেই সারাজীবন কাটাতাম। ঐ পেশাটি আমার এতো প্রিয় ছিলো যে, বহু বছর মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখতাম যে, কলেজে পড়াচ্ছি বা কলেজে যাচ্ছি। শিক্ষকতা পেশার আরও একটি তৃপ্তি রয়েছে। মাত্র কয়েক বছর কলেজে শিক্ষকতা করেছি। বৃহত্তর রংপুর ও বগুড়ায় সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক সফরে গেলে আমার ছাত্র পরিচয় দিয়ে দেখা করতে যারা আসতো তাদের মধ্যে শিক্ষকের সংখ্যাই বেশি। তাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কি কোনো মূল্য নেই? আমি এতে যে তৃপ্তি বোধ করি তা বস্তুগত মূল্যের চেয়েও অনেক বড়। ঢাকায় এমন বেশ সংখ্যক ছাত্র পেয়েছি, যারা সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

আমার আপন চাচাত ভাই কুদরতে খোদা বরিশাল বিএম কলেজে দীর্ঘকাল ফিলসফীর শিক্ষক ছিলো। প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ঝালকাঠি সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে রিটায়ার করার পর ঢাকা শহরে একটি প্রাইভেট কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মরত। আমার গ্রাম বীরগাঁয়ের হাইস্কুল কমিটির সভাপতির দায়িত্বও পালন করছে। এ স্কুলটি আমার চাচা মুসলিম লীগ নেতা এডভোকেট শফীকুল ইসলামের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়ই স্থাপিত হয়েছে। তার কলেজ ও ঐ স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাকে সরকারি কর্মকর্তাদের নিকট যেতে হয়।

আমার ঐ ভাইটি অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তিবোধ নিয়ে আমাকে জানালো যে, সে যে অফিসেই গিয়েছে কর্মকর্তাদের মধ্যে তার ছাত্র পাওয়ায় দ্রুত কাজ সমাধা করতে সক্ষম হয়েছে। যাদেরকে অন্যরা স্যার সম্বোধন করে তারাই তাকে 'স্যার' বলে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

বিগত আওয়ামী শাসনামলে আমাদের গ্রামের এক ছেলে বিসিএস পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ইন্টারভিউ দিতে গেলো। তার দুর্ভাগ্য যে, ওর পিতা আমার নামে তার নাম রেখেছেন। ওর পিতা গ্রামীণ সম্পর্কে আমার চাচা, যদিও বয়সে আমার ছোট। সে হিসেবে আমাকে সে 'ভাইসাব' ডাকে। ইন্টারভিউতে ওর নাম দেখেই উষ্মার সাথে কমিশনের এক সদস্য মন্তব্য করেন, 'নিশ্চয়ই তোমার বাবা রাজাকার। তা না হলে এ নাম রাখবে কেনো? তোমার ইন্টারভিউ নেওয়া হবে না।' গত বছর সে আবার পরীক্ষা দিলো। ইন্টারভিও পেলো। ইন্টারভিউর পূর্বে আমার ঐ চাচাত ভাইটি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ঐ ছেলেটিকে নিয়ে গেলো। জানতে পারলো যে, কমিশনের মেম্বারদের একজন তার ছাত্র। আমার নামের সাথে মিল থাকার কারণে ইন্টারভিউ নিতে অস্বীকার করা যে অন্যায় সে কথা বলার পর এবার নিতে রাজি হলো।

আমাদের গ্রামের স্কুল সংলগ্ন একটি ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারের জন্য জায়গা যোগাড় করে দেওয়া সত্ত্বেও ১০ বছর থেকে এমনি পড়ে আছে। এলাকার এমপি আওয়ামী লীগের হওয়ায় এর জন্য চেষ্টা করেনি। এবার আমার ভাইটি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে গেলে তাকে দেখেই উক্ত কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে গেলো। আমার ভাই তাকে ছাত্র হিসেবে চিনতে পারেনি। তিনি বললেন, স্যার, কী মনে করে এসেছেন? তখন বিষয়টা তাকে বলা হলে তিনি বললেন, এ বছরের কোটা শেষ হয়ে গেছে। মন্ত্রী দুটো কেস রিজার্ভ রেখেছেন। আমার ভাই বলল, এ থেকে দিয়ে দাও। কর্মকর্তা বললেন, মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস না করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না। যা হোক শেষ পর্যন্ত কাজটা হলো।

ছাত্র যত বড়ই হয়ে যাক না কেনো প্রাইমারী শিক্ষকও তার স্যারই থাকে। আমি এমএ ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে আমার গ্রামের প্রাইমারী শিক্ষককে পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। এটাই সমাজের প্রথা। অবশ্য এ প্রথা আর পালন করছি না বহু বছর থেকে। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে দোয়া করতে থাকলেন।

আমার আব্বা বলতেন, কেউ চায় না যে, অপর কেউ তার থেকে বড় হোক। কিন্তু পিতা আশা করেন যে, তার সন্তান তার থেকে বড় হোক এবং শিক্ষকও তার ছাত্র বড় হয়েছে জানলে গৌরব বোধ করে। যারা সত্যিকার শিক্ষক তারা ছাত্রদের কাছ থেকে পিতার মতোই সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। শিক্ষকতার পেশা আমার নিকট সেরা পেশা। এ পেশা মানুষ গড়ার মহান পেশা।

রাসূল (স) বলেছেন, 'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।' অবশ্য এটা তাঁর পেশা হিসেবে বলেননি। তিনি মানব জাতির শিক্ষক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি সবার আদর্শ শিক্ষক।

৪০.

রংপুরকে ভালোবেসে ফেললাম

রংপুরই আমার প্রথম ও শেষ কর্মস্থল। চাকরি জীবন ওখানেই শুরু এবং সমাপ্ত। এমএ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার আগে মাস দেড়েক যে একাউনটেন্ট জেনারেল অফিসে ছিলাম তা কর্মস্থল হিসেবে গণ্য নয়। ঐ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সামনে যোহরের নামাযের সময় তাবলীগে দীনের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই একাউনটেন্ট জেনারেল সাইয়েদ মুহাম্মদ জামিল আমাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইউডি ক্লার্ক হিসেবে অবশ্য আমি বিভাগীয় সুপারিনটেনডেন্টের সন্তোষও অর্জন করেছিলাম। রংপুর কলেজ, শহর, জেলা ও মানুষ আমার প্রিয় মনে হলো। কলেজ ক্যাম্পাসতো রীতিমতো আকর্ষণীয়ই ছিলো। আবাসিক ব্যবস্থা থাকায় বাসা থেকে হেঁটে ৪/৫ মিনিটের মধ্যেই কলেজে পৌঁছা যেতো। বিকেলে ও সকালে কলেজের প্রশস্ত ময়দানে হাঁটতে বেশ ভালো লাগতো। ছাত্ররা খুবই ভদ্র ও নম্র ছিলো। অধ্যাপকদের সাথে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠলো। অধ্যাপকদের মধ্যে যাদের পরিবার সাথে ছিলো না তারা যে বাসায় মেস করে থাকতেন আমি তাদের সাথেই বসবাস শুরু করি। আমি তখনও ব্যাচেলর। অন্যদেরকে আমি বলতাম ম্যারেড ব্যাচেলর। তাদের একজন বাংলার অধ্যাপক জমিরুদ্দীন আহমদ।

আমার প্রিয় সাইকেল

কলেজ থেকে রংপুর শহর মাইল দেড়েক দূরে। যাতায়াতের জন্য রিকসাই একমাত্র সম্বল। ঢাকা থেকে আমার প্রিয় হারকিউলিস সাইকেলটি রংপুর নিয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত রিকসাই শহরে যেতাম। সাইকেলটি প্রিয় বলে উল্লেখ করলাম। ঐ সময় বাজারের সেরা সাইকেল ছিলো হারকিউলিস। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হিন্দু অধ্যাপক (নামটা মনে আসছে না) অবসর গ্রহণ করে কোলকাতা চলে যাবার পূর্বে তার প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবে আমাকে জানালেন যে, তাঁর সাইকেলটা বিক্রি করতে চান, আমি যেন গ্রাহক যোগাড় করে দেই। আমি নিজেই নেবো বলায় তিনি খুশি হয়ে বললেন যে, আমি খুব যত্ন করে রাখতাম বলে নতুনের মতোই দেখায়। তুমিও আমার প্রিয় সাইকেলটিকে যত্ন করবে। সঙ্গে কাঠের স্ট্যান্ড রয়েছে। টায়ারের উপর যাতে চাপ না পড়ে সে জন্য স্ট্যান্ডে রাখবে। যে কোন জিনিসের যথাযথ যত্ন নিলে বহুদিন টেকসই হয়। ১৯৪৯ সালে ২৫০ টাকায় সাইকেলটি কিনলাম।

১৯৫৫ সালে কলেজ থেকে চলে আসার পর ঢাকায়ও সাইকেলেই চলাচল করতাম। যত্নও আগের মতোই করতাম। আমার এক শালা সাইকেলটা ব্যবহার করতো। সম্পর্কটা এমন যে, চাইলে না দিয়ে পারা যায় না। সে একবার নিয়ে গেলো এবং সাইকেল ছাড়াই বাড়িতে ফিরে এলো। জানালো যে, অমুক জায়গা থেকে সাইকেল

চুরি হয়ে গেলো। মনে খুবই দুঃখ পেলাম, কিন্তু প্রকাশ করার ভাষা পেলাম না। আমার মা-শা আল্লাহ ৪ জন শালা। তাদেরকে কারো সাথে পরিচয় করাতে হলে 'শালা সাহেব' বলে জানাই। শুধু শালা বললে গালি হয়ে যায় কিনা তাই আমি এ পরিভাষাটা আবিষ্কার করি। অন্য কেউ এ পরিভাষা ব্যবহার করে বলে শুনিনি। অন্যরা বিভিন্ন পরিভাষায় পরিচয় করায়। কেউ বলেন, 'বড় কুটুম্ব', কেউ বলেন, 'স্ত্রীর ভাই', 'ছেলের মামা' ইত্যাদি। আমার আবিষ্কৃত পরিভাষাটা আশা করি অনেকেই পছন্দ করবেন। এর মাধ্যমে মধুর কৌতুক, হালকা রসিকতা, নির্দোষ আনন্দ ও সস্নেহ ঠাট্টা একসাথে ভোগ করা যায়।

রংপুরের মানুষ

আমার কর্মজীবন রংপুরেই শুরু হলো। জনগণের সাথে ওঠা-বসার সুযোগ সেখানেই প্রথম পাই। তাবলীগী সফরে একজায়গায় ১/২ দিনের বেশি থাকা হতো না বলে বহু লোকের সাথে যোগাযোগ হলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে উঠা সম্ভব ছিলো না। তাবলীগী জামায়াতের লোকজন নিয়ে কোনো মসজিদে যেয়ে এক বা দু'দিন থেকে যা কিছু করা হয় তাতে কারো সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠে না। অবশ্য যারা জামায়াতে সময় দেবার জন্য সাথে আসে তাদের সাথে অবশ্যই ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে।

রংপুরের সাধারণ মানুষের সাথে মিশবার সুযোগ বিভিন্নভাবে পেয়েছি। তাদের সরলতা, আন্তরিকতা ও ভদ্রতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। কলেজ কম্পাউন্ড সংলগ্ন ছোট্ট বাজারে নিজেই বাজার করতাম। আব্বা বলতেন, যদি ভালো জিনিস পেতে এবং খেতে চাও তাহলে কাজের লোক দিয়ে বাজার করাবে না, নিজেই পছন্দমতো কিনবে। ছাত্রজীবনে ছুটিতে চান্দিনা গেলে আমিই মাছ-তরকারি বাজার করতাম। আমরা কোনো ভাই বাড়িতে না থাকলে আব্বা নিজেই বাজার করতেন। রংপুরে আমার ছোট ভাই মাহদী (আইএসসি ক্লাসের ছাত্র) আমার সাথে থাকতো। তাকে বাজারে না পাঠিয়ে আমিই বাজারে যেতাম। ডাল, চাল, লবণ ও মসল্লার কয়েকটি ছোট দোকান সেখানে ছিলো। যে দোকানে বয়স্ক একজন বিক্রেতা ছিলেন সেখান থেকেই এ সব কিনতাম। তার সাথে এমন সম্পর্ক হয়ে গেলো যে, এ সব জিনিসের তালিকা ও পরিমাণ লিখে কাজের ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে তিনি ওর হাতেই জিনিস পাঠিয়ে দিতেন। আমি এক সময় যেয়ে টাকা দিয়ে আসতাম।

কোন সময় ছাত্রের অভিভাবক দেখা করতে আসতেন। সাথে ছেলেটিকে নিয়ে এসে নসিহত করতে বলতেন। যারা আসতেন তাদের আচরণে সামান্য কোন ত্রুটিও দেখিনি। আমি শুক্রবারে বিভিন্ন মসজিদে নামায পড়তে যেতাম। 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন' এমন ঘোষণা মুসল্লীদের মধ্যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতো, যার ফলে নামাযের পরেও লোকেরা চলে যেতো না। কিছুদিন পর

মসজিদের পক্ষ থেকে জুমআর নামায পড়াবার দাওয়াত আসা শুরু হলো এবং নামাযের পূর্বেই বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হলো। মসজিদে তাবলীগ জামায়াতের ইউনিট করাই আমার লক্ষ্য ছিলো। তাই নামাযের পর মসজিদের ইমাম, মসজিদ কমিটির দায়িত্বশীলগণ ও আগ্রহী মুসল্লীদের সাথে আলাপ-পরিচয় করার জন্য বিলম্ব করতাম। এভাবে অনেকের সাথে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে লাগলো।

তাদের আন্তরিক সহযোগিতা, নিষ্ঠা ও আগ্রহে আমি অভিভূত। তাদের মহব্বত আমাকে বাধ্য করেছে তাদেরকে ভালোবাসতে। কয়েকটি মসজিদে তাবলীগ জামায়াতের ইউনিট কায়েম হবার পর, পরামর্শক্রমে মাহিগঞ্জ মসজিদকে রংপুরের তাবলীগী কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

কলেজে নামাযের ব্যবস্থা

যোহরের নামাযের জন্য এক পিরিয়ড (৪৫ মিনিট) ছুটি দেওয়া হতো। শিক্ষকগণ ক্যাম্পাসে বাসা থাকায় যারা নামাযী তারা সেখানে যেয়েই নামায আদায় করতেন। ছাত্রদের মধ্যে যারা নামাযী তারা নিকটবর্তী লালবাগ বাজার মসজিদে যেয়ে নামায পড়তো। কতক ছাত্রকে কলেজের প্রশস্ত ময়দানে ঘাসের উপরই নামায পড়তে দেখে আমি অনুভব করলাম যে, কলেজ বিল্ডিংয়ের নিকটই নামাযের জন্য একটা কামরা বরাদ্দ করা প্রয়োজন। বাজার মসজিদটি কলেজের সীমানার বাইরে হওয়ায় একটু দূরেই বলা যায়। কলেজ সংলগ্ন নামাযের ব্যবস্থা হলে নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাও সহজ হবে মনে করে আমি এর উদ্যোগ নিলাম। প্রিন্সিপালকে বলে মূল কলেজ ভবনের পাশে টিউটরিয়েল ক্লাসের জন্য বেশ কয়টি কামরা-বিশিষ্ট দালানের একটি কামরা নামাযের জন্য বরাদ্দ করা সম্ভব হলো। সেখানে একটা ব্লাকবোর্ডের ব্যবস্থা হয়ে গেলো। ৪৫ মিনিট সময়ের মধ্যে নামাযের জন্য ২০/২৫ মিনিট ও আলোচনার জন্য ২০ মিনিট বরাদ্দ করা হলো। অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ ওখানে নামাযের জন্য হাজির হতেন না। আমিই ইমামতি করতাম। ছাত্রদের কেউ আযান দিতো। কলেজে আমার ক্লাস না থাকলেও যোহরের নামাযে আমি অবশ্যই সেখানে হাজির হতাম।

প্রেয়ার রুমে নিয়মিত আমার ইসলামী ক্লাস চলায় নামাযীর সংখ্যা বাড়তে থাকলো। আমি ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করে ইসলাম সম্পর্কে ছাত্রদেরকে জ্ঞানদান করার সুযোগ পেলাম। কলেজে দু'জন আরবীর অধ্যাপক এবং একজন ফারসির অধ্যাপক ছিলেন। তারা সবাই মাওলানা ছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের নিকট আমি ইসলামের অধ্যাপক হিসেবে গণ্য হওয়ায় ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য অবাধে আমার সাথে দেখা করতো।

বার্ষিক মিলাদের প্রধান অতিথি

ঐ সময়ে বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়ার সকল হাইস্কুলের ভালো ছাত্ররা রংপুর কারমাইকেল কলেজেই পড়তে আসতো। পাবনা ও রাজশাহীর ছাত্ররা রাজশাহী সরকারি কলেজেই যেতো। বগুড়া আযিযুল হক কলেজ তখনও নতুন। পুরানা নামকরা বড় কলেজ হিসেবে রংপুর কারমাইকেল কলেজই উত্তরবঙ্গের সেরা কলেজ ছিলো। এ কয় জেলার যে সব ছাত্র এ কলেজে পড়তো তারা যে সব স্কুল থেকে পাস করেছে ঐসব স্কুলের বার্ষিক মিলাদে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে নেবার হিড়িক পড়ে গেলো।

ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই সকল স্কুল ও কলেজে 'এনুয়েল মিলাদ' একটি নিয়মিত অনুষ্ঠান হিসেবেই পালিত হয়ে আসছে। এ অনুষ্ঠানে ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য অতিথি বক্তা নেবার রেওয়াজও চলে এসেছে। এ জাতীয় অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমার ইসলামী ক্লাসের ছাত্ররা নেবার ব্যবস্থা করায় শীতের মওসুমে মাসে কমপক্ষে ২/৩ টা দাওয়াত কবুল করতে হতো। এ সব অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও এলাকার গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হতেন।

জামায়াতে ইসলামী পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনে শরীক হবার পর পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের যে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছি ১৯৫৪ সালে জামায়াতে যোগদানের পূর্বে এমনটা পাইনি। তবে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (র) লেখা ওয়াজ, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর (র) অনূদিত যে সব বই পড়েছি এবং তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যামে যতটুকু শেখার সুযোগ পেয়েছি এর ভিত্তিতেই আমার বক্তব্য সাজিয়ে পরিবেশন করতাম।

শ্রোতারা যে আমার বক্তব্য পছন্দ করতো তা উপলব্ধি করে আমিও উৎসাহবোধ করতাম। ফলে মিলাদের দাওয়াত বাড়তেই থাকলো এবং আমিও আগ্রহের সাথে দাওয়াত কবুল করতে থাকলাম। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাত্র সোয়া চার বছর ঐ কলেজে শিক্ষকতা করেছি। এ সময়ে উত্তরবঙ্গে যে কত হাইস্কুলে গিয়েছি এর কোন হিসাব দিতে পারবো না। অজপাড়াগাঁয়ে গেলাম। যাতায়াতে কোনো সময় এমনও হয়েছে যে, ট্রেনে যেয়ে কিছু রাস্তা রিকসায় যাবার পর ৩/৪ ঘণ্টার পথ গরুর গাড়িতে যেতে হয়েছে। বর্তমানে লালমনিরহাট জেলার ভুরুঙ্গামারিতে হাতির পিঠে বসে গিয়েছি। কোথাও চর এলাকায় ঘোড়ায় চড়তে হয়েছে। যাতায়াতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।

৪১.

প্রধান অতিথির বিচিত্র অভিজ্ঞতা

রংপুর কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের আবদার রক্ষা করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের বহু হাই স্কুলের বার্ষিক মিলাদে প্রধান অতিথি হিসেবে গিয়েছি। এ সব মাহফিলে এলাকার নেতৃস্থানীয় লোকেরাই আমন্ত্রিত হন। থানা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান হলে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, অন্যান্য স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রদের অভিভাবক, ব্যবসায়ী, ওলামা ইত্যাদির সমাগম হয়। থানা কেন্দ্রের বাইরের ইউনিয়ন থেকেও গণ্যমান্য লোক আসেন। তখনও প্রতি ইউনিয়নে হাই স্কুল কায়েম হয়নি। যে ইউনিয়নে হাই স্কুল আছে তাতে আশেপাশের ইউনিয়নের ছাত্ররাও পড়ে। তাই কয়েকটি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ লোকই অনুষ্ঠানে শরীক হয়।

সেকালে স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট হতেন থানার সার্কেল অফিসার (বর্তমানে নির্বাহী অফিসার বলা হয়)। বেশ কয়েকটি স্কুলের মিলাদ অনুষ্ঠানে সার্কেল অফিসারকেও পেয়েছি।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে আমার বক্তৃতার পর স্কুলের হেড মাস্টার উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এটুকু সামান্য পরিচয় আমার ইসলামী আন্দোলনের জীবনে খুবই কাজে লেগেছে। জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত জনসভা বা সুধী সমাবেশে এমন বেশ কিছু লোক কাছে এসে আন্তরিকভাবে হাত মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, অমুক সালে অমুক স্কুলের মিলাদে আপনার সাথে পরিচয় হয়েছিলো।

আরো লক্ষ্য করেছি যে, জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল হিসেবে উত্তরবঙ্গে সফরে গেলে হাই স্কুলের শিক্ষক বা হেড মাস্টার হিসেবে আমার বহু ছাত্রের দেখা পেয়েছি, যারা বলেছে, স্যার আপনার উপদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেছি এবং এ পেশার মর্যাদা উপলব্ধি করে তৃপ্তিবোধ করছি।

প্রথম অভিজ্ঞতা

কুড়িগ্রাম শহরের প্রধান হাই স্কুলের বার্ষিক মিলাদে আমি প্রধান বক্তা হিসেবে গেলাম। উত্তরবঙ্গেরই একজন প্রখ্যাত ওয়ায়েজ অন্যতম বক্তা হিসেবে গেলেন। পরের দিন নাস্তার পর আমরা দু'জনে একই ট্রেনে ফিরে আসার কথা। আমি রংপুর স্টেশনে নেমে যাব এবং তিনি ঈশ্বরদি যাবেন। আমরা দু'জন পাশাপাশি পৃথক দু'কামরায় রাতে ছিলাম। নাস্তার পর মাওলানা সাহেব পাশের কামরায় গেলেন রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতির জন্য। স্কুলের হেড মাস্টার সাহেব পাশের কামরা থেকে একটু বিব্রত চেহারা নিয়ে আমার সামনে কাচুমাচু হয়ে বললেন, 'স্যার, মনে কিছু

নেবেন না। আমরা সামান্য সম্মানী যোগাড় করতে পেরেছি। এটুকু দয়া করে গ্রহণ করুন।' এ কথা বলে কিছু টাকা আমার সামনে পেশ করলেন।

আমি বললাম, 'আমি তো ভাই বক্তৃতা বিক্রি করি না। দীনের কিছু কথা বলার জন্য আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন। আমি সে দাওয়াত কবুল করেছি। আমি যদি জানতাম যে, আমাকে টাকা অফার করে অপমানিত করবেন তাহলে আমি দাওয়াত কবুলই করতাম না।'

অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তিনি বললেন, 'স্যার, আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আমরা যাদেরকে ওয়াজ করার জন্য আনি তাদেরকে সম্মানী স্বরূপ কিছু দিয়ে থাকি। একটু আগেই পাশের কামরায় মাওলানা সাহেবকে এ পরিমাণ টাকাই দিয়েছি। টাকার পরিমাণ কম বলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই ভয়ে ভয়ে কাচুমাচু হয়ে আপনাকে টাকা দিতে এলাম। আর আপনি কিনা টাকা সাধার কারণে অসন্তুষ্ট হলেন। একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা।

আমরা এ সব কথা বলাবলি করার সময় মাওলানা সাহেব যে এ কামরায় ঢুকে কথাগুলো শুনলেন তা আমরা লক্ষ্য করিনি। স্টেশনে রওয়ানা হবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়ে তিনি আমার কামরায় এসে আমাদের অজান্তে ঢুকে পড়ে এ কথা কয়টি শুনে এমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন যে, আমি তার লজ্জাবনত চেহারা দেখে কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য আমি বললাম, 'হেড মাস্টার সাহেব! আমার টাকার প্রয়োজন নেই, মাওলানা সাহেবের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। তাই এ টাকাগুলোও তাকেই দিয়ে দিন।' মাওলানা সাহেব হাত জোড় করে বললেন, 'আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, টাকার জন্য কখনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবো না।'

আমরা ট্রেনে পাশাপাশিই বসা ছিলাম। তিনি লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। সহজভাবে কথা বলার জন্য পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বললাম, 'মাওলানা সাহেব, ইসলামী সমাজব্যবস্থা চালু না থাকার কারণেই এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। মসজিদে যারা নামাযে আসে তাদের অনেকেই যদি ইমামতি করার যোগ্য হতো তাহলে বেতনধারী ইমামের দরকার হতো না। নিয়মিত নামায পড়াবার জন্য বেতন দিয়ে ইমাম না রাখলে চলে না। ইমাম সাহেব তো এ চাকরি না নিলেও কোথাও না কোথাও নামায পড়তেন। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াবার দায়িত্ব নিলে তাকে যে সময় খরচ করতে হয় তাতে অন্য কোনভাবে চাহিদা অনুযায়ী আয়-রোযগার করা সম্ভব হয় না। কেউ মারা গেলে ইমাম সাহেবকেই জানাযা পড়াতে হয়। মৃতের ছেলে, ভাই বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যদি জানাযা পড়াতে সক্ষম হয় তাহলে ইমাম সাহেবকে সময় দিতে হয় না। এভাবেই সমাজে বেতনধারী ইমাম নিয়োগ করতে হচ্ছে।

জনসাধারণকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এর জন্য যদি সমাজ থেকে মুবাল্লিগ নিয়োগ করা হতো এবং তাদেরকে উপযুক্ত সম্মানী দেবার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে ওয়ায়েজগণকে ওয়াজ বিক্রি করে রোযগার করতে হতো না। ইসলামী সমাজ কায়েম হলে সরকারি ব্যবস্থায়ই ওয়ায়েজগণকে তাবলীগে দীনের দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হবে। সে ব্যবস্থা নেই বলেই ওয়ায়েজগণ টাকা নিয়ে ওয়াজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

সমাজে ওয়াজের চাহিদা আছে বলেই এ দেশে এত ওয়ায়েজ আছে। মসজিদে নিয়মিত নামাযের প্রয়োজন আছে বলে বেতন দিয়ে ইমাম নিয়োগ করতে হচ্ছে।

আমার ধারণা যে, কোন মুখলিস আলেমের জন্যই ওয়াজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা মোটেই উচিত নয়। আয়ের কোন পথ তালাশ করা কর্তব্য। রাসূল (স) ইরশাদ করেন, 'অন্যান্য ফরযের পর হালাল রুযি তালাশ করাও ফরয।' যদি ওয়ায়েজগণ শুধু যাতায়াত খরচ নিয়ে ওয়াজ করেন এবং ওয়াজের বিনিময়ে টাকা কামাই না করেন তাহলে তাদের জন্য এটা সবচেয়ে কল্যাণকর।

রংপুর স্টেশনে পৌঁছা পর্যন্ত আমি কথা বলতে থাকলাম এবং তিনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শুনতে থাকলেন। স্টেশনে নেমে যাবার পূর্বে তাঁর সাথে নিবিড়ভাবে কোলাকুলি করলাম। তিনিও অত্যন্ত মহব্বতের সাথে আমাকে বিদায় দিলেন। ৭০ সালে তিনি নেযামে ইসলাম পার্টির টিকেটে এম.এন. এ পদপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। তখন ঢাকায় তাঁর সাথে শেষ দেখা। '৭১-এর শেষ দিকে তিনি শহীদ হন। তিনি দেখতে বড়ই সুপুরুষ ছিলেন এবং বক্তা হিসেবেও অত্যন্ত যোগ্য ও জনপ্রিয় ছিলেন।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা

হাই স্কুলের মিলাদ মাহফিলে ওলামায়ে কেরামও আসতেন। আমার বক্তৃতা যারা পছন্দ করতেন তারা তাদের মাদ্‌রাসায়ও দাওয়াত করতেন। জয়পুরহাট থেকে চার মাইল দূরে হানাইল মাদ্‌রাসায় দাওয়াত পেলাম। বক্তৃতার পর গণ্যমান্য লোকদের সাথে পরিচয়ের সময় জয়পুরহাট হাই স্কুলের হেড মাস্টার জনাব আব্বাস আলী খান বিশেষ আগ্রহের সাথে কথা বলতে চাইলেন। খাবার সময় আমার পাশেই বসলেন। তিনি এ ঘটনাটি নিজেই একটি ছোট্ট প্রবন্ধে লিখলেন। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে (রমযানে) বিদেশী এবং বে-আইনী অবস্থানকারী হিসেবে আমাকে গ্রেফতার করা হয়।

'নবীনগর ফোরাম' নামক একটি সংগঠন কায়েম হয়। এর সভাপতি হন আমার ছোটভাই ডাক্তার মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্‌যাম এবং মহা-সচিব ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ার। এ ফোরামের উদ্যোগে আমার কারামুক্তির দাবিতে 'মযলূম' নামক একটি চমৎকার ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। এতে ইসলামী আন্দোলনের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লেখা প্রকাশিত হয়। এর পয়লা প্রবন্ধটিই জনাব আব্বাস আলী খানের রচিত। এর শিরোনাম হলো 'সঠিক পথের সন্ধান'।

ঘটনাটি তাঁর ঐ প্রবন্ধ থেকেই তুলে দেওয়া হলো:

আমি একজন শিক্ষক এবং ছাত্রও। স্থানীয় একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সেই সাথে এলমে তাসাউফের দুর্দান্ত ছাত্র। পীর সাহেব বলেন, উচ্চশ্রেণীর ছাত্র। তাই সবকের উপর সবক এবং বহু সলুক অতিক্রম করে তাঁর দৃষ্টিতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ। কিন্তু মনকে জিজ্ঞেস করে তার জবাব পেতুম না। সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যকে জানার পিপাসা কমেনি। মনের মধ্যে নানা জিজ্ঞাসা। ঈপ্সিত বস্তু যেন নাগালের বাইরে।

উনিশশ' চুয়ান্নর ডিসেম্বর মাস। বার্ষিক পরীক্ষার ঝামেলা শেষ হয়েছে। বড়দিনের বন্ধ সন্নিকট।

স্থানীয় একটি মাদ্‌রাসায় ধর্মসভা— ইসলামী জলসা। প্রধান বক্তা ডক্টর শহীদুল্লাহ। বিশেষ বক্তা অধ্যাপক গোলাম আযম। রংপুর কারমাইকেল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ অসুস্থ। টেলিগ্রাম এসেছে আসতে পারবেন না। আসছেন শুধু গোলাম আযম। মাদ্‌রাসার সেক্রেটারি বার বার অনুরোধ জানিয়ে গেলেন উক্ত সভায় যোগদান করতে। বললেন, স্যার অবশ্যই যাবেন কিন্তু। সেক্রেটারি আমার এককালীন ছাত্র। অনুরোধ উপেক্ষাই বা করি কি করে?

অগত্যা বিকেলে রওয়ানা হলুম দু'চাকার সাইকেলে চড়ে। বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরে সভাস্থল। বেলা ডুবতে তখনো কিছুটা বাকি। সভার বক্তা কোন পীর বা মাওলানা নন। তাঁরা সাধারণত মঞ্চে ওঠেন রাতের বেলায়। তাই সন্ধ্যার আগে সভায় লোক তেমন জমে না। কিন্তু বক্তা এবার দুই জাঁদরেল শিক্ষাবিদ। তাই শ্রোতারা এসেছেন আগেভাগেই।

দেখলাম অধ্যাপক গোলাম আযম বক্তৃতা করছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হলেও দাড়ি আছে। মাথায় বাবরী চুল আছে। চেহারা গৌর বর্ণের। আকর্ষণীয়। কালেমা তাইয়েবার ব্যাখ্যা করছেন বড় সুন্দর মনোমুগ্ধকর ভাষায়। শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনছেন।

আমারও বড্ডো ভালো লাগলো। খোশ্ ইলহানে কালামে পাকের আয়াত আবৃত্তি করছেন ঘন ঘন। মনে হলো কেরাত শিল্পও রপ্ত করেছেন। সন্ধ্যার পরেও প্রায় ঘণ্টাখানেক বললেন। শ্রোতারা আরো শুনতে চান। ড. শহীদুল্লাহর অভাবটাও মেটাতে চান। কিন্তু তিনি রাতের ট্রেনেই রংপুর ফিরে যাবেন বলে শেষ করলেন।

একসাথে খেতে বসেছি। খেতে খেতে পরস্পরের পরিচয় এবং আলাপচারিতাও হলো। তিনি কলেজের শিক্ষক, আমি স্কুলের। মিল তো কিছুটা আছেই; বরং একই পেশার লোক। তাই মনের মিল সহজেই হওয়ার কথা।

বিদায়ের আগে কিছু বই-পুস্তক কিনলুম তাঁর কাছ থেকে। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর লেখা সে বইগুলো।

বললাম, বগুড়া জেলায় জামায়াতে ইসলামীর কোন কাজ আছে কি? বললেন, আলবৎ আছে। বগুড়া শহরে শায়খ আমীনুদ্দীন বলে একজন দায়িত্বে রয়েছেন।

মাওলানা মওদূদীর একখানা বই পড়েছিলুম কিছুকাল আগে। উর্দু বই খুৎবাত। ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ প্রভৃতির মর্মকথা চমৎকার হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লেখা। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোন জামায়াত আছে, আন্দোলন আছে, জান নেসার (উৎসর্গীকৃত) কর্মীবাহিনী আছে তা আমার জানা ছিলো না। এ নামেরই এক ব্যক্তিকে গত বছর মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়েছিলো। সংবাদপত্রে দেখেছিলাম।

তাই আগ্রহ বেড়ে গেলো তাঁর জামায়াত ও আন্দোলন জানার। তার মৃত্যুদণ্ড ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ) ও নমরূদ এবং মূসা কালীমুল্লাহ (আ) ও ফিরআউনের অতীত কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিদায় হলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁর বিদায়ের আগে একটা মোটা অংকের টাকাও তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন। যেমন ধারা দেওয়া হয়ে থাকে বক্তা ও ওয়ায়েজীনকে। কেউ দাতার প্রতি পুরো একীন রেখে চোখ বুঁজেই তা পকেটে রাখেন। কেউ আবার দাবি করে কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেন। ওয়াযের পারিশ্রমিক-ন্যায্য পাওয়া। কিন্তু গোলাম আযম পীর মাওলানা নন, মওসুমী বক্তা নন, অধ্যাপক। টাকা গুণে দেখে বললেন, 'না, না এতো কেন? আমার যা খরচ হয়েছে তাই দিন। এই ধরুন রংপুর-জয়পুরহাট আপ-ডাউন যাতায়াত এতো টাকা এতো আনা এতো পয়সা; তাই দিন। তার এক পাইও বেশি নেব না। নেবই বা কি করে?'

অংক কষে তাই নিলেন। মৌলভী, মাওলানা, পীর ও বক্তাদের বাঁধা-ধরা নিয়মের খেলাপ কাজ করে গেলেন। কে কি মনে করলেন জানি না। কিন্তু আমার বড়ো ভালো লাগলো। মনে মনে প্রশংসা করলাম অধ্যাপকের। পেশাজীবী বক্তা ও মুবাল্লিগ অধ্যাপকের তফাৎটা উপলব্ধি করলাম।

দীনের মুবাল্লিগের ত তাই করা উচিত। 'ইত্তাবেয়ূ মাল্লা ইয়াস্ আলুকুম আজরান'– (ইয়াসীন)। তোমরা তাদের অনুসরণ করো, যারা তোমাদের কাছে (দীনের দাওয়াত দিয়ে) কোন পারিশ্রমিক চায় না।

'ওমাতাস্আলুহুম আলায়হি মিন আজরিন'– (ইউসুফ)

– অথচ তুমি এ দীনী খেদমতের জন্য তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিকও চাইছো না।

কিন্তু আমরা আমাদের সমাজে কি দেখি? বিনা পয়সায় ওয়াজ নসিহত হয় না। কয়েক বছর আগে নিদেনপক্ষে দু'এক হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে বুক করতে হয়। ভয়ানক ডিমান্ড তাঁদের। নইলে ইসলাম ও দেশ দুটোই রসাতলে যাবে। কিন্তু এতো

করেও ইসলাম ও দেশ দুটোই রসাতলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ইসলাম থেকে মানুষ দ্রুত সরে পড়ছে। পাপাচারে দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জুমা ও ঈদের ইমামতি হয় না বিনা পয়সায়। এক জুমা ভেঙে দশ জুমা, এক ঈদ ভেঙে দশ ঈদ। ইমামদের সংখ্যা বাড়ছে। তাই জুমা ও ঈদগাহের সংখ্যা বাড়ছে।

মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে গেলে বিনা ফিসে হয় না। কোন কোন সময়ে মোটা ফিসও দিতে হয়। ফিস দিয়ে পাপ মাফ করাতে হয়।

বাপ-মা মরেছে। জীবনে নামায-রোযা ও নেক কাজ করতে পারেনি। তাই বলে কি তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে? সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়, ডাক মৌলভী-মুন্সি কুলখানি কর, মিলাদ পড়াও। হাফেয ডেকে শবীনা খতম করাও। দু'চারশ' টাকা খরচ হবে হোক।

মিলাদ আর শবীনা খতমে মৃত মা-বাপের কোন লাভ হয় কিনা জানি না, জানার উপায়ও নেই। তবে মৌলভী সাহেব ও হাফেয সাহেবের যে নগদ দক্ষিণা মেলে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক পীরও নন; মাওলানাও নন। চলে গেলেন। বিদায়কালীন তাঁর ভূমিকাটি বড়ো ভালো লাগল। পায়ে চুমো দিয়ে নযর নিয়ায দক্ষিণা দেওয়া নেই। তাবিজ তুমারের বস্তাও নেই। এটাই তো ইসলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাতে সাইকেলে চার মাইল অন্ধকারে পাল্লা দেওয়া বিপজ্জনক বলেই সবাই থাকতে বললেন। তাই রয়ে গেলাম মাদ্‌রাসার কামরায় অন্যান্যদের সাথে।

অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কেই আলোচনা চলছিলো। সকলের মুখেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাঁর ভাষণের। পীর মাওলানাদের মতো ফিসও নিলেন না। মাদ্‌রাসার জন্য বেহেশতের বিনিময়ে চাঁদা আদায় করে তার কমিশনও নিলেন না।

কিন্তু মজার ব্যাপার, এক মৌলভী সইতে না পেরে খ্যাঁক করে উঠলেন এবং আবোল-তাবোল বকা শুরু করলেন।

বললেন, যতো সব ভণ্ডামি। জানেন, এরা সব কমিউনিস্ট পার্টি থেকে টাকা পায়? তার জন্য দেখলেন না রেল ভাড়া ছাড়া এক পয়সাও নিলেন না?

বললাম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত না নেওয়াটা কি পাপ কাজ? তারপর কমিউনিস্টরা কি কালেমা তাইয়েবায় বিশ্বাসী? আপনারা কি কালেমার এমন ব্যাখ্যা করেছেন কোন দিন? কালেমা নিজে বুঝেছেন কোন দিন?

বেয়াড়া মৌলভী আসল কথার জবাব না দিয়ে উল্টো তর্ক করে। বুঝলাম এরা সব পয়সার গোলাম।

আমার লাভ হলো যে, জামায়াত সম্পর্কে জানবার আগ্রহ শতগুণে বেড়ে গেলো। তাই মনে মনে সংকল্প করলাম বড়ো দিনের বন্ধ হলেই বগুড়া যাব শায়খ আমীনুদ্দীনের সাথে দেখা করতে।

ছাপ্পান্ন সালের মাঝামাঝি জামায়াতের রুকন হলাম। অধ্যাপক গোলম আযম চাকরি ছেড়ে জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী বিভাগের আমীর হয়েছেন। নওগাঁ তাঁর শ্বশুর বাড়ি। সেখানে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে আমার রুকনীয়াতের শপথ করালেন। আল্লাহ তাআলার বন্দেগী জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল সময়ের জন্য পুরোপুরি কায়েম করা ও কায়েম রাখার নামই তো ইসলাম। আর তা বড়ো কঠিন কাজ। তার জন্য সংগ্রাম করতে হবে নফসের সাথে, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের সাথে এবং প্রতিষ্ঠিত বাতিল সরকারের সাথে। তাই তো কুরআন-হাদীসের কথা। যারা এ কাজ করে তারাই প্রকৃত অর্থে মুমিন এবং মুমিনদের জান-মাল আল্লাহ খরিদ করে নেন। আল্লাহর খরিদ করা জান-মাল আল্লাহর পথে ব্যয় না করলে তা হবে চরম মুনাফেকী এবং নিমকহারামি। তাঁর সঠিক পথের সন্ধান পেলাম।

আমার বক্তৃতার বিষয়

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পূর্বে আমার বক্তৃতা তাবলীগ জামায়াতের ৬ উসূল ভিত্তিক হতো। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জামায়াতে যোগদানের পর হাকীকত সিরিজের বইগুলোর ভিত্তিতেই বক্তৃতা করতাম।

১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে রংপুর কলেজে যোগদানের পর রংপুর তাবলীগ জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব পালন করতে থাকি। মসজিদে মসজিদে তাবলীগের ইউনিট কায়েম করতে তৎপর হই।

তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে যেটুকু ধারণা জন্মেছে তাতে ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো জীবন যাপনের প্রেরণাই পেয়েছি। সবচেয়ে বড় জযবা যেটা পেলাম তা দীনের দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রসার করার জন্য সময় ও টাকা-পয়সা খরচ করা।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন এবং অর্থনৈতিক বিরাট ময়দানে মানুষকে ইসলাম পথ দেখায় কিনা সে বিষয়ে তাবলীগ জামায়াত থেকে কোন ধারণা পাইনি। এ সব বিষয়ে সেখানে কোন চর্চাই নেই। কুরআন বুঝে পড়ার জন্য সেখানে সামান্য তাগিদও নেই। মানুষের জীবনে যে ধর্মীয় আবেগ রয়েছে, সেটুকুকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে আখিরাতমুখী হবার প্রেরণা সেখানে অবশ্যই রয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী গড়ার কোন চিন্তাই তাবলীগে নেই। এ বিষয়ে আমি পয়লা ধারণা পাই তমদ্দুন মজলিস থেকে।

৪২.

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

১৯৪৮ সালে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আমার ভূমিকা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৫২ সালের বিখ্যাত আন্দোলনের সময় আমি রংপুর থাকায় সেখানেই দায়িত্ব পালন করেছি। সে কথা পরে আলোচনা করছি। ভাষা আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে জরুরি বিষয় তুলে ধরা আমি প্রয়োজন মনে করছি।

ব্রিটিশ আমলে

ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত ভারতবর্ষে বহু ভাষাভাষী মুসলমানদের লিংগুয়া ফ্র্যাংকা (Lingua Franka) হিসেবে উর্দু ভাষাই স্বীকৃত ছিলো। হিন্দুদের লিংগুয়া ফ্র্যাংকা ছিলো হিন্দি।

এ দুটো ভাষায় প্রচুর মিল রয়েছে। উচ্চারণ শুনতে প্রায় একই রকম মনে হয়। পার্থক্য বিশেষভাবে দুদিক দিয়েই স্পষ্ট। উর্দু লেখা হয় আরবী হরফের আকারে। যদিও আরবী হরফের চেয়ে উর্দু হরফের সংখ্যা বেশি। হিন্দি ভাষা দেবনাগরী হরফে লেখা হয়। এটাই প্রধান পার্থক্য। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো– উর্দু ভাষায় আরবী ও ফার্সি শব্দের প্রাধান্য। আর হিন্দিতে সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য। অবশ্য উর্দু ভাষায়ও বহু হিন্দি সংস্কৃত রয়েছে এবং হিন্দিতেও আরবী ও ফার্সি শব্দের সংখ্যা কম নয়।

আসলে উর্দু ও হিন্দি মৌলিক কোন ভাষা নয়। দুটোই লিংগুয়া ফ্র্যাংকা, যার মানে হলো বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে তৈরি ভাষা। বাংলা ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ রয়েছে, যা হিন্দিতে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য উচ্চারণে পার্থক্যের কারণে বাংলা ভাষীদের বুঝতে একটু বেগ পেতে হয়।

ভারতের ইউপি (মধ্য প্রদেশ) ও দিল্লীর হিন্দু-মুসলিম সবারই মাতৃভাষা উর্দু। ওখানেই উর্দুর রাজধানী। দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিযাম উর্দুকে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম বানিয়ে এ ভাষাকে অনেক উন্নত ও বিকশিত করেন। ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত আরবী ও ফার্সিতে রচিত প্রায় সকল ইসলামী সাহিত্য উর্দুতে অনূদিত হওয়ায় উর্দু সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রচুর ইসলামী সাহিত্যও উর্দুতে অনূদিত হয়েছে। এভাবে উর্দু অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

যখন পাকিস্তান কায়েম হয় তখন দেখা গেলো যে, পূর্বে একটি এবং পশ্চিমে ৪টি প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ৫টি প্রদেশের জনগণের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিমের ৪ প্রদেশের জনগণ পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু ও বেলুচি ভাষায় কথা বলে। তবে ঐ কয়টি প্রদেশের শিক্ষিত লোকেরা উর্দু ভাষা বুঝে ও চর্চা করে। সর্বসাধারণ উর্দু না বুঝলেও ঐ ৪টি প্রদেশের শিক্ষিত মহলের কমন ভাষা উর্দু। ঐ ৪টি ভাষা পরবর্তীকালে যথেষ্ট উন্নতি করলেও ঐ সময় পর্যন্ত সাহিত্যের ভাষা হিসেবে মর্যাদা পায়নি। আলেম সমাজে তো উর্দু ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলোই এবং মাদ্‌রাসায় শিক্ষার মাধ্যম উর্দুই ছিলো। স্কুল-কলেজে উর্দু ভাষা বাধ্যতামূলক থাকায় আধুনিক শিক্ষিতদের সবাই উর্দু শেখার সুযোগ পেয়েছে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে পশ্চিম পাকিস্তানের কমন ভাষা উর্দুই হয়।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে মাদ্‌রাসা শিক্ষিত ছাড়া আধুনিক শিক্ষিতরা উর্দু ভাষার কিছুই জানে না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হলে এখানকার স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত সবাই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অশিক্ষিত বলেই গণ্য হতে বাধ্য। যারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দু হবার পক্ষে ছিলেন তারা এ বিষয়টা বিবেচনা করতে কেন ব্যর্থ হলেন তা আমার বোধগম্য নয়।

সম্ভবত তারা এ ভ্রান্ত ধারণার পক্ষপাতী ছিলেন যে, একটি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রভাষা একটিই হতে হবে। এ কারণেই হয়তো উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা প্রয়োজন মনে করেছেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করার দাবিতে আন্দোলন হওয়ার পরও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টার নিন্দা না করে পারা যায় না।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রথম ঢাকা আগমন উপলক্ষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। তখন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন। ১১ মার্চের আন্দোলনের তীব্রতা অনুভব করে খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে আপোস-আলোচনার উদ্যোগ নেন।

১৫ মার্চ প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা চুক্তি হয়। এর দ্বিতীয় দফা ছিলো নিম্নরূপ–

'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত প্রাদেশিক পরিষদের গৃহীত একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হবে।'

২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বিশাল নাগরিক সম্বর্ধনায় কায়েদে আযম ঘোষণা করেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।' ২৪ মার্চ কার্জন হলে কনভোকেশন অনুষ্ঠানে আবার এ ঘোষণা দিলে প্রতিবাদে 'নো নো' ধ্বনি উঠে। ঐ দিনই সন্ধ্যায় কায়েদে

আযমের সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের বৈঠক হয়। কায়েদে আযম শেষ পর্যায়ে বললেন, 'Let us differ respectfully.' আরও বললেন, 'তোমরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবি জানাতে পার। অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করা হবে।'

কায়েদে আযমের বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত থাকলেও প্রচারাভিযান জারি রইল।

৪৮-এর ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানকে ঢাকার ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়াম গ্রাউন্ডে এক ঐতিহাসিক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এতে রাষ্ট্রভাষার দাবির সাথে সাথে পূর্ব-পাকিস্তানের সামগ্রিক দাবি বলিষ্ঠ ভাষায় জোরালোভাবে শামিল করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী যদি একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা দিতেন তাহলে মঞ্চেই এর প্রতিবাদ করার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু ঝানু রাজনীতিক ভাষার বিষয়ে কিছুই না বলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সৃষ্টি হয়নি।

'৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় গুলীতে নিহত হওয়ার পর তৎকালীন গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৪৮-এর ১১ সেপ্টেম্বর কায়েদে আযমের ইন্তিকালের পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন এবং জনাব নুরুল আমিন তার স্থলাভিষিক্ত হন।

খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা নওয়াব বাড়ির হলেও তার মাতৃভাষা উর্দুই ছিলো। ঢাকার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে তো মাতৃভাষা উর্দু ছিলোই; এমনকি ঢাকা শহরের আদিবাসী সবাই এক ধরনের উর্দুতেই কথা বলতেন। এখনো পারিবারিক পরিবেশে তারা ঐ উর্দু বলেন। কোলকাতার অধিবাসী হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং বগুড়ার অধিবাসী মুহাম্মদ আলীদের পারিবারিক ভাষা উর্দুই ছিলো।

খাজা নাজিমুদ্দীন '৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জনসভায় ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। তিনি লিয়াকত আলী খানের মতো বুদ্ধিমান রাজনীতিক হলে এ ঘোষণা দিতেন না। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে যে চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন এর স্পষ্ট বিরোধী ঘোষণা কি করে দিলেন তা বিস্ময়কর।

খাজা নাজিমুদ্দীনের এ ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সৃষ্টি করে। ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে মিছিল করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে এ মিছিল শুরু হয়ে ঢাকা মেডিকেল

হোস্টেলের সামনে এলে পুলিশের গুলীতে ৪ জন নিহত ও ১৭ জন আহত হয়।

২১ শে ফেব্রুয়ারীর এ হত্যাকাণ্ডেই ভাষা আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। আমি তখন রংপুর কলেজে কর্মরত। সারাদেশের মতো রংপুরেও ছাত্রদের উদ্যোগে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্বের দায়িত্ব যারা পালন করেন তাদের মধ্যে আমি ও অধ্যাপক জমিরুদ্দীন অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় ৬ মার্চ গ্রেফতার হলাম। ছাত্রদের মধ্যেও নেতৃস্থানীয় কয়েকজন গ্রেফতার হয়।

জেলের প্রথম অভিজ্ঞতা

রংপুর জেলখানার জেলার সাহেব অধ্যাপক জমিরুদ্দীনের বন্ধু ছিলেন। তারা দু'জনই কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার অধিবাসী। আমাদের গ্রেফতারের মাসখানিক পূর্বে জেলার সাহেব কলেজ ক্যাম্পাসে অধ্যাপক জমিরুদ্দীনের সাথে দেখা করতে এলেন। তখন আমরা দু'জনই এক বাসায় মেস করে ছিলাম। জেলার সাহেবের সাথে আমার ওখানেই পরিচয় হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমাকে জেলের ভেতরে নিয়ে দেখার সুযোগ দিতে পারেন কিনা। ১৯৩৯ সালে কুমিল্লায় ক্লাস এইটে পড়ার সময় জেলখানার দেয়ালের পাশেই এক পোস্টমাস্টারের বাড়িতে লজিং থাকতাম। তখন থেকেই আমার খুব সখ ছিলো যে, জেলখানার ভেতরে কি হয় তা দেখবো।

জেলার সাহেব কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে জেলের ভেতরে নিয়ে দেখাতে রাজি হলেন। কিন্তু একমাসের মধ্যেই গ্রেফতার হওয়ায় তাকে কারো অনুমতি ছাড়াই কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভেতরে নিতে বাধ্য হলেন। অনুমতি নেবার ঝামেলা তাকে পোহাতে হলো না।

জেলার সাহেব খুব বিব্রতবোধ করলেন। কারণ জেলে ভর্তি করার সময় আমাদেরকে ডিভিশন দেওয়া হয়নি। আমরা সাধারণ কয়েদীদের মতোই খাট ও টেবিল-চেয়ার ছাড়া ফ্লোরে প্রথম রাতটা কাটালাম। অবশ্য জেলার সাহেব নিজের বাসা থেকে আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন তিনি নিজে দৌড়াদৌড়ি করে আমাদের ডিভিশন পাওয়া ত্বরান্বিত করলেন। তা না হলে কয়েকদিন হয়তো ঐভাবেই কাটাতে হতো।

ইতঃপূর্বে জেলে থাকার অভিজ্ঞতা না থাকলেও জেলজীবন ভালোই লাগলো। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কায়েমের জন্য জেলখানা খুবই উপযোগী। সুউচ্চ দেয়াল দিয়ে আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অসহায়ের একমাত্র সহায় আল্লাহ তাআলাকে খুব কাছে মনে হয়। দেয়াল তাঁকে বাধা দিতে অক্ষম। একমাত্র তিনিই সান্ত্বনার উৎস। তাহাজ্জুদের নামাযে ওখানে একাগ্রতার যে স্বাদ পেলাম ইতঃপূর্বে কখনো এর কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না।

কিন্তু একটি কারণে মনটা মাঝে মাঝে খুব বিষণ্ন হয়ে পড়তো। ঐ সময়টা আমার বিবাহিত জীবনের প্রথম বসন্তকাল। '৫১-এর ২৮ ডিসেম্বর বিয়ে করলাম।

ফেব্রুয়ারির শেষার্ধে স্ত্রীকে রংপুর কলেজ ক্যাম্পাসের বাসায় এনে নতুন সংসার শুরু করলাম। আমার দাদী শাশুড়ি তার আদরের নাতনীর সাথে আসায় আমার গ্রেফতার হওয়ায় স্ত্রী বেচারীকে বড় সমস্যায় পড়তে হয়নি। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে আমার শ্বশুরপক্ষের এক আত্মীয় নওগাঁয় টেলিগ্রাম করলে শ্বশুর সাহেব এসে তাদেরকে নিয়ে যান।

তখনকার জননিরাপত্তা আইনে প্রথমে একমাসের জন্য আটকের নির্দেশ দেওয়া হতো। মাস শেষ হবার ২/১দিন আগে আটকের মেয়াদ ১ বা ২ বা ৩ মাস বৃদ্ধির খবর জানানো হয়। এটা চরম অমানবিক আচরণ। যখন বন্দিদশা থেকে মুক্তির আশায় দিন গুণতে থাকে তখন হঠাৎ করে সময় বৃদ্ধির খবর পেলে কি যে মানসিক বেদনাবোধ হয় তা শুধু ভুক্তভোগীই অনুভব করতে পারে। বিনাবিচারে আটক রাখার এ পাশবিক প্রথা এখনো এদেশে চালু রয়েছে। গত সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) নিবর্তনমূলক আইনের সংখ্যা আরো বেড়েছে।

আমার আটকাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করার চিন্তা চলছিলো। আটকের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ পেলেই তা করা হতো। ইতোমধ্যে আমার চাচা এডভোকেট শফিকুল ইসলাম (প্রাক্তন মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা) প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিনকে দিয়ে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। ২৫ দিন বন্দি থাকার পর মুক্তি পাই।

৪৩.

আমার বিয়ে

১৯৫০-এর ডিসেম্বরে রংপুর কারমাইকেল কলেজে অল্প বেতনে কর্মজীবন শুরু করায় আয়ের সবটুকুই কিভাবে যে খরচ হয়ে যাচ্ছিল তা বুঝতেই পারছিলাম না। চাকরির উপযোগী গরম পোশাক, প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র ও চৌকি (খাট নয়), পড়ার টেবিল-চেয়ার, বইপত্র ও বইশেলফ ইত্যাদি প্রতিমাসেই কিছু কিছু করে যোগাড় করতেই বেতনের টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছিল।

বিয়ে-শাদীর কোন চিন্তা তখনো করিনি। কয়েকমাস পর আব্বার চিঠি পেলাম। আব্বা লিখলেন, 'তোমার জন্য মেয়ে তালাশ করছি, তুমিও খোঁজ-খবর নাও।' চিঠি পেয়ে চিন্তিত হলাম। আমার ধারণা ছিলো যে, বছর দু'য়েকের মধ্যে প্রতিমাসে কিছু কিছু করে সঞ্চয় করা ছাড়া বিয়ে করা মোটেই সমীচীন হবে না। আব্বা বিয়ে করাবেন এবং প্রয়োজনীয় টাকা তিনিই খরচ করবেন বটে; কিন্তু এমন কতক খরচ আমাকেও করতে হবে, যা যোগাড় করা আমারই দায়িত্ব।

আব্বার চিঠির জওয়াবে লিখলাম যে, আমি বছর দু'য়েক দেরি করতে চাই। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। এ বিষয়ে সাক্ষাতে আলোচনা করার জন্য অপেক্ষা করার অনুরোধ জানালাম। গ্রীষ্মের দেড়মাস দীর্ঘ ছুটি নিয়ে ঢাকা এসে আম্মার কাছে জানলাম যে, আমার জন্য মেয়ে তালাশের তোড়জোড় চলছে। আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামের জন্য মেয়ে বাছাই করা হয়েই গেছে বলা চলে। বড় ভাইকে বাদ দিয়ে ছোট ভাইয়ের বিয়ে আগে হয় কী করে? তাই এতো তাড়াহুড়ো।

আমার ছোট ভাই ইতোমধ্যে কোলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে গোল্ড মেডেলসহ এমবিবিএস পাস করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চাকরি করছে। আম্মার কাছ থেকে আরও জানলাম যে, সে বিয়ে করতে আগ্রহী। বিয়ের বয়স তো অবশ্য আমারও হয়েছে এবং বিয়ে অনর্থক বিলম্বিত করা উচিতও নয়। আমি যে কারণে বিলম্ব করতে চাই সে কারণকে আব্বা কোন গুরুত্বই দিলেন না।

মেয়ে তালাশ চললো

আমি জানতে চাইলাম যে, আমার ছোট ভাইয়ের জন্য কিভাবে এত তাড়াতাড়ি মেয়ে বাছাই করা সম্ভব হলো, অথচ আমার জন্য তালাশ করে সবাইকে হয়রানি হতে হচ্ছে। জানতে পারলাম যে, আব্বা আমার জন্য এমন একজন বড় আলেমের মেয়ে চান, যিনি মেয়েকে যথাযথ ইসলামী শিক্ষা দিয়েছেন। এ দুটো শর্ত পূরণ করে এমন মেয়ে যোগাড় করা কঠিন হয়ে গেলো।

আমার ছোট ভাইয়ের জন্য মেয়ে তেমন তালাশ করার দরকারই হয়নি। আমার দাদার মিতা, সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাওলানা আবদুস সুবহানের পরিবারের সাথে আব্বা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী। তাঁর ছেলেদের মধ্যে মেয়ে পাওয়া যায় কিনা খবর নিয়ে জানা গেলো যে, দ্বিতীয় ছেলে জনাব মুহাম্মদ হোসাইনের বিবাহের যোগ্য মেয়ে আছে। আম্মা ও আমার বোনেরা গিয়ে দেখে পছন্দ করে এসেছে। এখন আমার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত এ বিয়ের কথাবার্তা শুরু করা যাচ্ছে না। এভাবে আমার ভাইয়ের বিয়ে আমার কারণেই বিলম্বিত হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে বিয়ে বিলম্বিত করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হলো।

মাওলানা আবদুস সুবহানের পরিচয়

পুরানা ঢাকার আর্মানিটোলায় 'তারা মসজিদ' নামে যে বিখ্যাত মসজিদটির ছবি বাংলাদেশের ১০০ টাকার নোটে রয়েছে ঐ মসজিদের উত্তর পাশেই সুবহান মনজিল ও শরফুদ্দীন মনজিল নামে পাশাপাশি দুটো বাড়ি রয়েছে। মাওলানা আবদুস সুবহানের নামেই সুবহান মনজিল নাম রাখা হয়েছে। তাঁরই তৃতীয় ছেলে জনাব শরফুদ্দীনের নামে অপর বাড়িটির নামকরণ করা হয়েছে। ধানমণ্ডি এলাকায় সুবহানবাগ নামে মহল্লাটিও ঐ মাওলানা আবদুস সুবহানের নামেই রাখা হয়েছে।

মাওলানা সাহেবের ছেলেদের উদ্যোগেই বিরাট এলাকাটি কেনা হয়। মীরপুর রোডের পাশে বিরাট মসজিদটি সুবহানবাগ মসজিদ হিসেবেই খ্যাত।

আমার দাদার নামও মাওলানা আবদুস সুবহান। ঘটনাক্রমে ঢাকার বিখ্যাত মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসায় দু'জনেই সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাহাদুর শাহ পার্কের পাশে বর্তমান নজরুল কলেজ ক্যাম্পাসেই মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসার অবস্থান ছিলো। মাদ্‌রাসা পাস করার পর দু'জনেই এ মাদ্‌রাসার শিক্ষক হন। বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়। আমার দাদা শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে নিজের এলাকায় চলে যাবার উদ্দেশ্যে নবীনগর থানার কাজী ও ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হন। আব্বা ঐ মাদ্‌রাসায়ই ভর্তি হওয়ায় মাওলানা আবদুস সুবহানকে শিক্ষক হিসেবে পান এবং তাঁর বন্ধুর ছেলে হিসেবে স্নেহধন্য হন। স্বাভাবিকভাবেই আব্বা মাওলানা সাহেবের ছেলেদের সাথে পরিচিত হন। ঢাকার বিখ্যাত ইসলামিয়া লাইব্রেরী তিনিই শুরু করেন। মাদ্‌রাসার পাঠ্য কিতাবাদি বিক্রয় করার জন্য তিনি নিজ বাসস্থানেই প্রথমে ছোট্ট লাইব্রেরী কায়েম করেন। ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকেই বাজারের চেয়ে কিছু কম দামে কিতাব পেত। এটাই পরে বড় আকারে ইসলামিয়া লাইব্রেরী নামে খ্যাত হয়।

মাওলানা সাহেব মাদ্‌রাসার চাকরি থেকে অবসর নেবার পর ইসলাম ও আরবী ভাষার খেদমতে বাকি জীবন নিজেই লাইব্রেরীর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আমি জীবনে একবারই তাকে দেখেছি। পাটুয়াটুলি রোডেই ইসলামিয়া লাইব্রেরীর বিরাট সাইনবোর্ড ছিলো। ১৯৩৭ সালে আমি যখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র তখন ঢাকায় আম্মার সাথে বেড়াতে এলাম। আব্বা আমাদেরকে নিতে আসলেন। আমার জামা ও জুতা কেনার জন্য লক্ষ্মীবাজার থেকে হেঁটে আব্বা আমাকে নিয়ে চকবাজার যাবার পথে দেখা গেলো পাটুয়াটুলিস্থ ইসলামিয়া লাইব্রেরীর বারান্দায় মাওলানা সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আব্বা তাঁকে কদমবুছি করলেন। আমাকেও করতে বললেন। আমাকে আদর করে মাথায় হাত বুলালেন। আব্বাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার বন্ধু কেমন আছেন?' আব্বা বললেন, 'তিনি তো গতবছর ইন্তিকাল করেছেন।' একথা শুনবার সাথে সাথে তিনি বারান্দায়ই বসে দু'হাত মাথায় রেখে বিষণ্ন হয়ে রইলেন। আমি অনুভব করলাম যে, দাদাকে তিনি কত ভালোবাসতেন।

এ মাওলানা সাহেবেরই দ্বিতীয় ছেলের মেয়ের সাথে আমার ভাই ডাক্তার মুয়ায্‌যামের বিয়ে হয়। কয়েক বছর পর এরই ছোট বোনের সাথে আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররামের বিয়ে হয়।

আমার জন্য মেয়ে তালাশ

মেয়ে তালাশের দায়িত্ব যাদের তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে আমার কোনো করণীয় ছিলো না। কিন্তু আব্বাকে একটি মেয়ের খোঁজ আমাকেই দিতে হলো। আমার সহপাঠী ইউসুফ রংপুর কলেজেই ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলো। ঢাকা

ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট থেকে আমরা একই সাথে পাস করি। প্যারাডাইস হোস্টেলে দু'জনই খেলার সাথী ছিলাম। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও ছিলো আমাদের মধ্যে। কলেজ টিচার্স কমন রুমে সে আমাকে একটা চিঠি দেখালো। ইউসুফকে লেখা চিঠির লেখক অধ্যাপক এ.টি. সাদী। তিনি তখন কুষ্টিয়া কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক। ইউসুফের বাড়ি পাবনা জেলায়। সে কুষ্টিয়ায় বিয়ে করেছে। শ্বশুরবাড়ি গেলে সাদী সাহেবের সাথে দেখা হয়। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সাদী সাহেব আমাদের জুনিয়র ছাত্র ছিলেন। সামান্য পরিচয় ছিলো।

চিঠিটা পড়লাম। সাদী সাহেব আমার সাথে তার দ্বিতীয় বোনের বিয়ের ঘটকালীর দায়িত্ব দিলেন আমার বন্ধু ইউসুফের উপর। সে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই চিঠিটা আমাকে পড়তে দিলো। চিঠিতে জানা গেলো যে, মেয়ের পিতা মাওলানা মীর আবদুস সালাম নওগাঁ ডিগ্রি কলেজে আরবী ভাষার অধ্যাপক। মেয়ের আপন ফুফা মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী আল কুরাইশী যিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি এবং পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য। চিঠিতে আরও যা কিছু তথ্য ছিলো তা জেনে ভালোই মনে হলো।

ঘটক সাহেবকে বললাম যে, মেয়ে এবং মেয়ের ভাই-বোনদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খবর যোগাড় করো। আর আব্বাকে চিঠি দিয়ে এ প্রস্তাব সম্পর্কে জানালাম। আমার চিঠির জওয়াবে আব্বা যা লিখলেন তাতে আমি বিস্মিত হলাম। জানা গেলো যে, ইতোমধ্যে পাত্রীর পিতা নওগাঁ থেকে সুদূর কুমিল্লা জেলার চান্দিনায় যেয়ে আব্বার সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে রীতিমতো মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে ফেলেছেন। আব্বা তাঁর বেহাই বাছাই করে নিয়েছেন এবং মেয়ের পিতাও তাঁর জামাই হিসেবে আমাকে পছন্দ করার কথা জানিয়েছেন। তিনি আমাকে দেখার প্রয়োজনবোধ করেননি। তার ছেলের সার্টিফিকেটকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। আরও জানলাম যে, রংপুর ও বগুড়াস্থ পাত্রীপক্ষের কিছু লোক আমার অজান্তে কলেজে এসে আমাকে দেখে নাকি খবর দিয়েছে যে, হাজারের মধ্যেও এমন একজন পাত্র পাওয়া কঠিন। এ সব কথা আব্বাকে তিনিই বলে এসেছেন।

চিঠিতে আব্বা আমাকে আরও জানালেন যে, মেয়ের পিতা নাকি আমাকে মেয়ে দেখে আসার দাওয়াত দিয়েছেন। শরীআত-এর অনুমতির উল্লেখও নাকি তিনি করেছেন। এ সব কথা জেনে পাত্রীর পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগলো। বুঝতে পারলাম যে, আব্বা বিয়ে ঠিক করেই ফেলেছেন, শুধু আমার সম্মতির অপেক্ষায় আছেন। আমি পাত্রী দেখে পছন্দ করার কথা জানালেই তিনি অগ্রসর হবেন।

আমি বেশ বিব্রতবোধ করলাম। আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এ ধরনের কোনো উদাহরণ আমার জানা নেই। পাত্রী দেখার জন্য পাত্র নিজে যেতে কোথাও দেখিনি। পাত্রের পিতা, মাতা, বোন, খালা, ফুফু, ভাবিরাই পাত্রী দেখার দায়িত্ব পালন করে।

আমার বেলায় এ ঝামেলা পোহাবার দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হবে? আব্বা তো পাত্রীর পিতার সাথে সম্পর্ক করেই ফেলেছেন। তিনি নিজে পাত্রী দেখার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। আমি এ অবস্থায় দেখতে যাবো কিনা ভেবে স্থির করতে পারছিলাম না। দেখে যদি পছন্দ না হয় তাহলে আব্বাকে কিভাবে জানাবো? তিনি তো পছন্দ করেই ফেলেছেন। যে ধরনের বেহাই ও বৌমা তিনি চান তা তো পেয়েই গেছেন। আর কোনো বিকল্প প্রস্তাবও এমন নেই, যা আব্বার শর্ত পূরণ করতে পারে। এ অবস্থায় আমার দেখতে যাওয়া রীতিমতো বিব্রতকর।

অধ্যাপক বন্ধুদের পরামর্শ চাবো কিনা ভাবলাম। ইতোমধ্যে তাদের একজনের পাত্রী দেখার জন্য বরের বন্ধুরাও সাথে গেলো। শরীআতে এটা তো জায়েযই নেই। তাই বন্ধুদের পরামর্শ আর চাইলাম না। আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি এ অবস্থায় ঘটক ইউসুফ সাদী সাহেবের দ্বিতীয় চিঠি আমাকে দিলো। যে সব তথ্য যোগাড় করার জন্য ইউসুফকে বলেছিলাম সে সবই এ চিঠিতে পেলাম।

ঘটককে বললাম যে, তোমার মতো সার্থক ঘটক আর দেখিনি। পাত্র ও পাত্রীপক্ষের দায়িত্বশীলদের নিকট ঘটককে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। তোমাকে কিছুই করতে হলো না। শুধু চিঠিতে খবর যোগাড় করাই যথেষ্ট হয়ে গেলো। চিঠিতে যা তথ্য পেলাম, তা আমি যথেষ্ট মনে করে দেখতে না যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং আব্বাকে জানালাম যে, দেখার প্রয়োজন নেই। আর সবদিক দিয়ে আপনি যখন পছন্দ করেছেন তাতেই আমি রাজি।

আমি ভাবলাম যে, আমি যেয়ে কি দেখবো? ঘোমটা পরা অবস্থায় শুধু চেহারাটুকু দেখানো হবে। এ জাতীয় পরিবারের মেয়েরা চোখ খুলেও দেখবে না। আমার বোনকে বিয়ের আগে দেখার জন্য পাত্রের পিতা এলেন। চোখ খুলবার জন্য বারবার বলার পর হঠাৎ একবার চোখ খুলেই বন্ধ করে ফেললো। কথাতো বলানো গেলোই না। পাত্রের পিতা অসন্তুষ্ট হলেন না; বরং এ লাজুকতায় খুশিই হলেন। এ ধরনের পরিবারে পাত্রপক্ষের মহিলারাই পাত্রীর সাথে কথাবার্তা বলতে আসে।

পাত্রী সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলি

সাদী সাহেবের উক্ত চিঠি থেকে জানা গেলো, ভাই-বোনদের মধ্যে সবাই লেখাপড়ায় রয়েছে। সাদী সাহেব সবার বড়। এরপর তিন বোন। পাত্রী বোনদের মধ্যে দ্বিতীয়। সে আলেম পাস এবং ফাযিল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বড় বোন ইতোমধ্যে কামিল পাস করেছে এবং এক কামিল পাস ও আরবীতে এমএ পাস ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছে।

মেয়েদের মধ্যে মাদ্রাসার ডিগ্রি কেউ নিয়েছে বলে আগে আমি শুনিনি। আমার শ্বশুর সাহেব নিজে বাসায় মেয়েদেরকে পড়িয়ে পরীক্ষা দেওয়াবার ব্যবস্থা করতেন। বিয়ের কিছুদিন পর ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আমাকে দেখা করতে খবর দিলেন। তিনি তখন

ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাংলা পত্রের প্রধান পরীক্ষক। এক পরীক্ষক হঠাৎ করে অক্ষমতা প্রকাশ করায় আমাকে খাতা দেখার দায়িত্ব দিলেন। বিয়ে করেছি শুনে জানতে চাইলেন কোথায় বিয়ে করলাম। নওগাঁ কলেজের অধ্যাপক মাওলানা মীর আবদুস সালামের মেয়ে বিয়ে করেছি শুনে খুব খুশি হয়ে হাত মিলায়ে বললেন, 'তুমি কি আফিফাকে বিয়ে করেছো?' আমিতো বিস্ময়ে হতবাক। আপনি এ নাম কেমন করে জানলেন এবং নামটা মনেও রাখলেন?

তিনি বললেন, 'আমি বগুড়া কলেজে প্রিন্সিপাল থাকাকালে সে আলিম পরীক্ষা দিতে এলো। আমার কলেজেই পরীক্ষা হয়। একটি মাত্র মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে দেখে আমি উৎসুক হয়ে পরিচয় নিলাম। তোমার শ্বশুর সাহেবের সাথে একান্তে আলাপের পর থেকে তাকে আমি আন্তরিক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি। এ কারণেই মেয়েটির নাম মনে আছে।'

৪৪.

বিয়ের হাঙ্গামা

পাত্রী পক্ষ যেখানে বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে পাত্রপক্ষকে বরযাত্রী নিয়ে সেখানেই যেতে হয়। রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমা শহরে আমার শ্বশুর সাহেব থাকেন। নওগাঁ কলেজে তিনি আরবীর অধ্যাপক। তিনি নিজ বাড়িতেই বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন বলে জানা গেলো।

চাকরি উপলক্ষে আমার আব্বা চান্দিনায় বসবাস করতেন। বরযাত্রীরা সেখান থেকেই রওয়ানা হয়ে নওগাঁ পৌছেন। এটা রীতিমতো দীর্ঘ সফর। চান্দিনা থেকে একটি বিরাট বাসে চড়ে ১২ মাইল দূরে কুমিল্লা রেলস্টেশনে পৌছলাম। রাত দশটায় চট্টগ্রাম থেকে আগত রেলগাড়িতে উঠলাম। নিম্নমধ্যবিত্ত লোকেরা ইন্টার ক্লাসেই ভ্রমণ করে থাকে। ইন্টার ক্লাসে আসন রিজার্ভ করার ব্যবস্থা ছিলো না। যেখান থেকে ট্রেন যাত্রা শুরু করে সেখানে অতি সহজেই আসন দখল করা যায়। মাঝপথের রেলস্টেশনে মাত্র কয়েক মিনিট থাকে। এর মধ্যে গাড়ি তালাশ করে পছন্দমতো জায়গা পাওয়া মোটেই সহজ নয়। বিশেষ করে রাতে খুবই কঠিন। যারা আগে থেকে গাড়িতে দখলীস্বত্ব কায়েম করে বসেন তারা চান না যে, বেশি যাত্রী উঠে তাদের আরামে ব্যাঘাত ঘটান। তাই এ গাড়িতে জায়গা নেই বলে তারা দরজার সামনেই নিরুৎসাহিত করতে থাকেন। তাই রাতে গাড়িতে প্রবেশ করা রীতিমতো এক সংগ্রামের ব্যাপার।

যা হোক, ঐ সংগ্রামে সফল হওয়ার পরে আসন সংগ্রহ করার সাধনা করতে হলো। আগে থেকে যারা হাত-পা ছড়িয়ে আরামে বসে ছিলেন তাদের বিরক্তি ও অসন্তুষ্টিকে বরদাশত করে কোনরকমে বসার জায়গা যোগাড় করা গেলো। সারারাত ট্রেনে

কাটাতে হবে। সকালে বাহাদুরাবাদ পৌঁছবে। নিচে শোবার জায়গা পাওয়া সম্ভবই নয়। পথে আরও যাত্রী গাড়িতে উঠবে। তাই বাংকে শোবার জায়গা যোগাড়ে লেগে গেলাম। আমার ছোট ভাইরা ও চাচাত ভাইরা প্রথমে আমার জন্য বাংকে বিছানা করে দিল। একে তো আমি তাদের মধ্যে সবার বড়, তদুপরি বর হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারীও বটে। আরও কয়েকজন কোনরকমে বাংকে শুবার সুযোগ পেলো। ছোট চাচা আব্বাকে নিয়ে পাশের বগিতে উঠলেন এবং আব্বাকে নিচেই শুবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

মেল ট্রেন সব স্টেশনে থামে না। আমাদের ট্রেন ভৈরব এসে থামলো। যাত্রী উঠানামার হৈচৈ। ঘুম ভেঙে গেলো। মনে হয় তখনও ঘুম গভীর হয়নি। লক্ষ্য করলাম। অন্যান্য যাত্রীদের মতো আমাদের সাথীরাও 'এ গাড়িতে জায়গা নেই' স্লোগানে শরীক হয়ে গেলো। কুমিল্লা স্টেশনে আমরা বাধার সম্মুখীন হলাম। ভৈরবে আমরাই আবার নতুন যাত্রীদের বিরোধী হয়ে গেলাম। এটাই মানব স্বভাব। এ কারণেই সমাজে অশান্তি বৃদ্ধি পায়। অপরের প্রতি সহানুভূতির অভাব এভাবেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কুমিল্লা স্টেশনে পুরনো যাত্রীদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে আমরা গাড়িতে উঠলাম। ভৈরবে পৌঁছেই আমরা ভুলে গেলাম যে, নতুন যাত্রীদেরও গাড়িতে উঠার অধিকার রয়েছে। অপরের অধিকার আমরা দিতে চাই না বলেই নিজের অধিকারও সহজে পাই না।

খুব ভোরে বাহাদুরাবাদ স্টেশনে গাড়ি পৌঁছার সাথে সাথে ফেরীতে উঠার জন্য যাত্রীদের দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। দুনিয়ার সর্বত্রই এ প্রতিযোগিতা। কে আগে সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নেবে সে প্রচেষ্টার নামই জীবন-সংগ্রাম। সবাই যদি সমানভাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার মনোভাব নিয়ে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয় তাহলে প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। এ মনোভাব সৃষ্টি করার মতো লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা আসা উচিত।

সেদিন ১৯৫১ সালের ২৮ ডিসেম্বর। প্রচণ্ড শীত ও ঘন কুয়াশায় সবাই জড়সড়। ফেরীতে উঠে ভয়ানক ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওযূ করে ফজরের নামায কোন রকমে আদায় করা গেলো। যমুনার ওপারে ফুলছড়ি ঘাটে পৌঁছার পর মনে হলো যে, হাশরের ময়দানে সবাই 'নাফসী নাফসী' হালে ট্রেনে একটু বসার জায়গা পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। দৌড়াবার যোগ্য রাস্তাও নেই সেখানে। বয়স্ক ও শিশুরা বারবার আছাড় খাচ্ছিলো।

আমাদেরকে সান্তাহার জংশনগামী বগিতে উঠবার জন্য লম্বা ট্রেনের শেষ মাথা পর্যন্ত দৌড়াতে হলো। বোনারপাড়া জংশন ও বগুড়া পার হয়ে সান্তাহার পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেলো। পাত্রীপক্ষের লোকেরা বাসের ব্যবস্থা করে রাখায় ট্রেন থেকে নেমে আমরা ধীরে সুস্থেই বাসে চড়লাম। এখানে কোনরকম তাড়াহুড়া করতে হলো না।

পূর্বপরিকল্পনা ও যথাযথ প্রস্তুতি থাকলে জীবনে কোথাও অবাঞ্ছিত তাড়াহুড়ার ঝামেলায় পড়তে হয় না। এর অভাবেই আমরা অনেক সময় সুন্দরভাবে কাজ সমাধা করতে ব্যর্থ হই।

সান্তাহার জংশন থেকে নওগাঁ শহরের দূরত্ব মাত্র তিন মাইল। বাস চকদেব মহল্লায় যখন পৌঁছলো তখন যোহরের সময় হয়ে গেছে। বাস দিয়ে সফর শুরু, বাস দিয়েই শেষ। মাঝে ট্রেন ও ফেরী। ১৮ ঘণ্টা একটানা সফরে বরযাত্রী সবাই ক্লান্তশ্রান্ত। সকালে ট্রেনে কলা ও পাউরুটি দিয়ে কোনরকমে নাস্তার দায়িত্ব পালন করা গেলো। তাই সবাই ক্ষুধার্তও ছিলো।

বিয়ে বাড়িতে পৌঁছলাম। নিকটেই বাঁধাই করা ঘাটলাওয়ালা পুকুর থাকায় গোসল করে সফরের ক্লান্তি ধুয়ে ফেলার সুযোগ পাওয়া গেলো। বরযাত্রীকে নিয়ে 'টিডিয়াস জার্নি' করতে হলো বলেই 'বিয়ের হাঙ্গামা' শিরোনামে এর বিবরণ দিলাম।

বিয়ের অনুষ্ঠান

পাত্রীর পিতা আহলে হাদীসের মধ্যে বড় আলেম হিসেবে গণ্য। তিনি শরীআতের বিধানের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ। তাই বিয়েবাড়ি সাজাবার আতিশয্য ছিলো না। শ্বশুর সাহেবের নিজস্ব বাড়িটি বিরাট না হলেও দোতলা বিল্ডিং। পাশেই খালি জায়গায় বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য প্যান্ডেল করা হয়েছে। সেখানেই বরযাত্রীদের বসার ব্যবস্থা করা হলো।

আসরের নামাযের পর বিয়ের অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। ঐ পাড়ায়ই নওগাঁর কাজী সাহেবের বাসা ও অফিস। কাজী সাহেব এলেন। পাত্রীর পিতাই বিয়ের খুতবা দিলেন। ইযাব-কবুলের পর তিনি অত্যন্ত আবেগময় দোয়া করলেন। তিনিও কাঁদলেন, আমাদেরকেও কাঁদতে হলো। আব্বার চোখেও পানি দেখলাম। আব্বা মনের মতো বেহাই পেয়ে খুবই খুশি হলেন। বিয়ের দোয়ায় ফেলা চোখের পানি বিষাদময় নয়, আনন্দাশ্রু। নবদম্পত্তির কল্যাণ কামনায় আল্লাহর দরবারে মুরব্বিদের ধরনার আবেগপূর্ণ প্রকাশই হলো এ অশ্রু।

সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠানের পূর্বে উভয়পক্ষের দায়িত্বশীলগণ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিয়ে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সিদ্ধান্ত পরামর্শের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন। এ বৈঠকে মোহরানার অংক নির্দিষ্ট করা হয়। পাত্রীর অলংকারপত্র নিয়েও কথা হয়। বিয়ের তারিখ ধার্য করা, বরযাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সিদ্ধান্তসমূহ লিখে উভয়পক্ষ তাতে দস্তখত করেন। এর কপি উভয়পক্ষকেই দেওয়া হয়। এটাকে বিয়ের ফর্দ বলা হয় এবং এ বৈঠককে আমাদের দেশে 'পান-চিনি' নামে অভিহিত করা হয়। পাত্রপক্ষ পান ও মিষ্টান্ন নিয়ে আসে বলে হয়ত এ পরিভাষার জন্ম হয়েছে।

আমার বিয়ের অনুষ্ঠানের পূর্বে এমন কোন বৈঠক হয়নি। উভয়পক্ষ দূরে দূরে থাকার কারণেই দায়িত্বশীলদের একত্র বসে ঐ রেওয়াযী অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। তাই পাত্রীর মোহরানা ধার্য করা ছিলো না। মোহরানা পাত্রীর অধিকার।

বিবাহ বৈধ হবার জন্য মোহরানা ধার্য করা জরুরি শর্ত। কাজী সাহেব তার রেজিস্ট্রিতে পাত্র ও পাত্রীর নাম, ঠিকানা, বয়স, মেয়ের উকীল ও উকীলের দু'জন সাক্ষীর নাম লেখার পর জিজ্ঞেস করলেন মোহর কত লেখা হবে? আগে ধার্য করা না থাকায় আব্বা পাত্রীর পিতাকে বললেন, 'আপনি বলেন কত লেখবে।' তিনি বললেন, 'পাত্র-পাত্রীর মিল মহব্বতই আসল। বড় অংকের মোহর ধার্য করা আমি পছন্দ করি না। তিন হাজার হলেই চলবে।' আব্বা বললেন, 'মিল মহব্বত হলে স্বামী-স্ত্রীকে সাধ্য থাকলে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি দেয়। মোহর যেহেতু আদায় করা ফরয এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করা উচিত, সেহেতু এমন অংকই ধার্য করলে ভালো হয়, যা আদায় করতে বেশি দেরি করতে না হয়। ছেলে যে বেতনে চাকরি করে সে হিসেবে আরও কম হলে কেমন হয়? তিন হাজার মোটেই বড় অংক নয়। তবুও কিছু কমের জন্য প্রস্তাব করছি।'

পাত্রীর পিতা বললেন, 'আপনিই বলুন কত কম হওয়া উচিত। আমি কোন আপত্তি করবো না। আমি এ ছেলের হাতে মেয়ে দেবার সিদ্ধান্ত করেছি। আপনি তার পিতা হিসেবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব আপনাকেই দিলাম।'

আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মোহরানার অংক কমাবার প্রস্তাব না দিলেই সুন্দর হতো বলে বোধ করছিলাম। আব্বা বেশি কমাবার দাবি না করেন এ দোয়াই করছিলাম। আব্বা খুবই বিনীতভাবে বললেন 'শ' পাঁচেক কম করলেই চলে।' কাজী সাহেব তাই লিখলেন। আড়াই হাজার মোহরেই বিয়ে পড়ানো হলো।

সেকালে টাকার যে মূল্যমান ছিলো তাতে মধ্যবিত্তের বিয়েতে তিন থেকে পাঁচ হাজারের বেশি মোহর ধরা হতো না। এখনকার ২০০ টাকাও ঐ সময়ের ১ টাকার সমান ক্রয়ক্ষমতা রাখে না। ১৯৫৫ সালে কলেজের চাকরি থেকে অব্যাহতির ফলে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যে টাকা পেলাম তা মাত্র কয়েক হাজার ছিলো। সঠিক অংক মনে নেই। তখনই মোহরের টাকাটা শোধ করে দিলাম।

৪৫.

মোহর ও যৌতুক

আমার বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় আমার স্ত্রীর মোহর ধার্য করার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে ইসলামে মোহর নির্ধারণের গুরুত্ব নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি। ইসলাম পারিবারিক জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামীর উপর ন্যস্ত করেছে। স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণসহ যা প্রয়োজন তা যোগাড় করার দায়িত্ব স্বামীকেই বহন করতে হবে। এ দায়িত্ব পালনে শরীক হবার জন্য স্ত্রীর উপর চাপ দেবার কোন অধিকার স্বামীর নেই।

স্ত্রী তার পিতা-মাতা বা ভাই থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পদ পেয়ে থাকলে বা তার নিজস্ব কোন আয়ের উৎস থাকলে তা থেকে এ পরিবারের জন্য খরচ করতে স্ত্রী বাধ্য নয়।

ইসলাম মোহর ধার্য করে স্ত্রীকে আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যাতে স্বামীর কাছে হাত পাততে না হয় সে জন্যই এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিবাহের সময়ই মোহরের টাকা সবটুকু স্ত্রীকে দেওয়া সবচেয়ে উত্তম। স্ত্রীকে এ অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, স্বামীর বাড়িতে যাবার আগেই মোহরের অর্ধেক দাবি করতে পারবে।

অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আমাদের দেশে স্বামী পক্ষ স্ত্রীকে মোহরের টাকা দেওয়ার পরিবর্তে স্ত্রীর পক্ষের নিকটই নগদ মোহর দাবি করে। ইসলাম স্ত্রীকে যে মোহরের অধিকার দিয়েছে এ অধিকার কতক স্বামী বিবাহ রেজিস্ট্রি করার সময় মৌখিকভাবে স্বীকার করে বটে; কিন্তু বাস্তবে তা আদায় করা কর্তব্য বলে মনে করে না। কাগজে লেখার জন্য বড় অংকও স্বীকার করে নেয়। নগদ দেবারতো প্রশ্নই উঠে না। পরেও দেওয়া কর্তব্য বলে অনেকেই মনে করে না। কিন্তু স্বামী পক্ষ স্ত্রী পক্ষ থেকে নগদ মোহর দাবি করে। এরই নাম কুখ্যাত যৌতুক। কুখ্যাত বলেই যৌতুক নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা হয়েছে। এ আইন এখনো সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যৌতুক বেড়েই চলেছে। যৌতুকের কারণে স্ত্রীর উপর শুধু মানসিক যাতনাই নয়; দৈহিক নির্যাতন পর্যন্ত প্রচলিত হয়ে গেছে। স্ত্রী হত্যার খবর প্রায়ই পত্রিকায় দেখা যায়। আল্লাহর বিধান হিসেবে ইসলামকে বাস্তবে মেনে চলার সত্যিকার মনোভাবের অভাবেই যৌতুকের মতো নির্লজ্জ কুপ্রথা এতো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বিবাহ পুরুষ ও নারীর সমান প্রয়োজন। পাত্র পক্ষ থেকে যৌতুকের দাবি দেখে মনে হয়, পাত্রের যেন স্ত্রী পাওয়ার কোন ঠেকা নেই, যৌতুকটাই আসল উদ্দেশ্য এবং স্ত্রী যেন ফাও। যৌতুক না হলে স্ত্রীর যেন প্রয়োজনই নেই।

যৌতুক দাবি করার যুক্তিটা কী? কনের পিতা তার কন্যাকে লালন-পালন করে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত যাবতীয় খরচ করেছে। বিয়ের সময়ও বরযাত্রীদের আপ্যায়নে বিরাট খরচ করতে হয়। আরও আনুষঙ্গিক অনেক খরচ রয়েছে। বিয়ের পরও পিতা জীবিত থাকা পর্যন্ত কন্যাকে বাড়িতে বেড়াতে আনতে খরচ করে। স্বামী ও স্বামীর সন্তানাদিসহ কন্যাকে আপ্যায়নে আজীবনই কনের পিতাকে খরচ করতে হয়। স্বামীকে স্ত্রীর পিতা-মাতার জন্য খরচ করা জরুরি নয়। তাহলে কোন অধিকারে কনে পক্ষের নিকট বর যৌতুক দাবি করতে পারে? যৌতুকের দাবিটা চরম অভদ্রতা, অসভ্যতা, অমানবিক, অন্যায় ও জঘন্য যুলুম।

শালীন বিয়ে

ইসলামের দৃষ্টিতে ভদ্র ও শালীন পদ্ধতির বিয়েতে যা হওয়া উচিত ঃ

পাত্র পক্ষ বা বৌ হিসেবে যে কনেকে ঘরে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে-ই সাধ্যমতো অলংকারাদি ও কাপড়-চোপড় দেবে। এ ব্যাপারে কনে পক্ষ থেকে বর পক্ষের উপর চাপ প্রয়োগ করা মোটেই সমীচীন নয়। উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে পাত্রীকে সাজাবার ব্যাপারে সমঝোতা করা দূষণীয় নয়। আমার বড় ছেলেকে বিয়ে করাবার সময় পাত্রীর পিতাকে আমি বলেছি, 'যাকে আমি বৌ হিসেবে বাড়িতে নিতে চাই তাকে সাজাবার ব্যবস্থা করা আমারই কর্তব্য। বিশেষ করে গলা ও হাতের অলংকারের ব্যবস্থা করা অবশ্যই জরুরি। এটুকু না হলে কনের মনটা ছোট হয়ে থাকবে। এ দুটো যদি আমাকেই ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে যে মানের অলংকার দেওয়া উচিত তা আমার সাধ্যে কুলায় না। যদি দুটোর একটার দায়িত্ব আপনি নিতে রাজি হন তাহলে বৌকে মনের মতো একটা অলংকার দেওয়া আমার জন্য সহজ হয়।' কনের পিতা খুব সন্তুষ্টচিত্তে আমার এ প্রস্তাব কবুল করলেন।

পাত্রী পক্ষের সাথে বিবাহ সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনার জন্য আমার যে আত্মীয়কে দায়িত্ব দিলাম তাকে স্পষ্ট ভাষায় বললাম, 'পাত্রকে কোন কিছু দেবার দাবি করবেন না। তারা খুশি হয়ে তাদের জামাতাকে যা দিতে চান দেবেন। এ বিষয়ে কোন আলোচনাই করবেন না।' তিনি বললেন, 'আপনি তো কিছু চাইতে নিষেধ করলেন। কিন্তু পাত্র যদি আমাকে দোষারোপ করে যে, আমি কেনো চেষ্টা করলাম না।' আমি বললাম, 'আমার ছেলে আল্লাহর ফযলে এমন অসভ্য নয় যে, এমন কথা আপনাকে বলবে।'

বিবাহ পারিবারিক জীবনে সবচেয়ে আনন্দের বিষয়। উভয়পক্ষের মধ্যে লেন-দেনের ব্যাপারে যদি চাপাচাপি হয় তাহলে ঐ আনন্দ চরম বিষাদে পরিণত হয়। দু'পক্ষের সম্পর্কের মধুরতা ধ্বংস হয়ে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। আমি বেশ কয়টি বিয়েতে লক্ষ্য করেছি যে, বর পক্ষ বিয়ের দিন কনের জন্য যে সব জিনিস এনেছে এর মান কনে

পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে না হওয়ায় এ নিয়ে বচসা ও ঝগড়ায় বিয়ের অনুষ্ঠান ঘণ্টার পর ঘন্টা বিলম্বিত হয় এবং বরযাত্রীরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিব্রত হয়ে এ অন্যায় সহ্য করতে বাধ্য হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত যেহেতু খাদ্য বিতরণ হয় না সেহেতু ঝগড়া মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে হয়। এমন ধরনের কয়েক বিয়েতে বরযাত্রী হবার তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আমি মন্তব্য করেছিলাম যে, নিজের বিয়ে ছাড়া আর কারো বিয়েতে যাবার আগে কনে পক্ষ কতটা ভদ্র তা না জেনে যাবো না।

বিয়ের দিনের এ জাতীয় তিক্ততার রেশ উভয় পরিবারে দীর্ঘকাল বিরাজ করে এবং বিয়ের মতো আনন্দময় বিষয়কে বিষাদে পরিণত করে।

আমার বিয়ের অনুষ্ঠানের পর

এশার নামাযের পর আমিসহ বরযাত্রী ও অন্যান্য মেহমানদের খাওয়া শেষ হলে আমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলো। বরের সাথে কনের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয় এর নাম দেওয়া হয়েছে রুসমাত বা রুসূমত। এ শব্দটি ফার্সি ভাষার। এর অর্থ প্রথা বা রেওয়াজ। এ অনুষ্ঠানটিকে অত্যন্ত উপভোগ্য করার জন্য এমন ব্যবস্থা হয়, যা শরীআতের দিক দিয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কনের যুবক আত্মীয়রা– যেমন চাচাত, মামাত, ফুফাত, খালাত ভাইয়েরা এবং আত্মীয় ও প্রতিবেশী যুবতী অবিবাহিতা মেয়েরা সেখানে জড়ো হয়। পুরুষেরা তামাশা দেখে। আর মেয়েরা নানাভাবে দুলাকে ঠাট্টা-মশকরা করে এবং বিব্রত করে মজা পায়।

কনের দাদী ও নানী সম্পর্কিত মুরুব্বিরাই এ অনুষ্ঠানে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে এ সব ধারণা মোটামুটি আমার ছিলো। তাই শঙ্কিত মনেই বাড়িতে ঢুকলাম। কনের ছোট দু'ভাই মাত্র তখন কিশোর বয়সের, আর দু'জন আরও ছোট। তারা ছাড়া সেখানে আর কোন যুবক না থাকায় আশ্বস্ত হলাম। কোন যুবতীকেও না দেখে শরীআতের দিক দিয়ে নিশ্চিত হলাম।

রুসূমাতের অনুষ্ঠান

ঐ অনুষ্ঠানে আমার নানী শাশুড়ি নেতৃত্ব দিলেন। তিনি খুব বৃদ্ধা ছিলেন না। আমার দাদী শাশুড়ি বেশ বৃদ্ধা ছিলেন। আমার স্ত্রীর আসল নানীর ইন্তিকালের পর তার নানা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তিনি বয়স্কা হলেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি বেশ যোগ্যতার সাথেই ঐ অনুষ্ঠানে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন। আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে ১০/১১ বছরের ৫/৬ জন ও আরও কম বয়সের ডজনখানেক মেয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলো। দুষ্টামির দায়িত্ব পালন করে মাত্র ২/৩ জন। এর মধ্যে একজন দূর সম্পর্কের শালী। আপন শালী পর্দার বয়স হওয়ায় সেখানে অনুপস্থিত।

আমার পাশে কনেকে এমনভাবে বসান হলো যে, আমরা একে অপরকে দেখতে পাচ্ছি না। দু'জনই পাশাপাশি বসে সামনে উপস্থিত সবাইকে দেখছি। অবশ্য কনে ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় রয়েছে। নানী শাশুড়ি একটি আয়না এনে কনের সামনে ধরলেন এবং আমাকে আয়নার ভেতরে তার নাতনীর চেহারা মুবারক দেখার নির্দেশ দিলেন। আমি এভাবেই প্রথম আমার জীবন সাথীর চেহারা দেখার সুযোগ পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'সরাসরি দেখা নিষেধ নাকি?' অভিজ্ঞ নানী শাশুড়ি জওয়াব দিলেন, 'এভাবেই পরিচয় শুরু করতে হয়।'

অনৈসলামী প্রথা

আমাদের দেশে রুসূমাতের অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীদের উপস্থিতি এমন এক শক্তিশালী প্রথায় পরিণত হয়েছে যে, শরীআতের দোহাই দিয়েও এ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। ইসলামী ছাত্র শিবিরের এক নেতার বিয়েতে সে মহাসমস্যায় পড়লো। দূর সম্পর্কের এক নানী শাশুড়ি অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। বর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাকে বললো যে, এখানে পাত্রীর আপন ভাই ছাড়া অন্য যুবকদেরকে চলে যেতে বলুন। বুড়ি ক্ষেপে গিয়ে একথা বলতে বলতে অনুষ্ঠান থেকে চলে গেলো যে, 'আমার নাতিকে যে অপমান করলো তার বিয়েতে আমি থাকবো না।' শেষ পর্যন্ত বরকে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

বিয়ের হলুদ অনুষ্ঠান, নববধূকে বরের বাড়িতে বরণ অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে এমন সব ইসলাম বিরোধী কুপ্রথা মুসলিম সমাজেও প্রচলিত রয়েছে, যা দূর করা সহজ নয়। কুপ্রথা আইনের চেয়েও শক্তিশালী। আইন জারি করতে সরকারি প্রয়োগ সংস্থার (Law Enforcing Agency) প্রয়োজন হয়। কুপ্রথা নিজস্ব শক্তিবলেই চালু থাকে। ইসলামের বিধান জানা ও তা মেনে চলার যারা সিদ্ধান্ত নেয় তারাই শুধু এ সব কুপ্রথা ত্যাগ করতে সক্ষম।

তাই বিয়ের সম্পর্ক করার আগে উভয় পরিবারের দীনের ব্যাপারে মিল আছে কিনা তা না জেনে কোন দীনদার পাত্র বা পাত্রীর বিয়ের সিদ্ধান্ত করা মোটেই উচিত নয়। এ মিলকে ইসলামী পরিভাষায় 'কুফু' বলা হয়। সাধারণত বিয়েতে উভয় পরিবারে শিক্ষার মান, আর্থিক মান, সামাজিক মর্যাদার মান, পেশাগত ও বংশগত মান তালাশ করা হয়। অথচ দীনের দিক দিয়ে মান নির্ণয়ে গুরুত্ব দেওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি বলে রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন।

ধনী মুসলিম পরিবারে দেখা যায় যে, মুসলিম চেতনার অধিকারী এবং নামায-রোযায় অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও বিবাহে প্রচুর টাকা ব্যয় করতে গিয়ে ব্যান্ডপার্টি ও গান-বাজনার ব্যবস্থা করে থাকে। পানচিনি অনুষ্ঠানে উভয়পক্ষের নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনী, বর ও কনের হলুদ অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের যৌথ হলুদ মাখাবার অশ্লীল প্রতিযোগিতা

ইত্যাদি মুসলিম ধনীদের পরিবারে প্রচলিত রয়েছে। পাপ করতেই টাকা-পয়সা বেশি লাগে। যাদের টাকা বেশি আছে তাদের পাপ পথে খরচ করার যোগ্যতাও বেশি।

ধনীদের নৈতিক শিক্ষা

আল্লাহ তাআলা ধনীদেরকে নৈতিক মান রক্ষার যোগ্য বানাবার জন্য যাকাত ও হজ্জ ফরয করেছেন। কালেমা তাইয়েবার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের (স) তরীকা অনুযায়ী জীবনযাপনের যে ওয়াদা আল্লাহর সাথে করা হয়েছে, সে অনুযায়ী চলার যোগ্যতা অর্জনের জন্যই ৫ ওয়াক্ত জামায়াতে নামায ও রমযানের রোযা সবার ওপর ফরয করা হয়েছে। কিন্তু ধনীদের জন্য এ দুটো ট্রেনিং-এর বিধান যথেষ্ট নয়। ধনীদের পক্ষে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করার যোগ্যতা বেশি। তাই তাদেরকে তা থেকে ফিরে থাকার যোগ্য হতে হলে যাকাত ও হজ্জ জরুরি।

আল্লাহ পাক যে সব কাজ হারাম করেছেন তা থেকে ফিরে থাকার জন্য টাকা-পয়সা খরচ করতে হয় না। কিন্তু এ সব কাজ টাকা ছাড়া করা যায় না। নাচ-গানের ব্যবস্থা করা, মদ খাওয়া, পরনারী ভোগ করা ইত্যাদি কোনটাই গরীবের পক্ষে করা সহজ হয় না। ধনীরাই এ সব করার যোগ্য। তাই তাদেরকে যাকাত ও হজ্জের মাধ্যমে এ সব থেকে ফিরে থাকার যোগ্য বানানো হয়।

যাকাত ধনীকে শিক্ষা দেয়–

১. ধনের আসল মালিক আল্লাহ। তাই হালাল পথে আয় করতে হবে এবং হালাল পথেই খরচ করতে হবে। কারণ যাকাত হালাল উপায়ে আয় থেকেই দিতে হয়।

২. আল্লাহর হুকুমে যাকাত দেবার পর যে মাল ধনীর হাতে থাকে এর মালিকানা আল্লাহর বলেই স্বীকার করতে হবে। তাই আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে অপচয় করা চলবে না।

৩. সমাজের অভাবীদের প্রতি কর্তব্য পালনে খরচ করতে হবে। তাই বাজে কাজে খরচের মনোভাব ত্যাগ করতে হবে।

হজ্জ ধনীকে শেখায়–

১. ধন বেশি আছে বলেই বিলাসিতায় মত্ত হয়ো না। ধনী হয়েছো বলেই ননীর পুতুল সেজোনা। হজ্জ করার সময়কার দৈহিক কষ্ট করার যোগ্য হও।

২. যত বড় লোকই হয়ে থাকো সেলাইবিহীন দু'টুকরা কাপড় পরে সকল পদবির মুকুট ফেলে দিয়ে খালি মাথায় মক্কা, মিনা ও আরাফাতে আল্লাহর প্রেমিকদের সাথে একাকার হয়ে যাও।

৩. ধন ও মানের তুচ্ছ অহমিকা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ-প্রেমে পাগল হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করো। তাওয়াফকারী কারো চেয়ে তুমি নিজেকে বড় মনে করো না।

৪. আরাফার ময়দানে মহান মনিবের সামনে মাথানত করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে ধনের গৌরব ত্যাগ করো। তুমি রাজা, বাদশা, শাসক ও বড়কর্তা হয়ে থাকলেও এ কথা স্মরণ করো যে, ইহরামের মতো দু'টুকরা কাপড়ে মুড়েই তোমাকে কবরে রাখা হবে। ধন ও ক্ষমতার দাপটে যতো পাপ করেছো তা থেকে মনিবের দরবারে ধরনা দিয়ে ক্ষমা চাও এবং আর পাপ না করার সিদ্ধান্ত নাও।

৫. হজ্জের পর গোনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়ার তৃপ্তি নিয়ে বাকি জীবন কালেমার ওয়াদা পালন করে চলো।

স্ত্রীকে নিয়ে চান্দিনা প্রত্যাবর্তন

বিয়ের পরদিন বরযাত্রীসহ দীর্ঘ সফর করে চান্দিনা ফিরে এলাম। ফেরার পথে ঐ একই নিয়মে বাসে শুরু, ট্রেনে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সকালে কুমিল্লা রেলস্টেশন থেকে বাসে চান্দিনায় পৌঁছতে হলো। বাহাদুরাবাদ ঘাটে রাতে ট্রেনে জায়গা যোগাড় করতে বিরাট ঝামেলা পোহাতে হলো। স্ত্রীর সাথে আমার নানী শাশুড়ি এলেন।

আম্মা আমার নানী শাশুড়িকে বললেন, আমার শাশুড়ি বলতেন যে, 'তোমার এ ছেলেকে বিয়ে করাবার সময় দাদী ও নানী শাশুড়ি দেখে বিয়ে করাবে। সে যে রকম রসিকতা আমার সাথে করে সে রকম রসিকতার সুযোগ তার দরকার। মনে হয় আমার শাশুড়ির দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছেন। আমাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছাড়াই আল্লাহ্ আমার ছেলের জন্য দাদী ও নানী শাশুড়ির ব্যবস্থা করেছেন।'

৪৬.

বিয়ে এক মহা ঘটনা

সাধারণত জীবনে একবারই বিয়ে হয়। একাধিক বিয়ে আমাদের দেশে অন্তত শিক্ষিত সমাজে খুবই কম। স্ত্রী মারা গেলে অবশ্য বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হয়। তা না হলে একই সময় একাধিক স্ত্রী আরবে বেশ সংখ্যায় থাকলেও আমাদের দেশে বিরল। একাধিক বিয়ে করে পারিবারিক জীবনে শান্তি বহাল রাখার উদাহরণ আরও বিরল।

বিয়ে সত্যি জীবনে এক মহা ঘটনা। বিয়ের পূর্বে নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বিষহ মনে হয় না। বিয়ে করার পর স্ত্রীর মৃত্যু বা তালাকের কারণে স্ত্রীহারা অবস্থায় জীবন খুবই বিষাদময় বোধ হয়। বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত নিঃসঙ্গতায় অভ্যস্ত থাকায় স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটতে থাকে। কিন্তু বিয়ে জীবনে এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করে। অভ্যস্ত জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনে। একটি মহিলা জীবন সাথী হিসেবে এসে দৈনন্দিন রুটিন সম্পূর্ণ বদলে দেয়। যত বেশি সময় সম্ভব জীবন সাথীর সান্নিধ্যে থাকতে চায়।

আমার জীবনে বিয়ের প্রতিক্রিয়া

আগেই বলেছি যে, আমি বিয়ে আরও বিলম্বে করতে চেয়েছিলাম। এখনি আমার স্ত্রী পেতে হবে এমন কোন তাড়া ছিলো না। আরও কয়েক বছর বিয়ে না করলেও হয়ত চলতো। কিন্তু বিয়ের পর মনে হলো যে, নিঃসঙ্গ জীবন কোন জীবনই নয়। আমি বিস্মিত হলাম যে, একটি নতুন মানুষ এসে আমাকে কেমন করে এভাবে দখল করে ফেললো। কোনদিন যার সাথে দেখা-পরিচয় ছিলো না এমন একজন মানুষ এমন আপন হয়ে গেলো যে, এর চেয়ে ঘনিষ্ঠ আর কেউ নয়।

আল্লাহ তাআলা সূরা আর রূমের ২১ নং আয়াতে বলেন, 'এটাও আল্লাহর এক নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও দয়ার ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।'

বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের জীবনে যে শান্তি ও সুখ লাভ হয় এবং উভয়ের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি সৃষ্টি হয় তা আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। অপরিচিত দু'জন মানুষ বিয়ের মাধ্যমে একে অপরের জীবন সাথী হবার পর তাদের মধ্যে যে গভীর ভালোবাসা ও সহমর্মিতা গড়ে ওঠে তা তাদের স্রষ্টাই ব্যবস্থা করেন। এ সম্পর্ক সৃষ্টি করার সাধ্য আর কারো নেই। উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক দাবি করে বলছেন, এটা একমাত্র তাঁরই দান। এটা তাঁরই নিদর্শন। একমাত্র চিন্তাশীলরাই এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম। একজন আর একজনের জন্য যে ভালোবাসা ও দয়া অনুভব করে তা সত্যিই বিস্ময়কর। যে দম্পত্তির মধ্যে এ ভালোবাসা ও দয়া গভীর না হয় তাদের জীবনে সুখ-শান্তির গন্ধও নেই।

আল্লাহর বিধান অমান্য করে যারা একে অপরের প্রতি দৈহিকভাবে আকৃষ্ট হয়ে বিয়ে ছাড়াই ঘনিষ্ঠ হয় তাদের মধ্যে ঐ রকম সুখ-শান্তি স্থায়ী হওয়া স্বাভাবিক নয়। প্রাথমিক মোহ কেটে যাবার পরই তাদের সম্পর্ক ঢিলে হতে থাকে। তাই দেখা যায় যে, বিবাহ-পূর্ব প্রেম করে যে সব বিয়ে হয় তাতে ঐ মানের ভালোবাসা ও দয়া কমই দেখা যায়। তাদের মধ্যে ঐ রকম নিষ্ঠা, দয়া ও ত্যাগের মনোভাব গড়ে উঠে না। তাদের মধ্যে পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্কই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। সত্যিকার নিঃস্বার্থ জীবন সাথী শরীআতসম্মত বিয়ের মাধ্যমেই হাসিল হয়।

ঐ আয়াতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে, আল্লাহর এ ঘোষণা যে, তিনি দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব কায়েম করে দেন। এখানে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা চমৎকার। তারা দু'জনই দু'জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং একের প্রতি অপরে দয়াশীল। সত্যিকার বন্ধু হলে তো আপদে-বিপদে দয়ার প্রকাশ স্বাভাবিক।

আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, বহু দীনদার পরিবারেও স্ত্রীকে বন্ধুত্বের মর্যাদা দেওয়া হয় না। স্ত্রী যেন শুধু সেবিকা বা খাদেমা। স্বামীর সেবাই তার প্রধান দায়িত্ব। পরিবারের যাবতীয় ঝামেলা স্ত্রীকেই পোহাতে হয়। স্বামী এ সব দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা প্রয়োজন মনে করে না। স্বামী হয়ত সাপ্তাহিক ছুটির দিন অবসর ভোগ করে। স্ত্রীর কোনো ছুটি তো নেই-ই; বরং স্বামী ছুটির দিনে বাড়িতে থাকলে স্বামীর খেদমতের প্রয়োজনে স্ত্রীর কাজ আরো বেড়েই যায়।

আল্লাহ্ স্ত্রীকে স্বামীর বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছেন। পরিবারের যাবতীয় ব্যাপারে স্বামী যদি স্ত্রীকে পরামর্শে শামিল করে এবং তার মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেয় তাহলে স্ত্রীর মানও বৃদ্ধি পায়। সন্তানদের সামনে যদি স্ত্রীকে ধমকায় তাহলে বন্ধুত্বের মর্যাদা থাকে না। সন্তানরা ভাবে যে, তাদের মা তাদের বাবার কর্মচারী। এ অবস্থায় ছেলে-মেয়েদের দৃষ্টিতে মায়ের মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হয়। তারা যদি দেখে যে, পিতা তাদের মাকে মর্যাদা দেয় এবং সম্মান রক্ষা করে আচরণ করে, তাহলে সন্তানরাও ভবিষ্যতের জন্য সুশিক্ষা পায়। সন্তানরা যদি মায়ের সাথে সামান্য বেয়াদবিও করে, পিতাকে মায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য সন্তানদেরকে স্নেহের সাথে শাসন করতে হবে।

স্নেহের শাসনের উদাহরণ

আমার বড় ছেলে মামুন তখন ক্লাস এইটে পড়ে। জামায়াতের অফিস তখন নাখালপাড়ায় ছিলো। রাত দশটায় বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর বিষণ্ন মুখ দেখে চিন্তিত হলাম। যত বিলম্বেই ফিরি কখনো তাকে এমন দেখিনি। কারণ আমার উপর তার এ আস্থা আছে যে, বিনা প্রয়োজনে বাড়িতে ফিরে আসতে রাতে দেরি করি না। বুঝলাম যে, অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে। সহানুভূতির সাথে জিজ্ঞেস করলাম 'কী হয়েছে'? সাথে সাথে জওয়াব পেলাম না। তাকিয়ে দেখি চোখ ছল ছল। আরও শঙ্কিত হলাম। আবার জিজ্ঞেস করলাম 'ব্যাপার কী! বলছো না কেনো?' একটু রাগত স্বরে জওয়াব এলো 'আপনার ছেলে আমার সাথে বেয়াদবি করেছে'। বিস্ময়ের স্বরে জানতে চাইলাম 'কোন্ ছেলে?' জওয়াব পেলাম 'বড় ছেলে'।

ছেলে তো আমার একার নয়, দু'জনেরই। তবুও সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সময় পিতা ও মাতা এভাবেই একে অপরকে বলে থাকে, তোমার ছেলের কীর্তি দেখেছো? তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখো। তোমার ছেলেটা গোল্লায় গেলো ইত্যাদি।

মামুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে রাগান্বিত বোধ করলাম। ভাবলাম কী করি? রাগের মাথায় মারধর করা আমার অভ্যাস নয়। তাছাড়া ইতঃপূর্বে এমন আচরণ সে করেনি। রাগ দমন হলো। ছেলেকে ডেকে শান্তভাবে বললাম 'তুমি কি বেহেশতে যেতে চাও?' মাথা নেড়ে ইতিবাচক জওয়াব দিলো। অসময়ে ডেকেছি বলে সে অপরাধীর মতোই মাথা নিচু করে বসে রইলো। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তো নিশ্চয়ই জানো যে, মায়ের

পায়ের নিচে বেহেশত। সে এবারও মাথা নেড়েই জানে বলে বুঝালো। তুমি নাকি তোমার আম্মার সাথে বেয়াদবি করেছো? সে নিশ্চুপ থেকে অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গিতে মাথা আরও নত করলো। বুঝলাম অনুতপ্ত। তওবার প্রাথমিক কর্তব্য হলো অনুতাপ। এরপরই ক্ষমা চাওয়ার পালা। বললাম, চলো পাশের কামরায় তোমার আম্মার কাছে নিয়ে যাই। ওর হাত ধরে দাঁড় করাবার পরই লক্ষ্য করলাম যে, ওর চোখে পানি। মায়ের কাছে পৌঁছেই মার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে কান্না শুরু করলো। ক্ষমার কোনো কথা উচ্চারণ করার প্রয়োজন হলো না, সাধ্যও ছিলো না। মা-ছেলেকে তুলে বুকে জড়িয়ে সে-কি কান্না। মা ও ছেলেকে এভাবে কাঁদতে দেখে আমার চোখেও আনন্দাশ্রু বইতে লাগলো। শাসনের এ প্রক্রিয়ার সাফল্য আজীবন আমার কাজে লেগেছে।

তওবার শেষ পর্যায় হচ্ছে আর অপরাধ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ ছেলে আর কোনো দিন মায়ের সাথে এমন আচরণ করেনি, যাতে মা সামান্যও অসন্তুষ্ট হবার কারণ ঘটে। বুঝা গেলো যে, স্নেহের শাসনের সুফলই স্থায়ী হয়।

সন্তানদেরকে শাসন করার ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আরো একটা বিষয় বুঝতে পেরেছি। ছোট ভাই-বোনদের সামনে ওদের বড় কাউকে ধমকালে বা মারলে ছোটদের সামনে সে অপমানিত হবার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সামান্য দোষেই সে ছোট ভাই-বোনদেরকে মারধর করে। শাসনের সুফল পেতে হলে কারো ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ন করা উচিত নয়। ছোট সন্তানদের সামনে বড় সন্তানকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া সুশাসন হতে পারে না।

স্ত্রীর যথার্থ মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব স্বামীর এবং সন্তানদের মর্যাদা বহাল রাখার দায়িত্ব তাদের পিতা-মাতার। আসলেই স্নেহের শাসনের কোনো বিকল্প নেই। যে বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাগারাগি বা ঝগড়া-ঝাটি হয় সে পরিবারে সন্তানদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠা সম্ভব নয়। মানবিক আচরণই মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। অন্যপন্থায় সত্যিকার সংশোধন করা যায় না।

আরো একটি অনুভূতি

বিয়ের পর একটি বিশেষ অনুভূতি আমাকে এমন তৃপ্তি দিতো যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একটি মানুষ একান্তই আমার, আর কেউ এতে শরীক নেই। তার বাপ-মা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে যে সম্পর্ক সেটা অন্য ধরনের। আমার একান্ত জীবন সাথী হিসেবে এ মানুষটি শুধুই আমার। এমন জীবন সাথী আর কেউ নেই। এ অনুভূতির কারণেই তার প্রতি আমি এক ব্যাপারে অবিচারই করে ফেলেছি। তাকে আমি সব সময় কাছে রাখার চেষ্টা করেছি। যার ফলে তার শিক্ষা জীবন অব্যাহত থাকেনি। ফাযেল পরীক্ষা দিতে হলে তাকে আমার শ্বশুর সাহেবের নিকটই থাকতে

হয়। তিনি তার কন্যাদেরকে বাড়িতে নিজে পড়াতেন এবং পরীক্ষা দেওয়াতেন। এভাবেই আমার স্ত্রী আলেম পাস করে। আমি তার শিক্ষা জীবনে বাধা সৃষ্টি করলাম।

আমার জীবনে এটা নীতিগত একটা বিরাট ভুল করে ফেললাম। আমি এ ভ্রান্ত ধারণায় ছিলাম যে, স্ত্রীকে যখন চাকরি করতে হবে না, তখন ডিগ্রি ও উচ্চ শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ডিগ্রি নেবার চেষ্টা করলেই তো শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়। জ্ঞান চর্চার জন্য যে পরিমাণ ভাষা-জ্ঞান অপরিহার্য তা তার ছিলো বলে আমি ডিগ্রি হাসিলের গুরুত্ব উপলব্ধি করিনি। যদি ডিগ্রি নিতে দিতাম তাহলে খুবই ভালো হতো। এ কথা যখন উপলব্ধি করলাম, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। তাকে আমি সব সময় কাছে রাখবো, এ স্বার্থপর সিদ্ধান্তটাই আমার অপরাধ ছিলো।

অথচ তার বড় বোন অধ্যাপিকা সাইয়েদা যাকিয়া খাতুন আমার শ্বশুর সাহেবের চেষ্টায় এ দেশে প্রথম মহিলা কামেল পাসের গৌরব অর্জন করেছেন। গার্লস স্কুলে আরবী শিক্ষিকা হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজে ডবল এমএ পাস করেন এবং ঢাকার সোহরাওয়ার্দী ডিগ্রি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। আমি তার বোনকে এ পথে এগুতে না দেবার জন্য আফসোস করছি।

পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সময় নেযামে ইসলাম পার্টির প্রাদেশিক জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সাইয়েদ মুসলেহুদ্দীনের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়। দেখা গেলো যে, আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং সম্পর্কটাও মধুর। তিনি নানা আর আমি নাতি। তিনি খুব রসিক ছিলেন। নাতি হিসেবে ঠাট্টা করার সুযোগ পেয়ে পারিবারিক অনেক কথা জানতে চাইলেন। মাওলানা সাহেব কিশোরগঞ্জের হযরতনগর কামেল মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। আমার স্ত্রীকে ফাযিল পরীক্ষা কেন দেওয়ালাম না সে জন্য আমাকে মন্দশন্দ বললেন।

তিনি এ প্রসঙ্গে উৎসাহের সাথে উল্লেখ করলেন যে, এ দেশে একটি মেয়ে কামেল পাস করার খবর কামেল মাদ্‌রাসাগুলোর জানা আছে। বিরল ঘটনার কারণে মেয়েটির নামও আমরা মনে রেখেছি। জানতে চাইলে বললেন 'যাকিয়া'। আমি তার সাথে সজোরে হ্যান্ডশেক করে বললাম 'তারই ছোট বোন আফিফা আমার স্ত্রী'। তখন তিনি রীতিমত ভর্ৎসনা করলেন যে, তার বোনকে কেনো এগুতে দিলাম না। তিনি এরপর আমার শ্বশুর সম্পর্কে আরো জানতে চাইলেন এবং তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানালেন।

বিয়ে জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট

১৯৫৪ সালে আমি যখন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের এক উর্দুভাষী অধ্যাপক মুহাম্মদ ওয়ায়ের ঢাকা শহর

জামায়াতের আমীর ছিলেন। রুকন বানাবার ব্যাপারে তিনি এ নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে, অবিবাহিত কোনো লোককে রুকন বানানো উচিত নয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলতেন যে, আন্দোলনে অগ্রসর হবার পরেও বিপরীত পারিবারিক পরিবেশে বিয়ে করায় আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়ার উদাহরণ রয়েছে।

গরীব পরিবারের মেধাবী ছাত্র ধর্মীয় পরিবেশে গড়ে উঠা সত্ত্বেও বড় চাকরি পেয়ে ধনী পরিবারে বিয়ে করে স্ত্রীকে ইসলামের দিকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়ে স্ত্রী ও শ্বশুর পরিবারের কালচারই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এমন উদাহরণ আমার বেশ জানা আছে। দীনদার পরিবারের ছেলে তথাকথিত খান্দানী পরিবারের মেয়ে বিয়ে করে নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য বহাল রাখতে ব্যর্থ হতে দেখেছি।

তাই বিয়ের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজনের কন্যাকে পর্দার সাথে গড়ে তুলবার পর যে ছেলের নিকট বিয়ে দিলেন তার পরিবারে পর্দার বালাই নেই। সে ছেলে ওলিমায় আমাকে দাওয়াত দিলো। সামাজিকতার দাবিতে যেতে হলো। কন্যার পিতা আমাকে অনুরোধ করলেন, যেনো আমি ছেলেকে পর্দার ব্যাপারে উপদেশ দেই। আমি বললাম, ছেলের মধ্যে ঈমান ও ইসলামের মানসিকতা সৃষ্টি না করে পর্দার নসিহত অর্থহীন। বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বেই ছেলের দীনী হাল দেখা প্রয়োজন।

৪৭.

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব

আমার বিয়ে সম্পর্কে আলোচনার প্রসঙ্গ হিসেবে ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

আল্লাহ তাআলা মানব বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে মিলনকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনেই উভয়ের মধ্যে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে নৈতিক জীব হিসেবে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে পারিবারিক বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকসহ অন্যান্য বিষয়ে এতো বিস্তারিত পরিপূর্ণ বিধান দেননি। মৌলিক কতক বিধান দিয়ে এর ভিত্তিতে বিস্তারিত বিধান রচনার দায়িত্ব মানুষকে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু পারিবারিক ব্যাপারে এমন পরিপূর্ণ বিধান দান করেছেন, যাতে মানুষকে এ বিষয়ে কোন বিধি প্রণয়ন করার দরকার না হয়।

আল্লাহ তাআলা পারিবারিক ব্যবস্থাকে সঙ্গত কারণেই এতো গুরুত্ব দিয়েছেন। মানব সমাজের ক্ষুদ্রতম ও প্রাথমিক ইউনিটই হলো পরিবার। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে মানে গড়ে তোলা পছন্দ করেন এর জন্য পরিবারই হলো প্রথম শিক্ষালয়। একটি

সত্যিকার সভ্য মানব সমাজ গড়তে হলে পরিবারকেই ভিত্তি হিসেবে গড়তে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা সুন্দরতম পরিবার গড়ার জন্য বিস্তারিত বিধান নিজেই রচনা করে দিয়েছেন।

বিবাহই হলো পারিবারিক বিধানের শুরু। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে তা এমন তীব্র ও প্রচণ্ড যে, মানুষ আকৃষ্ট হতে বাধ্য। বিয়ে ছাড়া যেনো নারী-পুরুষের মিলন না ঘটে এ বিষয়ের উপর ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। পবিত্র যৌন সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম হিসেবেই বিয়ের গুরুত্ব।

ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অবিবাহিত থাকা

আমার এক ফুফাত ভগ্নিপতির বড় ভাই সমাজে দরবেশ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিয়ে করেননি। আলেমানা পোশাক পরে লম্বা লাঠি হাতে চলাফেরা করতেন। সারাবছর রোযা রাখতেন। মানুষকে নেক হওয়ার নসীহত করতেন। মন্দ কাজ দেখলে ক্ষেপে যেতেন এবং লাঠি দেখিয়ে নিবৃত্ত করতেন। মানুষ তাকে সমীহ করতো। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'বিয়ে করেন না কেনো?' জওয়াব দিলেন, 'আমি আল্লাহকে পেতে চাই। সংসারে জড়িয়ে পড়তে চাই না।' একদিন বোনের সাথে দেখা করতে যেয়ে দেখি আমার ভাগ্নে (তাঁর ভাইপো) তাঁর কোলে এবং পরম স্নেহের সাথে তিনি তাকে নিয়ে খেলা করছেন। বোনকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আপনার বাচ্চাদেরকে খুব আদর করেন মনে হয়। বোন বললেন, 'আদর মানে কি, আমি পর্যন্ত তার সামনে নিজের সন্তানকে ধমক দিতে সাহস পাই না।'

তাঁর নাম ওমরী দরবেশ। আমি তাঁকে বললাম, আপনি ফিতরাতের বিরুদ্ধে চলতে গিয়ে পরাজিত হয়েছেন। সংসারে জড়িয়েই আছেন। শুধু শুধু বিয়ে না করে জীবনটা নষ্ট করলেন। জওয়াবে বললেন, তোমরা বুঝবে না। আমাকে এভাবেই থাকতে দাও।

হাদীসে আছে, একদিন তিন ব্যক্তি মদীনার মসজিদে হাযির হলেন। এরা খ্রিস্টান পাদ্রী ছিলেন। ইসলাম কবুলের পর রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। ঐ সময় রাসূল (স) মসজিদে হাযির ছিলেন না। যারা মসজিদে ছিলেন তাদের কাছ থেকে তারা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, রাসূল (স) সারা রাত জেগে থাকেন না, সারাবছর রোযা থাকেন না এবং তিনি বিয়ে-শাদীও করেছেন। খ্রিস্টান পাদ্রী হিসেবে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বৈরাগ্য জীবনেই তারা অভ্যস্ত ছিলেন। তাই তারা মনে করলেন যে, তিনি রাসূল হওয়ার কারণে কম ইবাদত করলেও চলে। আমাদের এতো কম ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকা চলে না। তারা যোশের সাথে এক-একজন এক-একটি সংকল্প ঘোষণা করলেন।

একজন বললেন, 'আমি সারা রাত না ঘুমিয়ে ইবাদতে মশগুল থাকবো।' আর একজন বললেন, 'আমি সারা বছর রোযা থাকবো।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি সারা

জীবনও বিয়ে করবো না।' তারা এ কথাগুলো যোশের চোটে জোরে জোরে বলায় হুজরা থেকে রাসূল (স) শুনতে পেলেন। মসজিদ ও হুজরার মাঝখানে খেজুর পাতার বেড়া থাকায় শুনা গেলো। তিনি মসজিদে এসে অপরিচিত লোকদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সব কথা কি তোমরা বলেছো?' তারা হ্যাঁ-সূচক জওয়াব দিলেন।

রাসূল (স) বললেন, 'জেনে রাখবে, তোমাদের মধ্যে আমিই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি। আমিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী। আমি নামাযও পড়ি, আবার ঘুমাইও। আমি রোযা এক সময় রাখি, আর এক সময় রাখি না। আমি বিয়েও করেছি। যারা আমার সুন্নাহকে অপছন্দ করে তারা আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।'

এ থেকে বুঝা গেলো, উন্নত দীনী জীবনের আদর্শ স্বয়ং রাসূল (স)। তিনি মানুষকে বৈরাগী হওয়ার শিক্ষা দিতে আসেননি। দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে বাধ্য হয়ে যা যা করতে হয় এ সবই আল্লাহর পছন্দমতো করার শিক্ষা দিয়েছেন। মুমিনের জীবনের সব কাজই দীনদারী, যদি তা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করা হয়। মুমিনের জীবনে দুনিয়াদারী বলে আলাদা কোন বিভাগ নেই। রাসূল (স) দুনিয়াদারীকে দীনদারীতে পরিণত করার শিক্ষাই দিয়েছেন। সে হিসেবে বিয়েও ইবাদত। কেউ যদি রাসূলের চেয়েও বেশি মুত্তাকী হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে বুঝা গেলো যে, সে ইবলিসের ধোঁকায় পড়েছে। দুনিয়ার সকল কাজই ইবাদত বলে গণ্য, যদি তা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো করা হয়।

অবিবাহিত জীবনে কি সুখ আছে?

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থায় বিয়ের কোন গুরুত্ব নেই। যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্য বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ড পদ্ধতি ব্যাপকভাবে চালু থাকায় পারিবারিক দায়িত্বের বোঝা বহন করার ঝামেলা পোহাতে হয় না। এমন কি বিয়ে ছাড়া লীভ টুগেদার সিস্টেমও চালু হয়েছে এবং অবিবাহিত দম্পতি হিসেবে বসবাসরত অবস্থায় সন্তানও হচ্ছে। বিবাহ করতে গেলে আইনগত বন্ধন ও আর্থিক দায়িত্ব বহন করতে হয়। যারা বিয়ে করে তাদের অনেকেরই দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সে সমাজে দাদা-দাদীরা নাতী-নাতনীকে স্নেহ করার কোন সুযোগই পায় না। বিয়ে হলেই বাপ-মা থেকে পৃথক বাড়িতে থাকাই সেখানে নিয়ম। বৃদ্ধ বয়সে সে সমাজে মানুষ চরম নিঃসঙ্গ। পারিবারিক জীবন সেখানে অনুপস্থিত বললেও চলে। এ ধরনের জীবনে সুখ কোথায়? সুখের সংজ্ঞা তাদের আলাদা। তাদের কথা বাদ দিলাম।

আমাদের দেশেও এমন লোক আছে, যারা অবিবাহিত জীবনযাপন করেন। কেন তারা বিয়ে করেননি তারাই ভালো জানবেন। অনেকে আমার পরিচিত হলেও আমি কারণ জানতে চেষ্টা করিনি। এমন কারণও হতে পারে, যা প্রকাশ করা যায় না।

রংপুর কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক এইচ. আর. লাহীড়ি (হৃদয় রঞ্জন লাহীড়ি) অবিবাহিত ছিলেন। আমি যখন কলেজে যোগদান করি তখন তাঁর অধ্যাপনার ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। দর্শনের অধ্যাপক কলীমুদ্দীন এ কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। মি. লাহীড়ি তার শিক্ষক। আমরা যে ৩ জন একই দিনে কলেজে যোগদান করি তাদের মধ্যে বয়সে কয়েক বছরের সিনিয়র ছিলেন বাংলার অধ্যাপক জমীরুদ্দীন আহমদ। আমি ও অধ্যাপক কলীমুদ্দীন প্রায় সমবয়সী। আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এতো বেশি ছিলো যে, তা সবার চোখে ধরা পড়তো। অধ্যাপক জমীরুদ্দীন তখন দুই সন্তানের পিতা। আমি সবেমাত্র বিয়ে করলাম। অধ্যাপক কলীমুদ্দীনকে বিয়ে করার জন্য আমরা দু'জন চাপ প্রয়োগ করলাম। তিনি বিয়ে করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে আছেন। এ সিদ্ধান্তের কারণ জানা গেলো। তিনি একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। তাতে সফল না হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ হন। তিনি দর্শনের সফল অধ্যাপক ছিলেন। সম্ভবত এ বিষয়টাকে দার্শনিক দৃষ্টিতে গভীর অনুভূতির পর্যায়ে বিবেচনা করেছেন। বাস্তব জগতে এমনটা ঘটেই থাকে, সে হিসেবে দেখেননি।

আমাদের দু'জনের অব্যাহত চাপে বিয়ে করতে নিমরাজি করা গেলো। তখন তার খেয়াল হলো যে, তার চিরকুমার অধ্যাপকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। আমরা একটু চিন্তিত হলাম, না জানি অধ্যাপক কী পরামর্শ দিয়ে বসেন। তাই সিদ্ধান্ত হলো যে, আমরা দু'জন সাথে থাকবো, যাতে অধ্যাপকের মতামত নেবার সময় প্রভাব বিস্তার করা যায়।

টিচার্স কমনরুমেই তিন বন্ধু এক সাথে গেলাম। অধ্যাপক লাহীড়িকে বললাম, 'আপনাদের এ অনুগত ছাত্রটিকে বিয়ে করার জন্য কতকটা রাজি করাতে সক্ষম হয়েছি; কিন্তু তিনি আপনার পরামর্শ ছাড়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। আপনার দীর্ঘ অবিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সুপরামর্শ দিন। আমরা তাকে বিবাহিত দেখতে চাই। আশা করি, আপনি আমাদেরকে নিরাশ করবেন না।

অভিজ্ঞ ও প্রৌঢ় অধ্যাপক তাঁর স্নেহের ছাত্রটিকে কাছে বসিয়ে আদর করে বললেন, আমার অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় বলবো না। ইংলিশ ডিকশনারীর আবিষ্কারক ড. জনশনের অভিজ্ঞতা তিনি যে ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেটাই উদ্ধৃত করছি। অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'Married life has many pains, but celibacy has no pleasure.' অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে অনেক দুঃখ-বেদনা আছে বটে; কিন্তু অবিবাহিত জীবনে কোন সুখ নেই।

এ মহা-মূল্যবান বাক্যটি উচ্চারণ করার সময় শেষের কথাটুকুর উপর অত্যন্ত জোর দিলেন। আমি অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে লক্ষ্য করলাম যে, অবিবাহিত জীবনে তিনি কোন সুখই যে পাননি তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করছেন। আমি মন্তব্য করলাম, 'Mr,

Lahiri, the realization is too late.' মি. লাহীড়ি, এ উপলব্ধি হাসিল করতে বড়ই বিলম্ব হয়ে গেলো। অবশেষে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হলো, অধ্যাপক কলীমুদ্দীন বিয়ে করলেন।

রংপুর রেল স্টেশনের কাছেই লাহীড়ি বাবুর নিজস্ব বাড়ি ছিলো। ঘটনাক্রমে এক বিকেলে বাড়ির পাশের উঁচু রাস্তা থেকে লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে ৮/১০ বছরের ১০/১২ জন ছেলে হাডুডু খেলছে এবং একটা চেয়ারে বসে তিনি রেফারির দায়িত্ব পালন করছেন। রীতিমতো হুইসিল বাজিয়ে এ গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। যে ছেলে খেলায় পারদর্শিতা দেখাতে পারছে, সে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরছে এবং তিনিও ওকে চুমু দিয়ে উৎসাহিত করছেন। কিছু সময় এ দৃশ্য দেখলাম। খেলারত ছেলেদের সাথে তাঁর সখ্যতা ও হাসি-খুশি করতে দেখে বেশ কৌতুক করলাম।

পরের দিন টিচার্স কমনরুমে অধ্যাপক লাহীড়ির সাথে দেখা হলো। তাকে বললাম, 'মি. লাহীড়ি এখন আপনার দাদা হবার বয়স। বিয়ে করলে নাতি-নাতনীর দাদা অবশ্যই হতেন। এটাই প্রকৃতির দাবি। আপনি এ দাবিকে অগ্রাহ্য করেও প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন।' তিনি আমার কথার মর্ম বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি গতকাল বিকেলে তাঁর রেফারিগিরির উল্লেখ করলাম। তিনি একটু বিব্রত ভাব দেখালেন। আমি বললাম, 'আপনি বিয়ে না করায় আপনার সন্তানের মাধ্যমে দাদা হতে পারলেন না। কিন্তু প্রকৃতি আপনাকে নাতি আবিষ্কার করতে বাধ্য করেছে। প্রতিবেশী ছেলে-পেলেদের সাথে দাদা-নাতির অভিনয় করতে বাধ্য হলেন। এটাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। স্রষ্টা যে নিয়ম বানিয়েছেন এর নিকট শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতেই হলো।' তিনি অকপটে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিলেন।

তাঁর জন্য আমি খুব করুণা বোধ করতাম। তাই এ কথা জেনে অত্যন্ত বেদনাবোধ করলাম যে, কলেজ থেকে অবসর নেবার বেশ কিছুদিন পর তিনি তাঁর ঐ বাড়ির কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

মুসলিম-অমুসলিম বিয়ে

আমার বিয়ের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বিয়ে সংক্রান্ত অনেক কথাই আলোচনায় আসল। একজনের পরামর্শে, মুসলিম-অমুসলিমে বিয়ে সম্পর্কেও এ পর্যায়ে লেখা প্রয়োজন মনে করছি। স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েমের সংগ্রামকালে মুসলিম জাতীয়তাবোধ ম্লান হয়ে গেলো এবং বাঙালি জাতীয়তার চেতনা প্রবল হয়ে দেখা দিলো। ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে পার্থক্য, তা একশ্রেণীর লোক ভুলেই গেলো।

ব্রিটিশ শাসনামল থেকে এমন খবর পত্রিকায় বের হতে দেখেছি যে, অমুক হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং অমুক মুসলিম মহিলাকে শরীয়ত মুতাবেক বিয়ে করেছে, অথবা অমুক হিন্দু মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং অমুক মুসলিম যুবকের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। এতে বুঝা গেলো যে, কোন হিন্দু পুরুষ বা মহিলা কোন মুসলিমকে বিয়ে করতে চাইলে তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে হতো এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিয়ে অনুষ্ঠিত হতো।

স্বাধীন বাংলাদেশেই প্রথম জানা গেলো যে, সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার হিসেবে পরিচিত ঘরের মেয়েকে হিন্দুর নিকট বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মুসলিম পুরুষও হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করছে। সামান্য মুসলিম চেতনাবোধ থাকলেও এটা সম্ভব হতে পারে না। এমনটা তাদের মধ্যেই সম্ভব, যারা ইসলামের কোন ধারই ধারে না। মুসলিম নাম ধারণ করা সত্ত্বেও এতে কোন সংকোচ বোধ করছে না।

ইসলাম অবশ্য ধার্মিক ইহুদী বা খ্রিস্টান মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু কোন মুসলিম মহিলাকে কোন আহলে কিতাবের নিকটও বিয়ে দেবার অনুমতি দেয়নি। স্ত্রী হিসেবে কোন আহলে কিতাব মুসলিম পরিবারে আসলেও সন্তানদেরকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু কোন মুসলিম মহিলা অমুসলিমের স্ত্রী হয়ে গেলে তার নিজের ঈমানটুকুও হেফাযত করা অসম্ভব। তাই এ ব্যাপারে শরীয়ত সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে।

৪৮.

তাবলীগ জামায়াত একটি ধর্মীয় আন্দোলন

তাবলীগ জামায়াতের স্থানীয় আমীর হিসেবে রংপুরে ব্যাপক তৎপর ছিলাম। এটাকে জীবনের মিশন হিসেবে নিয়েছিলাম। ইসলামের জন্য গোটা জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা আমার জীবনে এ জামায়াতেরই বিরাট অবদান। তাই এ জামায়াতকে আমি আজীবন ভালোবাসবো এবং খেদমতে দীনের জামায়াত হিসেবে স্বীকার করবো। তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াছ (র)-এর জীবনী ও বাণী অধ্যয়ন করে তাঁকে দীনের মহান খাদেম হিসেবে আমি অবশ্যই শ্রদ্ধা করি।

তাবলীগ জামায়াত একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় আন্দোলন। আখিরাতের অনন্ত জীবনের কথা ভুলে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে যারা মগ্ন তাদেরকে কিছুদিনের জন্য ঘরবাড়ি ও দুনিয়াদারী ত্যাগ করে তাবলীগে সময় দেওয়ার যে পদ্ধতি চালু রয়েছে তা খুবই চমৎকার। যারা তাবলীগে সময় দেয়, তাদের জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তাদের মনটা আখিরাতমুখী হয়। আমি নিজেই এ কথার সাক্ষী।

কিন্তু অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করেছি যে, বর্তমানে এটুকু কাজকেই নবীওয়ালা কাজ বলে প্রচার করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে, নবী-রাসূলগণ এটুকু কাজ করার জন্যই দুনিয়ায় এসেছিলেন। ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী রাজনীতিকরা এটাকে ইসলামের আসল রূপ বলে প্রচার করে। যে সব মসজিদে এ জাতীয় লোক কমিটির কর্মকর্তা, তারা মসজিদে দারসে কুরআন দিতে আপত্তি করে এবং তাবলীগ জামায়াতের কর্মীদেরকে তাফসীর পড়তে ও দারসে কুরআন শুনতে নিষেধ করে।

তারা ইকামাতে দীনের আন্দোলনকে দুনিয়াদারীর কাজ মনে করে এবং ক্ষমতা হাসিলের আন্দোলন বলে ধারণা করে। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের মতোই তারাও ধর্ম ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আলাদা বলে বিশ্বাস করে। তারা অবশ্য ধার্মিক সেকিউল্যার; কিন্তু অধার্মিক সেকুউল্যারদের মতোই ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনার বিরোধী। যে বিরাট সংখ্যক মানুষ তাবলীগ জামায়াতের বার্ষিক ইজতিমায় শরীক হয়, তাদেরকে যদি ইসলাম সম্পর্কে এ ধারণা দেওয়া হয় যে, ইসলামে রাজনীতি নেই বা দীনদার লোকের রাজনীতি করা জায়েয নয়, তাহলে ইসলামের বিরাট ক্ষতি হবে।

মাদ্‌রাসা যেমন দীনের মহান খেদমত করে, তাবলীগ জামায়াত যা করছে তাও দীনের বিরাট খেদমত। কিন্তু জনগণকে যদি এ ভুল ধারণা দেওয়া হয় যে, তাবলীগ জামায়াতের কাজটুকুই ইসলামের পরিপূর্ণ কর্মসূচি তাহলে ইসলামের উল্টো খেদমতই হয়ে যাবে এবং মানুষকে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েমের আন্দোলনের বিরোধী বানানো হবে।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ইত্যাদি স্তর রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকগণ যতটুকু শিক্ষা দেন তারই ফলে ছাত্ররা মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে যা শেখে তারই ফলে উচ্চ শিক্ষা লাভের যোগ্য হয়। কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি ছাত্রদেরকে এ ধারণা দেওয়া হয় যে, প্রাথমিক স্কুল পাস করলেই বিদ্যা শিক্ষা শেষ হয়ে গেলো, আর শিক্ষার প্রয়োজন নেই, তাহলে এটা সুশিক্ষা নয়; কুশিক্ষা বলেই গণ্য হবে।

তেমনি তাবলীগ জামায়াতে যেটুকু দীন শিক্ষা দেওয়া হয় এটা অবশ্য দীনের প্রাথমিক স্তর। সর্ব-সাধারণকে এটুকু শিক্ষা দেবার দায়িত্ব সুন্দরভাবেই পালন করা হচ্ছে। কিন্তু এটুকু কাজ করা দ্বারাই নবীর দায়িত্ব পালন করা হয়ে গেলো বলে ধারণা যাতে না হয়, তাবলীগ জামায়াতের নেতৃবৃন্দ আশা করি সেদিকে সচেতন হবেন।

আমি জোর দিয়েই বলতে চাই যে, যখন আমি তাবলীগ জামায়াতে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতাম, তখন কখনো কোথাও এ কাজটিকে নবীওয়ালা কাজ বলে বলতে শুনিনি। দিল্লীতে হযরতজীর মুখেও এ জাতীয় কোনো দাবি করতে দেখিনি।

আমার তমদ্দুন মজলিসে যোগদান

১৯৫২ সালের মাঝামাঝি জনাব সুলায়মান খান নামে তমদ্দুন মজলিসের এক ভাই রংপুর কলেজ কম্পাউন্ডের বাসায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম বলে জানলাম। এতদূর থেকে রংপুর কেনো এলেন জানতে চাইলে তিনি বললেন– আপনার সাথেই দেখা করতে এসেছি। বিস্মিত হয়ে পরিচয় জানতে চাইলাম। তিনি তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে এসেছেন বলে জানালেন।

'৪৮ সালে ভাষা-আন্দোলনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় থাকায় তমদ্দুন মজলিসের নাম ভালোভাবেই জানতাম। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?' পুস্তিকাটির প্রচারকও ছিলাম। এ পুস্তিকাটি তমদ্দুন মজলিসই প্রকাশ করেছে। তাই এ নাম আমার অজানা থাকার কথা নয়। মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমকে আমি কয়েকবার দেখেছি বটে, কিন্তু সরাসরি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইনি। তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে এসেছেন, শুনে আমি অত্যন্ত সমাদর করে তাকে অভ্যর্থনা জানালাম।

তমদ্দুন মজলিসের দাওয়াত

জনাব সুলাইমান খান আমার সাথে দু'দিন থাকলেন। আমার স্ত্রী তখন বাসায় না থাকায় এক সাথে থাকা, খাওয়া, শোয়া ও আলাপ-আলোচনার সুযোগ অবাধে পাওয়া গেলো। প্রথম দিনই ২/৩ বৈঠকে আলোচনার পর তিনি আমার সুলাইমান ভাই হয়ে গেলেন। ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠলো। তার মিষ্ট হাসি, বলার ভঙ্গি, বক্তব্য পরিবেশনার যোগ্যতায় মুগ্ধ হলাম। মানুষটির চেহারা এখনো চোখে ভাসে। তাকে দীনী ভাই হিসেবে ভালোবাসতে বাধ্য হলাম।

তাবলীগ জামায়াতের তালীমে কালেমার অর্থ শেখানো হয়, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।' কালেমার ওয়াদা শেখানো হয় যে, 'আমি আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী চলবে।' শব্দের দিক দিয়ে কথাগুলো অবশ্যই সঠিক; কিন্তু মাবুদ শব্দের অর্থ ইবাদতের পাত্র এবং ইবাদত অর্থ ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে ধারণা বহাল থাকায় কালেমার কোন বিপ্লবী ধারণা সৃষ্টি হয় না। কালেমার ওয়াদা হিসেবে যে কথা শেখানো হয়, তা যে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সে ধারণাও জন্মে না। সে রকম ব্যাখ্যাও দেওয়া হয় না। কিন্তু ওয়াদার চেতনা তো অবশ্যই পয়দা হয়।

সুলাইমান ভাইয়ের দাওয়াতী বক্তব্য আমার ঐ চেতনায়ই ঝঙ্কার সৃষ্টি করলো। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে চলার গুরুত্ব সুলাইমান খান যখন তুলে ধরলেন এবং রাসূল (স) তাঁর জন্মভূমিতে কালেমার ভিত্তিতে যে মহাবিপ্লব সাধন করলেন, সেদিকে যখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তখন তাঁর দাওয়াত আমার অন্তর স্পর্শ করলো। তমদ্দুন মজলিস ঐ বিপ্লবী আন্দোলন করার দাওয়াতই দেয় জেনে তা কবুল করা কর্তব্য মনে করলাম। এ

জাতীয় দাওয়াত ইতঃপূর্বে আমার কাছে কেউ দেয়নি। আমি আন্তরিকতার সাথে ফরম পূরণ করে মজলিসে ভর্তি হয়ে গেলাম এবং রংপুরে এ আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব নিলাম।

তিনি কয়েকটি পুস্তিকা দিয়ে গেলেন, যা আমি কিনে রাখলাম। বইগুলো থেকে দাওয়াতের দুটো পয়েন্টই প্রধান হিসেবে পেলাম। প্রথম পয়েন্ট আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো, সকল সম্পদের মালিকানা আল্লাহর।

আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র এবং এ বিষয়েরই শিক্ষক। Sovereignty বা সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় চারটি উপাদানের একটি হলো সার্বভৌমত্ব। প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর হেরল্ড লাস্কির The Grammar of Politics গ্রন্থ এমএ ক্লাসে পাঠ্য ছিলো। এতে Location of Sovereignty (সার্বভৌমত্বের অবস্থান) নামক বিরাট চ্যাপ্টারে তিনি বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, বাস্তবে সার্বভৌম শক্তি বলে কোন শক্তির অস্তিত্ব রাষ্ট্রে নেই। সার্বভৌমত্বের যে সব বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত তা কোথায় অবস্থান করে তা নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা যায় না। তার এ আলোচনা আমার ভালোভাবেই পড়া ছিলো। তবুও রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বুঝাতে গিয়ে ছাত্রদেরকে রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান হিসেবে সার্বভৌমত্বের কথা অবশ্যই উল্লেখ করেছি।

সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কে প্রফেসর লাস্কির যুক্তির মজবুত সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও সার্বভৌম শক্তিকে অস্বীকার করতে না পেরে চিন্তার ক্ষেত্রে আমি সমস্যায়ই ছিলাম। সর্বপ্রথম তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমেই এর সমাধান পেয়ে আমি এটাকেই তমদ্দুন মজলিসের মূল দাওয়াত হিসেবে উৎসাহের সাথে প্রচার করা শুরু করলাম। আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ তাআলার যে সব গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্বের বেশ কয়টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলো। দেখা গেলো যে, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে বলে স্বীকার করে নিলেই প্রফেসর লাস্কির বিতর্কের অবসান করা সম্ভব হয়।

মাওলানা মওদূদীর 'Political Theory of Islam' বইটিও তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমেই আমি পেলাম। এ বইতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে ছাত্রদের নিকটও নতুন করে এ বিষয়ে লেকচার দিলাম। এভাবেই আমি তমদ্দুন মজলিস থেকে মনের এক বিরাট খোরাক পেলাম।

দাওয়াতের দ্বিতীয় পয়েন্ট সম্পর্কে ভাসাভাসা ধারণা পেলাম– 'লিল্লাহি মা-ফিস্ সামাওয়াতে ওয়ামা ফিল আরদি' (আসমান ও যমীনের সবকিছুর মালিক আল্লাহ)। তাই সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ইসলামে নেই। এ ব্যক্তি-মালিকানাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি এবং সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ ও যুলুমের মূল কারণ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে এটুকু ধারণা পেলাম।

তমদ্দুন মজলিসের রাজনৈতিক দাওয়াত আমার নিকট সুস্পষ্ট এবং আমার নিজস্ব বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বলে এ দাওয়াত প্রচার করার উপরই আমি বিশেষ গুরুত্ব দিলাম। অর্থনৈতিক দাওয়াত সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম।

আমি তমদ্দুন মজলিসের নিকট চিরঋণী

আমি রংপুরে তাবলীগ জামায়াতের আমীর ও তমদ্দুন মজলিসের দায়িত্বশীল হিসেবে একই সময় সমান গুরুত্ব দিয়ে এ দুটো সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকলাম। ধর্মীয় দিক দিয়ে তাবলীগ জামায়াতের প্রবল আকর্ষণ বহাল রইলো। আর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তমদ্দুন মজলিসের দাওয়াত নিষ্ঠার সাথে প্রচারে ব্যস্ত হলাম। এ উভয় সংগঠনের মাধ্যমে আমি আমার জীবনে ইসলামী জীবন বিধান জারি করে তৃপ্তি বোধ করছিলাম। তাবলীগের চিল্লায় বের হওয়ার সময়ও 'ওমর দিবস' পালনের জন্য তমদ্দুন মজলিসের পোস্টার সাথে নিয়ে গিয়েছি বলে মনে পড়ে।

১৯৫৪ সালে গাইবান্ধায় জনাব আবদুল খালেকের নিকট জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পাওয়ার পর এবং তাঁর দেওয়া দুটো উর্দু পুস্তিকা পড়ে মনে হলো যেন আমাকে সেদিকে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তো তাবলীগে ধর্মীয় দিক এবং তমদ্দুনে রাজনৈতিক দিক পেয়ে সন্তুষ্টই ছিলাম, কিন্তু যখন জামায়াতে ইসলামীতে একই সাথে ইসলামের সবটুকু পাওয়া যাচ্ছে বলে অনুভব করলাম, তখন তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের বদলে জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমেই ইসলামের সকল দিকের দাওয়াত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি যেভাবে তাবলীগ জামায়াতে মনেপ্রাণে ডুবে ছিলাম তাতে মনে হয় যে, তমদ্দুন মজলিসের দাওয়াত না পেলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের মানসিকতা সৃষ্টি হতো কিনা জানি না। তিন বছর তমদ্দুন মজলিসে যা পেয়েছি এর বিবরণ পরবর্তী আলোচনায় আসবে, ইনশাআল্লাহ। জামায়াতে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনে আসার পথে তমদ্দুন মজলিসের অবদানকে আমি অকপটে স্বীকার করি। তাই আমার দীনী জিন্দেগী গড়ার পথে তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের নিকট আমি চিরঋণী। তাবলীগ জামায়াত আমাকে মিশনারী জযবা দান করেছে। আর তমদ্দুন মজলিস ইসলামকে সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন হিসেবে ধারণা দিয়েছে। 'ইসলামী আন্দোলন' পরিভাষাটি সর্বপ্রথম তমদ্দুন মজলিসেই শিখেছি।

ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেওয়ার গুরুত্ব

আমাকে ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট করে যদি সুলাইমান ভাই দাওয়াত না দিতেন তাহলে শুধু সাহিত্য পড়ে তমদ্দুন মজলিসে যোগদান করা সম্ভব হতো না। তেমনিভাবে যদি জনাব আবদুল খালেক সাহেব আমাকে টার্গেট না বানাতেন তাহলে আমার পক্ষে জামায়াতে যোগদান করার সুযোগ হতো কিনা জানি না।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, জনসভা ও সুধী-সমাবেশে যত আকর্ষণীয় ও যুক্তিপূর্ণভাবেই দাওয়াত পেশ করা হোক, তাতে মানুষ প্রভাবিত হয় বটে; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে দাওয়াত না দিলে কেউ সহজে সংগঠনভুক্ত হয় না। সমাবেশে কিছু লোককে ফরম পূরণ করানো গেলেও সংগঠনে সক্রিয় করতে হলে ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট করে পেছনে লেগে থাকতে হয়। তা না হলে দাওয়াতে আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সংগঠনভুক্ত হয় না। আদর্শের প্রভাব যতই প্রসার লাভ করুক, সাংগঠনিক শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি না পেলে আদর্শ বাস্তবে কায়েম হতে পারে না। তাই ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ, আলোচনা, প্রশ্নের উত্তর দান এবং আন্তরিক ভালোবাসা দিয়ে সংগঠনে টেনে আনার প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

সমাপ্ত

কামিয়াব প্রকাশন। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।